ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের উপদেশ-বাণী।

চতুর্থ খণ্ড

(প্রথম বাংলা সংস্করণ, ১৩৫০)

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ও
ব্রহ্মচারী প্রেমশঙ্কর
সম্পাদিত।

প্রাপ্তিস্থান—
স্বরূপানন্দ গ্রন্থ-সদন লিমিটেড
নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা)।

নিবেদন ।

মঙ্গলময় পরমপ্রভুর কৃপায় "অখণ্ড সংহিতার" চতুর্থ খণ্ডও সূর্য্যের আলোকে আত্ম-প্রকাশ করিলেন। নেপথ্যে থাকিয়া হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি রূপে যে মহাগ্রন্থের কিয়দংশ অনুগত হৃদয়সমূহের আকর্ষণে হস্ত হইতে হস্তান্তরে এবং গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বিচরণ করিতেছিলেন, আজ তাহা জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বজনের নিকটে অবাধ-গমন-পথ ক্রমশঃ প্রসারিত পাইতেছেন দেখিয়া আমাদের আনন্দের অবধি নাই। আরও আনন্দের কথা এই যে, দেশের চিন্তাশীল ও মনীষী ব্যক্তিবৃন্দ আবির্ভাব-মাত্র এই গ্রন্থকে মহা-সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। বাংলার বিভিন্ন সংবাদপত্রের সুযোগ্য সম্পাদকগণ ব্যতীতও সমাজের এবং দেশের নানাবিধ সেবায় রত বহুবিদ্যালঙ্কৃত সুধীবৃন্দও মহানন্দ সহকারে এই মহাগ্রন্থের প্রথম-প্রকাশিত খণ্ডত্রয়কে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, আমরা যে "অখণ্ড-সংহিতা বা শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের উপদেশ বাণী" অত্যন্ত তাড়াহুড়া করিয়া প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছি, তাহা অসময়োচিত হয় নাই। যাঁহারা এই মহাগ্রন্থের প্রকাশকে আনন্দ সহকারে অভ্যর্থনা প্রদান করিয়াছেন, এই সুযোগে আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

নামের জন্য নহে, যশের জন্য নহে, জন-সমাজে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নহে, পরন্তু নিষ্কাম নিঃস্বার্থ জনহিত-সাধনের অকৃত্রিম সেবাবুদ্ধির প্রেরণাতেই পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব পল্লীর পর পল্লীতে অজ্ঞাত অখ্যাত পথভ্রষ্ট শত শত বালকের, যুবকের ও দরিদ্রের সঙ্গ করিয়াছেন এবং নিজের তপঃপূত প্রেমময় সঙ্গ তাঁহাদিগকে দিয়াছেন। তাহারই আংশিক মাত্র অনুলিখন এই মহাগ্রন্থ। ব্যক্তিটীকে লইয়া নহে, তাঁহার সমদর্শিতায় সবল, সহানুভূতিতে সরস, স্বানুভূতিতে সরল চিন্তাগুলিই মাত্র এই গ্রন্থের উপাদান বা উপজীব্য।

কিন্তু তাহারই বা কতটুকু আর ইহার ভিতরে প্রতিফলিত হইয়াছে? দর্পণ ক্ষুদ্র বলিয়া মহতের পরিপূর্ণ প্রতিবিম্ব ইহাতে আশা করা যায় না। কিন্তু শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের যে অমৃত-মধুর উপদেশাবলী তাঁহার শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া সংখ্যাতীত মানব-সন্তানের প্রাণে নবজাগরণের অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আলোড়ন আনিয়াছিল, সেই বাণীর কিয়দংশমাত্র লেখনী-মুখে বিবৃত হইয়া যে সমাজের বিভিন্ন স্তরে এবং বিশেষ ভাবে দেশের তরুণ-সমাজের অন্তরে নবভাবের প্লাবন সৃষ্টি করিতেছে, প্রথম তিন খণ্ডের প্রকাশের দ্বারা আমরা নির্ভুল রূপে তাহা উপলব্ধি করিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। মঙ্গলময় করুন, আমরা যেন সবগুলি খণ্ড বিনা বিঘ্নে বা স্বল্প বিঘ্নে প্রকাশ করিয়া ফেলিতে পারি। অথবা বিঘ্ন যদি বহুও হয়, তবু যেন এই মহাগ্রন্থের প্রকাশ যে-কোনও প্রকারে সম্ভব হয়।

বাংলা ব্যতীতও অপরাপর ভাষার সংস্করণ যাহাতে দ্রুত প্রকাশিত হইতে পারে, তদ্বিষয়েও আমরা বিশেষ ভাবে অবহিত রহিয়াছি। ইতি—

বিনীত নিবেদক—

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী প্রেমশঙ্কর

পুপুন্‌কী অযাচক আশ্রম।
পোঃ চাশ, মানভূম

অখণ্ড-সংহিতা

বা

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

উপদেশ বাণী

চতুর্থ খণ্ড

কলিকাতা,

১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬,

অদ্য রবিবার, অতএব স্কুল-কলেজের ছাত্রদের ভিড় অত্যধিক। একটী কলেজের ছাত্র শ্রীশ্রীবাবাকে (শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবকে) কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ঠিক এই প্রশ্নগুলির জবাব আমি চার বৎসর আগে ময়মনসিংহে একজনকে দিয়েছিলাম। সেইদিনকার কথাবার্ত্তা একটা খাতায় নোট করা আছে। প'ড়ে দেখ।

এই বলিয়াই শ্রীশ্রীবাবা একটা খাতা বাহির করিয়া দিলেন। উপস্থিত যুবকেরা আগ্রহ সহকারে তাহা পড়িতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচর্য্য আন্দোলনের সার্থকতা

"প্রশ্ন।—বীর্য্যধারণের জন্য পৃথক্ চেষ্টার আবশ্যকতা কি? সৎকাজ কত্তে কত্তে আপনিই কি চিত্তসংযম আসে না?"

"উত্তর।—তা' আসে, কিন্তু বীর্য্যধারণের জন্য পৃথক্ চেষ্টারও প্রয়োজন আছে। সৎকাজে চিত্ত-সংযম আসে, কিন্তু বীর্য্যধারণে যে যত অধিক যত্নবান্, তার চিত্ত-সংযম তত সহজে হয়, তত গভীর হয়। বীর্য্যক্ষয়পরায়ণ কেউ সৎকাজে অবতীর্ণ হ'লে যতকালের পর যতটুকু চিত্ত-সংযম লাভ কর্ব্বে, বীর্য্যরক্ষায় যত্নশীল ব্যক্তি তার চাইতে কম সময়ে তার চাইতে বেশী সংযম লাভ কর্ব্বে।"

সৎকাজের দ্বারা মনঃসংযম

"প্রশ্ন।—বীর্য্যধারণের জন্য আপনি যে সব উপদেশ দেন, তার প্রায় সবই মনের সম্পর্কে। কিন্তু মনকে সেই শৃঙ্খলায় চালান বড় কষ্টসাধ্য বোধ হয়। তার চেয়ে নানা জনহিতকর কাজে আত্ম-নিয়োগ ক'রে চিত্ত-সংযমের চেষ্টাই কি সহজ নয়?

"উত্তর।—দেখতে গেলে উভয়ই সমান, উভয়ই মনের discipline (শৃঙ্খলা)। দুঃখী জীবের যখন সেবা কচ্ছ, তখন তোমার চিত্ত করুণায়, সহানুভূতিতে, প্রেমে কোমল হচ্ছে, নির্ম্মল হচ্ছে। তাই দুঃখীর সেবায় তোমার চিত্তসংযমের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হচ্ছে। এই করুণাটুকু যদি না থাকে, হৃদয় যদি তোমার সহানুভূতিতে গ'লে না যায়, তা' হ'লে কি তোমার চিত্ত-সংযমের ক্ষমতা লাভ হবে? মোটেই না। প্রেমহীন চিত্ত সর্ব্বস্ব দান ক'রেও সংযম লাভ কত্তে পারে না। যতক্ষণ তুমি করুণায় আপ্লুত না হ'চ্ছ, ততক্ষণ রোগীর সেবাই বল, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদানই বল, মুর্খকে বিদ্যা-বিতরণই বল, মোহান্ধকে ব্রহ্মজ্ঞানের পন্থা-প্রদর্শনই বল, আর পরাধীনকে স্বাধীনতার পথে টেনে নেওয়ার চেষ্টাই বল, কোনটাতেই তোমার সংযম লাভের সহায়তা হবে না। প্রাণের ভিতরে সহানুভূতি না থাক্‌লে আর্ত্তের সেবা ক'রেও সে আনন্দ পাওয়া যায় না, যা চিত্ত-সংযমের সহায়ক। আবার বাহ্যতঃ কোনও প্রকার সেবা না ক'রেও সে মানসিক সম্পদটী লাভ করা যায়, যদি দুঃখীর দুঃখ-স্মৃতিতে প্রাণের মাঝে করুণার জোয়ার বইতে থাকে। আসল কথাটাই ত' হ'ল মন নিয়ে। মনকে সংযমের অনুকূল করার জন্য এখন সূক্ষ্ম পথেই চল, আর স্থূল পথেই চল। যারা স্থূল পথেই চলে, তাদের সংযম লাভ বিলম্বে হয়। যারা

সাধ্যমত দুই প্রণালী নিয়েই চলে, মনকে নিরিবিলি ব'সে একাগ্র কত্তেও যেমন চেষ্টা করে, আবার দীন-দুঃখীর সেবা ক'রে মৈত্রী-করুণা প্রভৃতি চিত্তভাবেরও অনুশীলন করে, তারা এগিয়ে যায় অতি দ্রুত।

সর্ব্বকার্য্যে ধ্যান-ধারণার পরোক্ষ সুফল

"প্রশ্ন।—কিন্তু আমার যদি চিত্তকে একাগ্র কর্ব্বার জন্য নিরিবিলি চেষ্টা সম্ভব না হয়?"

"উত্তর।—সম্ভব না হবার কোনও সঙ্গত কারণ নেই। অন্য সময় না মিলে, রাত্রিতে শোবার আগে, আর শেষ রাত্রিতে ঘুম থেকে জেগে কতক্ষণ, চিত্তকে সচ্চিন্তায় লাগিয়ে রাখবার পদ্ধতিবদ্ধ চেষ্টা সবাই কত্তে পারে। যার কোনও প্রকারেই তেমন সময়টুকু হবে না, বল্‌তে হয় যে, মন নিয়ে কসরৎ করার তার রুচি নেই।

"প্রশ্ন।—বাস্তবিকই তাই। আমাদের এখন আর ধ্যানজপে প্রকৃতই রুচি নেই। প্রায় সময়ই আমাদের মনে হয় যে, ধ্যানজপ এসব শুধু সাধুদেরই জন্য, আমাদের জন্য নয়।

"উত্তর।—তোমরাও যে সাধু নও, সে কথা বল্ল কে? কৌপীন প'রে গুহাবাসী হ'লেই সাধু হবে, আর বন্দুক কাঁধে ক'রে লড়াই কল্লেই সাধু হবে না, এসব কথা নিতান্ত গ্রাম্য লোকের। যে সাধন করে, সেই সাধু। সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে যে সাধন করে, সেই প্রকৃত সাধু; আর লোক-দেখাবার জন্য যে সাধন করে, সে ভণ্ড সাধু। এ সাধন লোক-হিত-সাধনও হ'তে পারে, মনের একাগ্রতা-সাধনও হতে পারে। মনের একাগ্রতা সাধন ব্যতীত যদি লোকহিতসাধন সম্ভব মনে কর, তা হ'লে তাই ক'রে যাও। কিন্তু যে কাজ কর্ব্বে, প্রাণভরা অনুরাগ নিয়ে, পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাবুদ্ধি নিয়ে। এই অনুরাগ আর শ্রদ্ধাবুদ্ধি তোমাকে তোমার কর্ম্মে একাগ্রতা আস্তে আস্তে দেবে। কিন্তু নাম্‌তা মুখস্থ থাক্‌লে যেমন বড় বড় পূরণ অঙ্কও ধাঁ ক'রে ক'ষে ফেলা যায়, তেম্‌নি পৃথক্‌ভাবে ধ্যান-ধারণা প্রভৃতির অভ্যাস থাক্‌লে গরু-চুরি থেকে বৈষ্ণব

বন্দন পর্য্যন্ত ব্যবহারিক জগতের সব কাজে সহজে মনটীকে স্থির ক'রে বসান যায়।

ব্রহ্মচর্য্যের সহিত দেশের সেবার সম্বন্ধ

"প্রশ্ন।—অনেকে ব'লে থাকেন যে, ব্রহ্মচর্য্যের জন্য একটা পৃথক্ আন্দোলন সৃষ্টির প্রয়োজন নেই।

"উত্তর।—তাঁরা যে না বুঝেই বলেন হে! যাতে তোমার দেশবাসী তোমার ভাল কথাগুলির মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারে, যাতে তাদের মস্তিষ্কে উচ্চ আদর্শের জন্য স্থায়ী স্থান হয়, তার জন্য ব্রহ্মচর্য্য আন্দোলনের খুব প্রয়োজন আছে। একদিন একজন জননেতার মুখে উচ্চ আদর্শের কথা শুনে তেত্রিশ কোটি লোক নব-উৎসাহে মেতে উঠ্‌ল, আর তারপরের দিনই সব ভুলে গেল, জাতির এই বিস্মরণশীলতা দূর করার শক্তি একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যেরই আছে। নির্য্যাতনের দুঃখকষ্ট সহ্য ক'রে, অত্যাচার-লাঞ্ছনায় ভ্রূক্ষেপমাত্র না ক'রে একটা পথে একটা মতে নিঃসহায় নিঃসম্বল হ'য়ে চল্‌বার সাহস দেবার ক্ষমতা একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যেরই আছে। আমি ত' বলি, ভারতবর্ষ যে দিন ব্রহ্মচর্য্যের প্রকৃত মূল্য বুঝ্‌বে, সেদিন জগতের কোন সংগ্রামে সে পরাজিতের মলিন মুখ নিয়ে ঘরে ফিরে আস্‌বে না।

"প্রশ্ন।—কিন্তু আমার বন্ধু বল্‌ছেন, ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারকেরা দেশের কোনও সেবা করেন না।

"উত্তর।—তবে তাঁরা কিসের সেবা করেন? বিদেশের? বাঙ্গালীর ছেলে ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হ'লে ফ্রান্সের লোক লাভবান হবে? পাঞ্জাবীর ছেলে সংযমী হ'লে মার্কিনীদের উন্নতি হবে? মাদ্রাজীরা চরিত্রের মূল্য বুঝ্‌লে সাহারাতে গাছ গজাবে? না, মারাঠীরা বীর্য্যবান্ হ'লে ফিলিপাইন দ্বীপ স্বাধীন হবে? ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারকেরা কাউন্সিল-ইলেক্‌শানের ঝগড়া কচ্ছেন না ব'লে দেশের সেবা করেন না, এ সব অতি বড় নির্ব্বোধের কথা। ব্রহ্মচর্য্য যাঁরা প্রচার কচ্ছেন, তাঁদের মনোগত উদ্দেশ্যই হ'ল জাতীয় উন্নতি। নইলে তাঁদের প্রচার প্রচেষ্টার কোনও সঙ্গত অর্থই হয় না। তবে তাঁরা ভিত্তি গ'ড়ে যাচ্ছেন, মন্দিরের চূড়ায়

হাত দিচ্ছেন না। কিন্তু ভিত্তি গড়ার কাজটা যে কারিকরের হাতে পড়ে, জগৎ-সংসার দুন্দুভি-নিনাদে তাঁর যশোবিস্তার না কর্লেও, তিনিই যে সবার চাইতে বড় ভাগ্যবান্, এ কথা চিন্তাশীল লোক ছাড়া আর কাকে বুঝাব বল? "দেশের সেবা" কথাটা মুখস্থ অনেকেই বলে, কিন্তু কথাটার প্রকৃত অর্থ যে কি, তা' অনেকেই জানে না। দেশের সেবা কারো একচেটে অধিকার নয়! যার যার যোগ্যতা অনুসারে নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী কর্ম্মপন্থা বের ক'রে নিয়ে পৃথগ্ভাবে দেশের সেবায় অগ্রসর হবার অধিকার প্রত্যেকের আছে।

বহুদল ও তজ্জনিত বিরোধ

"প্রশ্ন।—কিন্তু দেশে বহু দল ও বহু কর্ম্মপন্থার সৃষ্টি হ'লে পরস্পর বিরোধ অবশ্যম্ভাবী।

"উত্তর।—কথাটা কিন্তু তা' নয়। দেশের সেবার আকাঙ্ক্ষার চাইতে নাম কিন্‌বার আকাঙ্ক্ষাটা যখন প্রবলতর হয়, অপরের শ্রমার্জ্জিত প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তিতে যখন কারো চিত্ত ঈর্ষ্যা-জর্জ্জর হয়, অপরের ন্যায়োপেত অধিকারের উপর হাত দেবার ঔদ্ধত্য যখন কারো মধ্যে আসে, বিরোধের জন্ম হয় তখন। দল যিনিই যত গড়ুন না, দেশটা দলের চাইতে ঢের বড়। তাই, একটা দেশ কিন্তু তাকে সেবা কর্ব্বার জন্য দশটা দল থাক্‌বেই। একদল অপর দলের স্বাধীন অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ না ক'রে, একে অন্যের লোক-প্রতিষ্ঠায় ঈর্ষ্যা না ক'রে, একে অন্যকে লোকদৃষ্টিতে খাটো কর্ব্বার চেষ্টা না ক'রে, একে অন্যের অনিষ্ট-কামনা না ক'রে নিজ নিজ কর্ম্মতালিকা অনুযায়ী কাজ যদি ক'রে যায়, তা' হ'লে কিছুতেই কারো সঙ্গে কারো বিরোধ হ'তে পারে না। কর্ম্মীদের মধ্যে চিত্তশুদ্ধির অভাবই বিদ্বেষের জনক, কর্ম্মপন্থার পার্থক্য নয়। অশুদ্ধচেতা কর্ম্মীদের নিয়ে একটা মাত্র দল কর্লেও সেই একটা দলের মধ্যেই সহস্র আত্মকলহ সৃষ্ট হবে। তাই বল্‌ছি, সকলকে একদলে পূর্‌বার বুদ্ধি দুর্ব্বুদ্ধি মাত্র।

চরিত্রবলহীন জাতীয় উন্নতি

"প্রশ্ন।—কিন্তু আমার বন্ধু বল্‌ছেন যে, জাতীয় উন্নতির জন্য চরিত্র-

আন্দোলনের কোনো আবশ্যকতা নেই। কারণ, চরিত্রবল ছাড়াই জাতীয় উন্নতি সাধন করা যেতে পারে।

"উত্তর।—তোমাদের যদি নিশ্চিত বিশ্বাসই জন্মে থাকে যে চরিত্রবল ছাড়াই তোমরা দেশের উন্নতি কত্তে পার, তা হ'লে বেশ ত', চরিত্রের সাধনা কিছুমাত্র না ক'রে চেষ্টাই ক'রে দেখ না একবার। যদি এ কথা সত্য হ'য়ে থাকে যে, চরিত্রবল ছাড়াই জাতীয় কল্যাণ সম্ভব, তবে ত' তোমরা সফল হবেই। But one condition,—your conviction must be honest, your faith in non-morality must be genuine, your boycott of morality must spring from real belief. মাথাওয়ালা লোকেরা নিজেদের অপেক্ষা কম বুদ্ধিমান্ লোকদের যা' তা' একটা বুঝিয়ে উপস্থিত কার্য্যসিদ্ধির জন্য যদি বলে যে, চরিত্রহীনতায় ক্ষতি কর্ব্বে না, তবে সে কথায় চল্‌বে না। সংযম ছাড়া যে দেশোদ্ধার হবে, আমার কাছে কিন্তু সে কথা হাস্যকর ব'লে মনে হয়। কারণ, দেশের সেবার মুখে হঠাৎ একদিন ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতা এমনভাবে আত্মপ্রকাশ ক'রে বস্‌বে যে, স্বার্থের সম্মুখে স্বদেশ বা স্বজাতি তৃণবৎ ফুৎকারে উড়ে যাবে। একটা সুন্দরার কৃপাকটাক্ষের জন্য দেশকে তোমরা সেদিন জাহান্নমে পাঠিয়ে দিতে দ্বিধা বোধ কর্ব্বে না।

সাহস বনাম সৎসাহস

"প্রশ্ন।—জাতীয় উন্নতির মূল কথাই হ'ল সাহস। সাহস থাক্‌লে চরিত্রের দু'একটা দোষ-ত্রুটীতে কিছু আসে যায় না।

"উত্তর।—খুব আসে যায়। কারণ, শুধু সাহসই যথেষ্ট নয়, সৎসাহস চাই। যারা নীচ স্বার্থের জন্য খুন ক'রে, ডাকাতি ক'রে, বলাৎকার ক'রে জেলখানার ঘানি টান্‌ছে, এদের মধ্যে সাহসী লোকের অভাব নেই। কিন্তু এ সব নীচ লোকদের দ্বারা জাতীয় উন্নতি হয় না। জাতীয় উন্নতির জন্য সৎসাহসী লোক চাই। যারা সত্যকে সত্য ব'লে স্বীকার কত্তে ভয় পায় না, মিথ্যাকে মিথ্যা ব'লে প্রচার কত্তে শঙ্কিত হয় না, যারা নিজের সুখের চাইতে দেশের সুখকে বড় দেখে, যারা আস্ফালনের চেয়ে প্রকৃত কাজে মন বেশী দেয়, তাদের

যদি খুঁজে বের কত্তে হয়, তবে তোমাকে চরিত্রবান্ লোকদের মধ্যেই সন্ধান কত্তে হবে।

পাশ্চাত্যের হীনচরিত্রতা ও ঐহিক উন্নতি

"প্রশ্ন।—পাশ্চাত্য দেশসমূহের লোকের চরিত্র-বল নেই। ইন্দ্রিয়-ভোগই তাদের জীবনের চরম লক্ষ্য। ভারতবাসীদের অপেক্ষা তারা সংযম-বিষয়ে নিকৃষ্ট। কিন্তু তবু সে সব দেশ নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা কচ্ছে, নানা প্রকারে নিজেদের উন্নতি সাধন কচ্ছে। তাদের পক্ষে যদি এ সব সম্ভব হয়, তবে আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না কেন?

"উত্তর।—পাশ্চাত্য দেশসমূহ যে আমাদের চাইতে চরিত্রাংশে নিকৃষ্ট, তা' জান্‌লে কিসে? তাদের চাইতে আমাদের দেশে যৌন ব্যভিচার কম ব'লেই মনে ক'রো না, ভারতবাসী আজ অবৈধ-বীর্য্যক্ষয়ে তাদের পিছনে প'ড়ে আছে। ওদের সমাজ-গঠন-পদ্ধতি যৌন ব্যভিচারের অনুকূল, আর আমাদের সমাজ-গঠন-পদ্ধতি যৌন ব্যভিচারের প্রতিকূল। ওদের নারীজাতির সমক্ষে সীতা, সতী, সাবিত্রী, দময়ন্তীর আদর্শ নেই, আমাদের তা' আছে। এই জন্যে পরদার, জার ও অগম্যাগমনের পাপ ভারতবর্ষে ওদের চাইতে নিশ্চিতই কম, সন্দেহ নেই। কিন্তু অকারণ বীর্য্যক্ষয় কি ভারতবর্ষে ওদের চাইতে কম হচ্ছে? যতই বল, পশুত্বে ওদের সাথে আমাদের বড় পার্থক্য নেই। তবু যে তারা আমাদের চাইতে ঐহিক সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবান্, তার কারণ, একদিকে ওদের শিক্ষার প্রসার, অপর দিকে সর্ব্বকর্ম্মে নারীজাতির সহযোগিতা। শিক্ষা মানুষের ব্রহ্মাস্ত্র, শিক্ষা বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করে এবং সঙ্ঘবদ্ধতার শক্তি দেয়। শিক্ষিত লম্পট অশিক্ষিত লম্পটকে অনায়াসে নিপাতিত কত্তে পারে, অল্পসংখ্যক শিক্ষিত ও সঙ্ঘবদ্ধ লোক বহুসংখ্যক অশিক্ষিত লোককে পদতলে বিদলিত কত্তে পারে। আর, অধিকাংশ কর্ম্মেই নারীজাতির সাহচর্য্য পুরুষজাতির কর্ম্মশক্তিবর্দ্ধক। কিন্তু আমাদের দেশে হচ্ছে কি? য়ুরোপে দেশপ্রেমিক কর্ম্মীর স্ত্রী তার সঙ্গিনী, আর আমাদের দেশে সে বন্ধন, পায়ের বেড়ী। এভাবে দেশের অর্দ্ধেক মানুষ

শুধু স্ত্রীলোক ব'লে সর্ব্বকর্ম্মে অক্ষম হ'য়ে রয়েছে, আর, পুরুষদের সকল সৎ-চেষ্টার বাধাস্বরূপ হচ্ছে। "দেশের সেবা" "দেশের সেবা" ব'লে খামাকা কতকগুলি অর্থ-হীন চীৎকার না ক'রে আগে নিরক্ষর মূর্খদের অন্ধতমসাচ্ছন্ন চিত্তে জ্ঞানের আলোক জ্বাল, অবলা ব'লে উপেক্ষিতা নারীদের হাতে কাজ করবার হাতিয়ার তুলে ধর। তবেই বুঝবে, য়ুরোপ শ্রেষ্ঠ কেন? চরিত্রের মূল্য কত, তখন তাও ধরা পড়বে।"

যুবকদের পাঠ সমাপ্ত হইলে শ্রীশ্রীবাবা তাহাদিগকে বিদায় দিয়া ভবানীপুর রওনা হইলেন এবং উপদেশের জন্য প্রতীক্ষমান অপর একদল যুবকের সহিত সাক্ষাৎ মানসে হরিষ-পার্কে আগমন করিলেন।

জনতার মাঝে নির্জ্জনতা

হরিষ পার্কে তখন মাত্র দুইটী ছেলে আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এস একটু নামজপ ক'রে নিই।

একটী যুবক বলিলেন,—এখানে বড়ই জনতা।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—হ'লই বা জনতা। এখানে ত' আর তোমাকে কেউ চিন্‌বে না! যদি কেউ দেখেই ফেলে যে তুমি নামজপ কচ্ছ, তাহ'লে বড় জোর পাগল বল্‌বে। এর চেয়ে ত' আর বেশী ক্ষতি কিছু কত্তে পার্ব্বে না!

যুবকদ্বয় নাম জপে বসিতে সম্মত হইলেন।

তখন শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বিপুল জনতার মাঝেও নিজেকে নির্জ্জন ব'লে জান্‌বে এবং নির্জ্জনতার আস্বাদন গ্রহণ কত্তে চেষ্টা পাবে। তবে জনতার মাঝে ব'সে ধ্যান-জপাদি কত্তে চ'খ খোলা রেখে কাজ কর্ব্বে যেন বাইরে থেকে কেউ বুঝতে না পারে যে, তুমি কোনও আধ্যাত্মিক কর্ম্ম কচ্ছ।

নামজপের প্রত্যক্ষ ফল

ইতিমধ্যে উপদেশার্থী যুবকেরা আসিয়া জমিলেন। আস্তে আস্তে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—নামজপের প্রত্যক্ষ ফল কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পাপের নাশ, অতএব চিত্ততাপের নাশ। পাপ থেকেই

তাপ জন্মে, পাপক্ষয় হ'লে তাপক্ষয়ও হ'বেই হবে। চিত্তের প্রশান্তি, মনের আনন্দ, হৃদয়ের নির্ম্মলতা, ভাবধারার শুদ্ধি,—এসব হ'ল নাম-সেবার প্রত্যক্ষ ফল।

নামজপের পরোক্ষ ফল

অপর একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—নামজপের পরোক্ষ ফলটী কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নিখিল ভুবনের মঙ্গল। তুমি যখন একাগ্র মনে নাম জপ, তখন তাতে পরোক্ষভাবে সমগ্র জগতের কুশল হয়।

পুনরায় প্রশ্ন হইল,—নাম-সেবাতে যে জগতের কুশল হচ্ছে, একথা বুঝব কি ক'রে?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নামের সেবা কত্তে কত্তে তোমার চ'খের পাতায় প্রেমের মধু দিয়ে অঞ্জন কাটা হবে। তখন দেখতে পাবে যে, ত্রিজগতের সকল বস্তু সকল জীব প্রেমময় মধুময়। জগৎ-কুশলের স্বরূপও সেখানে, প্রমাণও সেখানে।

নিষ্কাম নামজপ

প্রথম প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন,—নামজপ ত' করি, কিন্তু প্রাণে শান্তি আসে না কেন? তাপ কমে না কেন?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—করার মত ক'রে কর না। সর্ব্বপ্রকার অভিসন্ধি-বর্জ্জিত হ'য়ে নাম কর্ব্বে। নামের ফলে পাপক্ষয় হোক্ বা বিপদ-ভঞ্জন ঘটুক, এ সব কোন কামনা না রেখে নাম কর্ব্বে। নিষ্কাম নামজপ সকাম নামজপ অপেক্ষা দ্রুত শান্তি দান করে।

সকাম নামজপ

অপর এক যুবক বলিলেন,—কামনাহীন হ'য়ে নামজপ করা বড় অরুচিপ্রদ। কোনও প্রার্থনাই যদি না পূরণ হবে, তবে আর নামজপ কর্ব্ব কেন?

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—বেশ ত', কত্তে চাও, তাই ক'রো। প্রার্থনা পূরণের জন্য নামজপ কোন দোষের কথা নয়। তবে, প্রার্থনা তোমার যাই থাকুক, জপকালে সেইটী বিস্মৃত হ'য়ে যেয়ো। জপকালে শুধু জপই কর্ব্বে এবং যাঁর নাম, তাঁকেই অনুক্ষণ স্মরণ কর্ব্বে।

সকাম জপে প্রেমলাভ অতি দীর্ঘকাল-সাপেক্ষ

প্রশ্ন।—অনেকে ত' বছরের পর বছর ধ'রে নাম জ'পে যাচ্ছেন, আধ্যাত্মিক উন্নতি ত' কৈ তাঁদের কিছুই দেখতে পাচ্ছি না !

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম প্রভৃতি বাঞ্ছা ক'রে যে নামজপ, তাতে বাঞ্ছাপূরণ পর্য্যন্তই সার, কিন্তু সারাৎসার যে ভগবদ্‌ভক্তি, তা' সহজে লাভ হয় না। ভগবদ্‌ভক্তি হচ্ছে নিষ্কাম জপেরই ফল। নাম অনেকেই জপেন, কিন্তু নিষ্কাম হ'য়ে জপেন না। তাই ভক্তির উদয় হয় না। কিন্তু বহুবার সকাম ভাবে জপ্‌তে জপ্‌তে হঠাৎ যে দু' একবার নিষ্কাম ভাবে জপ হ'য়ে যায়, তার ফলে কামনার স্রোতের তলায় কণা কণা ক'রে প্রেমের চড়া পড়তে থাকে। প্রেম আসে, তবে আস্তে আস্তে আসে। কিন্তু মানুষের জীবন ত' স্বল্পকালস্থায়ী। তাই অতি আস্তে প্রেমের উদয় হ'তে গেলে ত' পরমায়ুতে বেড় পাবে না। আর, সেই প্রেমোদয় চ'খে পড়বার মতও হবে না।

ভগবানে পরানুরক্তি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবানে পরানুরক্তি নামজপের চিরস্থায়ী ফল। এই চিরস্থায়ী ফলের জন্যেই তোমাদের ব্যাকুল হওয়া উচিত, আগ্রহী হওয়া উচিত। "ঠাকুর, আমাকে ধার্ম্মিক কর, ঠাকুর আমার অন্নাভাব দূর কর, ঠাকুর আমার কামনা পূরণ কর, ঠাকুর আমাকে মোক্ষ দাও"—এসব কোনো প্রার্থনাই তোমাদের থাকবে না। থাক্‌বে শুধু এই একটী মাত্র ভাব,—"ঠাকুর, আমাকে সর্ব্বতোভাবে তোমার কর, ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার-শক্তি আমার নেই ঠাকুর, তুমি ধর্ম্মের মাঝেও আমাকে তোমার কর, অধর্ম্মের মাঝেও আমাকে তোমার কর, তোমার নিজের ইচ্ছায় আমাকে যেদিক্ দিয়ে খুশী তুমি পরিচালিত কর, এই পথ-গতি যেন আমার অহংএর কোনো স্পর্শমাত্রও না পায়, চিরদারিদ্র্যের মধ্য দিয়েও তুমি আমাকে তোমার কর, বিপুল বৈভবের ভিতর দিয়েও তুমি আমাকে তোমারই রাখ, দারিদ্র্যের জ্বালা আর বৈভবের উল্লাস কিছুই যেন আমাকে স্পর্শ কত্তে না পায়।"

অতঃপর সকলে গঙ্গার ঘাটে আসিয়া বসিলেন এবং সকলেই নামজপে নিরত হইলেন।

কলিকাতা
১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬

অদ্য সমগ্র প্রাতঃকাল ও মধ্যাহ্ন শ্রীশ্রীবাবা মৌনাবলম্বনে কাটাইয়াছেন। কাহাকেও লিখিয়াও কোনও প্রশ্নের উত্তর দেন নাই।

অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকায় মৌনভঙ্গ হইলে সমাগত যুবকদের লইয়া শ্রীশ্রীবাবা বিদ্যাসাগর পার্কে আসিয়া বসিলেন।

কয়েকটী শিশু খেলা করিতেছিল।

শিশুর মত হও

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মনকে কর শিশুর মত সরল, সুন্দর, নিষ্পাপ। তবে পাবে শান্তি, তবে হবে উন্নত। সাধকদের সর্ব্বকালের প্রার্থনাই হচ্ছে,—"মা আমারে দয়া ক'রে শিশুর মত ক'রে রাখ।" সাধক মনোমোহন দত্তের রচিত গানের এই পদটী আমার এমন ভাল লাগে যে কি বল্‌ব। তার পরের পংক্তিটীই হচ্ছে,—"শৈশবের সৌন্দর্য্য ছেড়ে বড় হ'তে দিও না'ক।" শিশুর সৌন্দর্য্য তার সরলতা। শিশুতে আকর্ষণ তার প্রেম-মাখা 'মা' 'মা' বুলি। শিশুর মত হও, তবেই প্রকৃত সাধক হ'লে। সহজ বিশ্বাস নিয়ে, সম্পূর্ণ নির্ভর নিয়ে ভগবান্‌কে গালভরা আর প্রাণভরা ডাকে ডাক।—

যতদিন না নিবি কোলে,
ততদিন ডাকিব মা
আকুল রোলে।
চুষিকাঠি দিলে হাতে
থেমে কি যাব মা তাতে?
মা-হারা শিশু কি কভু
ছলায় ভোলে?

মা তোর আঁচল ধরি'
ভূমে দিব গড়াগড়ি ;
দেখিব, কেমনে বুকে
না নিস্ তুলে।

বহুবার শ্রীশ্রীবাবা স্বরচিত এই সঙ্গীতটী মৃদুকণ্ঠে গাহিলেন। তৎপরে নিমীলিত নেত্রে নামজপ করিতে লাগিলেন। সঙ্গী যুবকেরাও যে যেভাবে যেখানে বসিয়াছিল, সেইখানে নামজপে বসিয়া গেলেন।

কলিকাতা
১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত প্রায় সমাসন্ন। রজনী শেষ যামে আরূঢ়া। একটী যুবক নিঃশব্দে গৃহদ্বারে দীর্ঘকাল প্রতীক্ষমাণ।

শ্রীশ্রীবাবা শয্যাত্যাগ করিয়া দুয়ার খুলিতেই যুবককে নিঃস্পন্দ দেহে দণ্ডায়মান দেখিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিরে, এমন সময়ে কেন ?

যুবক সংক্ষেপে এবং অস্পষ্ট ভাবে যাহা বলিলেন বা বলিতে চেষ্টা পাইলেন, তাহা স্পষ্ট বোধগম্য হইল না।

দীক্ষায় সংশয়।

শ্রীশ্রীবাবা যুবকটীকে লইয়া রাস্তায় বাহির হইলেন। বলিলেন,—পায়ের তালে তালে নামজপ কত্তে থাক্।

যুবক কিছুক্ষণ তাহা করিবার পরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিন্তু কোন্ নামজপ কর্ব্ব, তা'ত' আপনি বলেন নি !

শ্রীশ্রীবাবা।—যে নাম ভাল লাগে।

যুবক পুনরায় কতক্ষণ নিঃশব্দে চলিয়া পরে বলিলেন,—নাম নির্ব্বাচনে কষ্ট হচ্ছে, সংশয় আস্ছে।

শ্রীশ্রীবাবা—সংশয় কেন ?

যুবক।—সংশয় সংস্কারের নির্দ্দিষ্ট ভাবে কোনও একটা মাত্র নামের প্রতি আমার তেমন জেদ নেই। কিন্তু দিন কয়েক হয় একজন সাধু মহাপুরুষকে দেখতে গেলাম। উদ্দেশ্য মাত্র দর্শন করা। একজন একজন ক'রে একা তাঁর দর্শনে যেতে হয়। আমি যাই গিয়ে তাঁকে প্রণাম করেছি, অম্‌নি তিনি একটা মন্ত্র দিয়ে ফেল্লেন। বল্লেন,—এই তোর গুরুমুখ হয়ে গেল। আমি তাঁর কাছে দীক্ষা নেবার জন্য যাইনি, কিন্তু তিনি একটা মন্ত্র আমাকে দিয়ে দিলেন। এতে আমার সংশয় এসেছে।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আরে বাছা, নাম জপা দিয়ে কথা। কে দিলেন, কেন দিলেন, সে সব ভাবনা কেন কর? একজন যখন ভালবেসে ভগবানের একটা নাম দিয়েছেন, তখন সেই নামটাই জপ্‌তে দোষ কি? নাম ত' আর শয়তানের দেন নি, নামটা দিয়েছেন ভগবানের। দাতা ভালো লোকই হোন আর মন্দ লোকই হোন, জিনিষটা ত' আর মন্দ নয়! সেই নামই জ'পে যাও।

যুবক পথ চলিতে চলিতে কথানুযায়ী কার্য্য করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন,—এভাবে মন্ত্র দেবার তাঁর কোন্ প্রয়োজন ছিল?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আচ্ছা, বিকেলে তা বল্‌ব। এখন কথার সময় নয়, এ সময়টা কাজের সময়। এস আস্তে আস্তে পথ চলি আর নামজপ কত্তে থাকি।

অপরাহ্নে পূর্ব্বোল্লিখিত যুবক ব্যতীত আরও বহু উপদেশার্থী আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবা নিজে নিজেই কথা আরম্ভ করিলেন।

দীক্ষা এক বদ্ধমূল প্রথা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দীক্ষা দান এবং দীক্ষা-গ্রহণ এমন একটা বদ্ধমূল প্রথা যে, ভারতে জন্মগ্রহণ ক'ল্লে এটা ছাড়া আর ধর্ম্মোন্নতি কারো যে কোনো প্রকারে হ'তে পারে, একথা প্রায় কেউ স্বীকারই করেন না। যাঁরা সাধন ভজন ক'রে আধ্যাত্মিক উন্নতি কত্তে চান, তাঁদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জনেরই মত এই যে, দীক্ষা না নিলে সাধনের সিদ্ধি অর্জ্জন অসম্ভব। ধ্রুব ভগবান্‌কে ডাক্‌বেন,—পুরাণকার কাহিনীর ভিতর দিয়ে জলের মত সরল ক'রে বুঝিয়ে দিলেন, নারদ

ঋষি গুরু হ'য়ে এসে দীক্ষা না দিয়ে গেলে ধ্রুবকে পদ্মপলাশ-লোচন শ্রীহরি দেখা দিতে পাচ্ছেন না। পল্লীগ্রামে যাও, দেখবে, নিতান্ত অশিক্ষিতা গ্রাম্য-রমণীর ভিতরে পর্য্যন্ত এ ধারণা দৃঢ় হ'য়ে আছে যে, দীক্ষা না নিলে হাতের জল শুদ্ধ হয় না। এমন দৃঢ়মূল ধারণা এবং বদ্ধমূল প্রথা যে দেশে, সে দেশে যে সহস্র সহস্র দীক্ষাদাতা থাকবেন, আর লক্ষ লক্ষ দীক্ষা-গ্রহীতা থাক্‌বেন, এতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি ?

সুদীক্ষা ও কুদীক্ষা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এ সব দীক্ষাপ্রার্থীর মধ্যে কেউ কেউ গভীর প্রাণের আবেগ নিয়ে দীক্ষা চাইতে যায়। এদের দীক্ষা সুদীক্ষা। এসব দীক্ষাদাতাদের মধ্যে কেউ কেউ জীবন-ভরা তপস্যা ক'রে সেই তপস্যাকে দীক্ষার্থীর ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট ক'রে দেবার উদ্দেশ্যে দীক্ষা দেন,—এঁদের দীক্ষাও সুদীক্ষা। যে স্থলে দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের দিক্ থেকেই দীক্ষা এ ভাবে সুদীক্ষা হয়, সে স্থলেই শ্রেষ্ঠ দীক্ষা হ'য়েছে ব'লে মনে কত্তে হবে। দীক্ষাপ্রার্থীদের মাঝে আবার অনেকে শুধু প্রথার মান রাখবার জন্যই দীক্ষা নেয়। সাধন করার ইচ্ছে নেই, সাধনের বলে কাম-কলুষের উর্দ্ধে যাবার প্রেরণা নেই, 'আমি দীক্ষিত' মাত্র এই কথাটুকু বল্‌বার জন্যই যেন দীক্ষা নেওয়া। এদের দীক্ষা কুদীক্ষা। দীক্ষা-দাতাদের মধ্যে অনেকে নিজেরা কোনও সাধন-ভজন কর্ব্বেন না বা মনে মনে সাধন-ভজনে তেমন বিশ্বাসীও নন, কিন্তু কারণ-বিশেষে লোককে দীক্ষা দিয়ে থাকেন। এদের দেওয়া দীক্ষা কুদীক্ষা। যে স্থলে দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের দিক্ থেকেই দীক্ষা কুদীক্ষা হয়, সেখানে অতিশয় অপকৃষ্ট দীক্ষা হয়েছে ব'লে মনে কত্তে হবে। দীক্ষাই যদি নিতে হয়, তা'হলে সুদীক্ষাই নেওয়া সঙ্গত,—প্রাণের ব্যাকুল আগ্রহকে জাগিয়ে, হৃদয়-মন ভবিষ্যৎ আধ্যাত্মিক উন্নতির আশায় উৎসাহে উল্লসিত ক'রে তবে দীক্ষা নেওয়াই কর্ত্তব্য। আর দীক্ষা যদি কাউকে দিতে হয়, তাহ'লে মনকে বাসনার উর্দ্ধে রেখে, লালসার অতীতে রেখে, সংসার-অরণ্যের গহন পথের বাইরে রেখে অতীন্দ্রিয়ের মধুর রস আস্বাদন কত্তে কত্তে তবে দেওয়া উচিত।

দীক্ষা-গ্রহণের পূর্ব্বে আত্ম-পরীক্ষা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমরা যে ছুটাছুটী ক'রে দীক্ষা নেবার জন্য এখানে আস বা আরো দশ জায়গায় যাও, তোমাদের কিন্তু বিশেষভাবে বিবেচনার প্রয়োজন আছে যে, প্রাণ সত্য সত্যই ব্যাকুল হ'য়েছে কি না। তোমাদের বিচার ক'রে দেখার দরকার যে, দীক্ষা নিয়ে সত্যি সত্যি প্রাণপণে সাধন কর্ব্বে কি না। নিজের মনকে ভাল ক'রে বুঝে নিয়ে এ কাজে নামা ভাল। দীক্ষা গ্রহণের মানে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ,—এই প্রতিজ্ঞা যে, তুমি আমৃত্যু সিংহবিক্রমে প্রদর্শিত পথে নির্ভয়ে পাদচারণা কর্ব্বে, একদিনের জন্য থাম্‌বে না, একদিনের জন্য পশ্চাৎপদ হবে না। যুদ্ধে চাক্‌রী নিতে গেলে যেমন bond (চুক্তি-পত্র)এ সই দিতে হয় যে, গোলাই পড়ুক আর শত্রু-হস্তে বন্দীই হই, তবু duty (কর্ত্তব্য) ছেড়ে পালাব না,— দীক্ষা নেওয়া ঠিক্ সেই রকম একটা bond (চুক্তি-পত্র) সই করা। এজন্যই দীক্ষা নেবার আগে খুব ভাল ক'রে আত্মপরীক্ষা দরকার। দু'দিন দেরী ক'রে দীক্ষা নিলে কোনো ক্ষতি হয় না, কিন্তু আত্মপরীক্ষা না ক'রে দীক্ষা নিলে অনেক অসুবিধাতে পড়্‌তে হয়।

দীক্ষাদাতাদের রুচিভেদ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দীক্ষাদাতাদের মধ্যেও অনেক সাচ্চা লোক আছেন, অনেক মেকী গুরু আছেন। কে খাঁটি আর কে নকল, তা' নিয়ে আমার আলোচনার কোনও দরকার নেই। আমি খাঁটি লোকদের কথাই বল্‌ব। খাঁটি দীক্ষাদাতাদের ভিতরেও অনেক প্রকারের রুচির লোক দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কেউ কেউ আছেন, শিষ্যকে বছরের পরে বছর পরীক্ষা ক'রে তবে দীক্ষা দেন। কেউ আছেন,—পরীক্ষা কত্তে সময় বেশী নেন না, একটী স্নিগ্ধ দৃষ্টির ভিতর দিয়েই শিষ্যের আভ্যন্তরীণ উপাদানগুলির বিশেষত্ব ধ'রে ফেলেন, কিন্তু তার ভিতরে অনুকূল ভাবের পরিপুষ্টির জন্য দিনের পর দিন মাসের পর মাস প্রতীক্ষা করেন। কেউ আছেন,—মনে মনে ভাবেন যে, যোগ্য হোক্ কি অযোগ্য হোক্, ব্যাকুল হোক্ কি উদাসীন হোক্, প্রার্থী হোক্ কি অপ্রার্থী হোক্, ভক্তিমান্

হোক্ কি নাস্তিক হোক্, দীক্ষা একটা দিয়ে দিই,—তারপরে যার যেমন ভাগ্যে আছে, কালক্রমে এ দীক্ষার একটা না একটা সুফল তার জীবনের উপরে আস্‌বেই আস্‌বে। দীক্ষাদাতাদের এ রকম বহুবিধ রুচির ভেদ আছে।

অসঙ্গত দীক্ষা গ্রহণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যিনি দীক্ষা দেবেন, দেওয়াটা তাঁর কোন্ ক্ষেত্রে সঙ্গত হচ্ছে, আর কোন্ ক্ষেত্রে অসঙ্গত হচ্ছে, সে বিচারের ভার তাঁর উপরেই থাক্। কিন্তু যিনি দীক্ষা নেবেন, নেওয়াটা তার পক্ষে সঙ্গত হচ্ছে কি না, সেই বিচার কত্তেই হবে। গঙ্গায় স্নান সেরে একটী কুমারী মেয়ে ঘাটের উপরে দাঁড়িয়ে কাপড় বদলাচ্ছে, আর একটী আগন্তুক গিয়ে বল্ল,—আয় ছুঁড়ী, আমি তোকে বিয়ে কর্ব্ব। অমনি কি নির্ব্বিচারে মেয়েটীর মেনে নেওয়া উচিত যে, এই আগন্তুককে তার বিয়ে কত্তেই হবে? বিয়েতে যেমন হঠাৎ কথায় রাজি হওয়া যায় না, দীক্ষাতেও তেমন হঠাৎ ক'রে রাজি হওয়া যায় না। মেয়েটী ত' বিয়েতে রাজী হ'ল না, কিন্তু আগন্তুক তার চুলের মুঠি ধ'রে নিজের বাড়ী নিয়ে গিয়ে মন্ত্র প'ড়ে ফেল্‌ল। এতে কি বিবাহ সিদ্ধ হয়? এর নাম বলাৎকার। দীক্ষাও এ ভাবে কখনো সিদ্ধ হ'তে পারে না। দীক্ষাদাতা হয়ত খুবই সাধু, খুবই মহৎ, খুবই তপস্বী,—কিন্তু তা' ব'লেই গায়ের জোরে দেওয়া দীক্ষাকে দীক্ষার সম্মান দিতে তুমি বাধ্য নও। তোমার এ অবাধ্যতায় কোনো পাপ হবে না। দক্ষিণেশ্বর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধনার স্থান ব'লে এই পবিত্র তীর্থ-দর্শন মানসে তুমি হয়ত গিয়েছ,—দেখলে একটী শিবমন্দিরের পাশে একজন মহাপুরুষ ব'সে। তিনি তোমাকে কাছে ডেকে নিয়ে বল্লেন,—'ওহে গোপনে তোমার সাথে একটু কথা আছে।' তুমি বল্লে,—'বেশ ত' বলুন।' তিনি বল্লেন,—'প্রতিজ্ঞা কর, আমি যা বল্‌ব, তা' এ দুনিয়ায় আর কারো কাছে প্রকাশ কত্তে পার্‌বে না।' তুমি রাজী হ'লে। তিনি বল্লেন,—'চুপ ক'রে বস, চ'খ বোজ।' তুমি তাই কল্লে। অম্‌নি তিনি হঠাৎ তোমার কানের কাছে তাঁর মুখটী এনে উচ্চারণ কল্লেন—'ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম।' তারপরেই বল্লেন,—'এ নাম জপ কত্তে থাক।' তুমি ত' জপ ক'রেই যাচ্ছ, আর ভাবছ, এর পরে বোধ হয় ভদ্রলোক তাঁর গোপন

কথাটী বল্‌বেন। কিন্তু তিনি আর গোপন কথা কিছু বল্লেন না,—তুমি চ'খ খুল্‌তেই তোমাকে বল্‌লেন—'এই তোমার দীক্ষা হল, এখন তোমার নাম-ঠিকানাটী আমাকে দাও।'—এরূপ দীক্ষাকে দীক্ষা ব'লে মান্‌তে তুমি বাধ্য নও। প্রয়াগে গিয়েছ মাঘ-মেলা দেখতে। একজন সাধুর শিষ্যগণ তাঁর বিশাল এক প্রতিচিত্রের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে মেঘমন্দ্রে স্তোত্র পাঠ কচ্ছে, আর আরতি চালাচ্ছে। তুমি একজনকে জিজ্ঞেস কল্লে যে, এত বড় একজন মহাপুরুষের সাক্ষাৎ চরণ-দর্শনের কোনও পন্থা আছে কিনা। শিষ্যরা একজন তোমাকে তাঁর চরণ সমীপে নিয়ে গেলেন। তুমি মহাপুরুষকে প্রণাম ক'রে বল্লে,—'কৃপা ক'রে কিছু উপদেশ দিন।' তিনি বল্লেন,—'কাল ভোরে স্নান ক'রে একটা হর্ত্তুকী নিয়ে আস্‌বে।' তুমি ভাবলে, হরিতকীটী নিয়ে গেলে বোধ হয় কতই প্রাণ-মাতান মন-মাতান উপদেশ শুন্‌তে পাওয়া যাবে। কিন্তু যখন হরতকী নিয়ে যথাকালে গিয়ে উপস্থিত হ'লে, তখন তিনি তোমাকে টেনে তাঁর কোলের উপরে তুলে নিয়ে বল্‌লেন,—'চ'খ বোজ।' তুমি এমন একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপারের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলে না। তোমার প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বও এমন প্রবল নয় যে, হঠাৎ একটা বুদ্ধি ঠাউরে উঠতে পার। এর মধ্যেই তিনি তোমার কাণে একটী মন্ত্র উচ্চারণ কল্লেন,—'ওঁ নমঃ শিবায়।' তারপরে তোমাকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বল্লেন,—'যা, এই তোর দীক্ষা হ'ল।' তুমি সেই নিভৃত গৃহ থেকে বেরিয়ে আস্‌তেই গুরুদেবের শিষ্যেরা তাঁদের গুরু-ভ্রাতাদের তালিকার খাতায় তোমার নাম ঠিকানা টু'কে নিলেন।—এরূপ দীক্ষাকে দীক্ষা ব'লে মান্‌তে তুমি বাধ্য নও। তবে, দেশজোড়া সংস্কার রয়েছে যে, মহাপুরুষ-বাক্য লঙ্ঘন কত্তে নেই। সুতরাং তোমার মনে খচখচি থাকতে পারে যে, মন্ত্র যখন দিয়েছেন, তখন তাঁর বাক্য যদি না রাখি, তবে আবার কোন জানি বিপদ ঘটে। তেমন স্থলে ঐ নাম তুমি জ'পে যেতে থাক, পরে সময়ের বশে যা' হবার তাই হবে।

সুদীক্ষার প্রমাণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন—দীক্ষা সুদীক্ষা কিনা, তার প্রমাণ হচ্ছে এই যে দীক্ষা

গ্রহণ মাত্র বক্ষ থেকে পাষাণ ভার নেবে যাচ্ছে, এরূপ বোধ জাগছে কিনা। দীক্ষা সুদীক্ষা কিনা তার প্রমাণ এই যে, দীক্ষার পরমুহূর্ত্ত থেকে মনে হবে যেন এক অপূর্ব্ব আশ্রয়, এক অপূর্ব্ব অবলম্বন, এক অদ্বিতীয় মহাসহায় তুমি পেয়েছ। এরূপ যদি হয়, তবে হঠাৎ পাওয়া দীক্ষাও অনাদরের নয়।

দীক্ষাদাতার ব্যক্তিত্ব

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—দীক্ষা থেকে দীক্ষাদাতার ব্যক্তিত্বকে পৃথক্ করে নেওয়া কঠিন কথা। এটা অবতারবাদের দেশ। তাই সব ব্যাপারেই মানুষের ব্যক্তিত্ব একটা বিরাট জিনিষ। তোমার নিজের ব্যক্তিত্ব ছাড়া জগতের আর সকলের ব্যক্তিত্বই তোমার নিকট অতীব প্রধান। পাশ্চাত্য দেশে নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রধান ক'রে জগতের সকলের ব্যক্তিত্বকে খর্ব্ব করা হয়েছে। আমাদের দেশে নিজের ব্যক্তিত্বকে একেবারে পিষে মেরে ফেলে অপরের ব্যক্তিত্বকে প্রধান করা হয়েছে। সংস্কৃতিগত এই পার্থক্যের দরুণই এদেশে অবতারবাদ এত গভীর শিকড় চালাতে সমর্থ হয়েছে। ফলে, দীক্ষার ব্যাপারেও ক্রমশঃ দীক্ষাদাতাকে ব্রহ্মের অবতাররূপে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছে। গুরুকে করা হয়েছে ব্রহ্ম, এর পিছনেই অসম্ভব রকমের প্রচার শক্তির ব্যয় করা হ'য়েছে; ব্রহ্মকে গুরু ব'লে ধারণা কর্ব্বার প্রয়োজনের দিকে শক্তি বা প্রতিভা বা প্রচার-প্রচেষ্টা প্রয়োগ করা হয় নি। তারই জন্য দীক্ষাদাতার ব্যক্তিত্ব একটা অতীব প্রধান জিনিষ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এর ভাল ও মন্দ দুটা দিক্ই আছে। কিন্তু যেখানে গুরুর ব্যক্তিত্বের প্রভাবকে এত অধিক ক'রে স্বীকার করা হয়েছে, সেখানে কিছুতেই কারো সহজে বা হঠাৎ বা না ভেবে চিন্তে, আত্মপরীক্ষা না ক'রে, দীক্ষা-দাতাকে ভাল ক'রে না জেনে-শুনে দীক্ষা নেওয়া উচিত নয়।

নবযুগের গুরুবাদ

সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এক নব যুগ সম্মুখে আস্ছে। সেই যুগে দীক্ষা

থাক্‌বে, কিন্তু দীক্ষাদাতা হবেন গৌণ। তিনি অনাদরের পাত্র হবেন না, বরং প্রভূত কৃতজ্ঞতার ভাজনই হবেন, কিন্তু দীক্ষা দান ক'রে তিনি মুণ্ড কিনে নেবেন না, দীক্ষা দিয়ে তিনি সেই নিত্যগুরুরই শিষ্য তোমাকে কর্ব্বেন, যাঁর শিষ্য তিনি নিজে। দীক্ষাদাতা সেই যুগে দীক্ষা-গ্রহীতার গুরু নন, গুরু-ভ্রাতা। সবাই তখন একই পথের যাত্রী মাত্র, কেউ বা অগ্রগামী কেউ পশ্চাৎবর্ত্তী, কিন্তু সবাই একে অন্যের ভাই বা বোন, কেউ গুরু নন, বা কেউ শিষ্য বা শিষ্যা নন। বহু-দেব-বাদে লাঞ্ছিত দেশে অবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি যে গুরুবাদ, একলক্ষ্য জাগ্রত সমাজে তার রূপান্তর হবে। সবাই তখন এক গুরুর শিষ্য, শত শত গুরুর তখন প্রয়োজন নেই। সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় আমি এই নর-তনু বহন ক'রে বেড়াচ্ছি।

উপদেশ-শ্রবণার্থীদের সংখ্যা অত্যধিক হওয়াতে এই সময়ে শ্রীশ্রীবাবা কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে রওনা হইলেন। কিন্তু সেখানে একটু জন-সমাবেশ ছিল। সুতরাং হাটিতে হাটিতে সকলে আসিয়া বীডন-উদ্যানে বসিলেন।

বিদ্যার্জ্জনের ফল

একজন প্রশ্ন করিলেন—বিদ্যার্জ্জনের ফল কি?

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন—ফলং ভিক্ষাটনং অর্থাৎ চাকুরীর উমেদারীতে হাট্‌তে হাট্‌তে জুতোর শুকতলা ক্ষয় করা।

সকলেই সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়া উঠিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা সকৌতুকে পুনরায় বলিলেন—বিদ্যার্জ্জনের অপর ফল কি জান? ফলং পরপদসেবনং অর্থাৎ চাকুরী লাভ।

সকলে পুনরায় হাসিয়া উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন—এ ত' গেল হাসির কথা। আসল কথায় চল। পরপদ মানে পরমপদ, ভগবানের চরণ। ভগবানের চরণ-সেবাই হচ্ছে বিদ্যার চরম ফল। চৈতন্য-ভাগবতে একটা চমৎকার পয়ার আছে—

"সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥"

বিদ্যা সেখানেই সার্থক যেখানে দেখা যাবে যে, চিত্ত এবং বিত্ত, ধন এবং মন সবই ভগবানের পায়ে সমর্পিত হয়েছে। তোমার চিত্তকে যখন তুমি নিজের সেবায় নিয়োগ কর না, তোমার বিত্তকে যখন তুমি স্বকীয় ইন্দ্রিয়-পরিতর্পণের উপায় বা উপকরণরূপে ব্যবহার কর না, পরন্তু উভয়কেই যখন নিয়োজিত কর একমাত্র পরম-প্রভুর সেবার্থে, পরমপ্রভুর তৃপ্ত্যর্থে, তাঁর প্রিয় কার্য্য সাধনার্থে, তখনই বুঝতে হবে যে বিদ্যালাভ তোমার নিষ্ফল হয় নি।

বিদ্যার্জ্জনের উদ্দেশ্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন—বিদ্যার্জ্জনের উদ্দেশ্য অজ্ঞানতার নাশ। আসক্তি অজ্ঞানতার নিত্যসঙ্গিনী। একটী গেলে অপরটী আর থাকে না। আসক্তির বিনাশে অজ্ঞানতার বিনাশ, অজ্ঞানতার বিনাশে আসক্তির বিনাশ। সুতরাং বিদ্যার্জ্জনের উদ্দেশ্য আসক্তিরও বিনাশ। নিজেকে কর্ত্তা ব'লে জানাই অজ্ঞানতা, ভগবান্‌কে কর্ত্তা ব'লে জানাই জ্ঞানবত্তা। বিদ্যালাভের উদ্দেশ্য জান্‌বে, ভগবান্‌কে সব কিছুর কর্ত্তা, প্রভু এবং একমাত্র অদ্বিতীয় অধীশ্বর ব'লে জানা। এই জন্যই বলা হয়,—সা বিদ্যা যা পরাবিদ্যা।

অপরা বিদ্যার ভিতর দিয়া পরাবিদ্যা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন— স্কুল-কলেজে যে বিদ্যা লাভ কচ্ছ, তা' হচ্ছে অপরা বিদ্যা অথবা অবিদ্যা। শুধু অহংকারের আস্ফালন, শুধু ভোগলালসার বিস্তার, শুধু কামনা-বাসনার ইন্ধন। ভক্তরাজ প্রহ্লাদকেও পাঠশালে গিয়ে এ সব পড়তে হয়েছে, আর তোমরা পড়বে না? পড়, পড়ায় হেলা ক'রো না; মাত্র একটু লক্ষ্য রেখে চ'লো। বাস্ তা' হ'লেই হবে। একটু লক্ষ্য রেখো যে, মনটা যেন ভগবচ্চরণের সান্নিধ্য না ছাড়ে। তারপরে তোমাকে ক্লাসে ব'সে দুষ্মন্ত আর শকুন্তলার প্রেমাভিনয় পড়তে হোক বা রোমিও-জুলিয়েটের কাহিনীর পাতাই উল্টাতে হোক্। পার্থিব অপার্থিব যে কোনও ব্যবহারের বর্ণনা পড়, তার ভিতর দিয়েই মনকে অবিরাম চালাও শ্রীভগবানের পানে। তাহ'লে একদিন হঠাৎ দেখতে পাবে

যে, অপরা বিদ্যা কেমন ক'রে পরাবিদ্যার দুয়ার খুলে দিয়েছে। ব্যাপারটা হবে আশ্চর্য্যবং। ডাক্তারী পড় আর ইঞ্জিনিয়ারীং পড়—এ পড়ার ভিতর দিয়েও ভগবানে অনুরক্তি অর্জ্জন সম্ভব। কি আশ্চর্য্য-সামঞ্জস্যপূর্ণ মানবশরীরাদির গঠন, আর কি আশ্চর্য্য-শৃঙ্খলাপূর্ণ তাপ, আলো, ধ্বনি, আকর্ষণ ও বিকর্ষণের নিয়ম। কলেজের পাঠ পড়তে পড়তেও তার ভিতর দিয়ে পরমপ্রভুর অপার অসীম মহিমা লক্ষ্য ক'রে যাও। অবিদ্যাই ব্রহ্মবিদ্যার সেতু হবে।

অভ্যাস-যোগী হও

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অনভ্যাসে বিদ্যা হ্রাস পায় ব'লে একটা কথা আছে ত? হ'তে হবে উদগ্র একাগ্র নিষ্টাবান্ অভ্যাস-যোগী। যেখানে যা দেখ, যেখানে যা শোন, যেখানে যা বোঝ, তারই ভিতরে ভগবৎ-স্মরণ ভগবন্মনন অবিরাম, অবি-শ্রাম অফুরন্ত স্রোতে চালাতে থাক। এই কাজটীতে যেন এক বিন্দুও শৈথিল্য না আসে। দৃঢ়পণ থেকে এক চুলও ন'ড়ো না।

মামেকং শরণং ব্রজ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সর্ব্বশাস্ত্রের চরম কথা কি জানো? 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' নিজের অহং-বুদ্ধিকে এমন ক'রে লোপ কর যেন কোন্‌টা তোমার কর্ত্তব্য, কোন্‌টা তোমার অকর্ত্তব্য, এই বিচারের দায় তোমার নিজের উপরে রাখবার রুচি পর্য্যন্ত না হয়। নিজেকে সর্ব্বতোভাবে শ্রীভগবানের জিনিষ কর, নিজেকে তাঁর পায়ে এমন ভাবে সঁপে দাও, যেন বাসনার ধর্ম্মেও তাঁর কাছ থেকে কিছু চাইবার প্রবৃত্তিটুকু না মাথা জাগাতে পারে। নিজেকে সম্যগ্‌রূপে তাঁর ক'রে ফেল এবং তাঁর প্রয়োজনে তিনি তোমাকে তাঁর প্রীতিকর যে কাজে ইচ্ছা, যেমন ভাবে ইচ্ছা, নিরঙ্কুশ ভাবে ব্যবহার ক'রে সন্তোষ লাভ করুন। স্কুল-কলেজে পড়্‌তে হচ্ছে ব'লেই যে তোমার এই চরম সুকৃতি লাভ কখনো সম্ভব হবে না, এমন ভ্রান্ত ধারণা মনের ভিতরে রেখ না।

চাঁদপুর
১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬

কয়েকটী বালক একখানা হস্তলিখিত পত্রিকা নিয়া শ্রীশ্রীবাবাকে দেখাইতে আসিয়াছেন।

হাতের লেখা সংবাদ-পত্র

শ্রীশ্রীবাবা পত্রিকাখানা মনোযোগ সহকারে আদ্যোপান্ত দর্শনের পরে বলিলেন,—তোমরা একটী নূতন জিনিষ ক'রেছ হে! হাতে-লেখা পত্রিকা অনেক স্থানেই হচ্ছে, কিন্তু সে সবই সাহিত্য-বিষয়ক বা খেলা-ধূলা-সম্পর্কিত। হাতের লেখা 'সংবাদ-পত্র' কোথাও দেখিনি। এখানে তোমরা একটী বিশেষত্বের পরিচয় দিয়েছ। আরো নূতনত্বের পরিচয় দিয়েছ, তোমাদের সংবাদ সংগ্রহে। নূতন বাজারে, পুরাণ বাজারে, কালীবাড়ীতে, গোপালের আখ্‌ড়ায়, এই সহরের যেখানে যা যা ঘটেছে ব'লে সংবাদ পেয়েছ, তাই দিয়েছ। তবে, পত্রিকা যখন হাতের লেখা, তখন তোমরা রাজনৈতিক কোনো খবরাখবর এতে দিও না। কথায় বলে—'শতং বদ, মা লিখ'। গান্ধীজী যখন দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে প্রথমে ভারতে এলেন, তখন আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয়দের রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দেবেন স্থির কর্লেন। মহামতি রাণাডে বল্লেন,—বাছা, যত ইচ্ছা বক্তৃতা দাও, ছাপিয়ে নিয়ে দাও, শুধু মুখে ব'লে যেও না, তাতে ফ্যাসাদ ঘট্‌বে। অর্থাৎ কথাটা দাঁড়াল,—শতং ছাপো, মা বদ। পত্রিকা যখন ছেপে বের কত্তে পার্‌বে, তখন দস্তুরমত আইন জেনে তারপরে দরকার হয়, রাজনীতিক সংবাদাদি ছাপ্‌বে। কিন্তু আইন তোমার জানা থাকুক আর না থাকুক, হাতের লেখা সংবাদপত্রে রাজনীতির ছন্দাংশও যেন না থাকে।

কিরূপ সংবাদ প্রকাশ করা উচিত

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবা সংবাদপত্রের সম্পাদনা সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সংবাদ সংগ্রহ ক'রে পাঠকদের কাছে তা' পরিবেশন

করাই হচ্ছে সংবাদপত্রের কাজ। কিন্তু যে সংবাদ পেলে, সে সংবাদই তুমি প্রকাশ কত্তে পার না। যে সংবাদ পাঠে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে লোকের হিত হবে, তাই পরিবেশন কত্তে পার। এমন অনেক সংবাদ আছে, যা প্রকাশে সমাজের কোনো লাভ নেই, তা' প্রকাশ ক'রে কাগজ, কালী, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করা নিতান্ত অপব্যয় জান্‌বে। যে সংবাদের উদ্দেশ্য অপরকে হেয় করা বা কোনো সৎপ্রয়াসের বিঘ্ন উৎপাদন করা, চমকপ্রদ হ'লেও সে সংবাদ ভদ্র-সম্পাদকের পক্ষে প্রকাশ অনুচিত।

সম্পাদনের ভঙ্গী

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এমন অনেক সংবাদ আছে, যা অতি কদর্য্য এবং পরিবেশনের অযোগ্য, কিন্তু রাঁধুনির গুণে পচা পুঁইয়ের ডাটা উত্তম স্বাদযুক্ত চর্চ্চরিতে পরিণত হ'ল এবং প্রকারান্তরে হিতকরও হ'ল। এমন অনেক সংবাদ আছে, যাকে আপত্তিজনক ব'লে কিছুতেই সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, কিন্তু সম্পাদন-ভঙ্গীর গুণে অস্পৃশ্য, অখাদ্য হয়ে পড়্‌ল। সুতরাং সম্পাদনের ভঙ্গীটাও একটা মস্ত বড় জিনিষ।

সম্পাদকীয় সমালোচনা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অনেক সংবাদপত্র-সম্পাদক আছেন, যাঁরা মনে করেন, নিছক সংবাদ পরিবেশন ক'রে যাওয়াই আমার কাজ, তার ভালমন্দ বিচার পাঠক-পাঠিকা নিজেরা কর্বেন। আবার অনেক সম্পাদক আছেন, তাঁরা মনে করেন যে, সংবাদ যা বেরুবার বেরুল, কিন্তু এই সংবাদটীর উপরে আমার সমালোচনা কি, তাও পাঠক-পাঠিকাদের জানা দরকার। শেষের শ্রেণীর সম্পাদকদের সম্পাদিত সংবাদপত্রই পাঠক-সমাজে আদর বেশী পায়।

সম্পাদকের অপক্ষপাত

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু সমালোচনায় অপক্ষপাত দৃষ্টি রক্ষা করা বড়ই কঠিন। সকল বিষয়কেই দু'দিক থেকে আলোচনা করার দক্ষতা হয়ত অনেকেরই

থাকে, কিন্তু সে রুচি সকলের থাকে না। মনের পক্ষপাত শুধু একদিক্ থেকেই বিচার কত্তে প্ররোচনা দেয়। দলাদলি এবং সাংবাদিকের কলহ এ ভাবেই সৃষ্ট হয়। অপক্ষপাত মন নিয়ে সকল ব্যাপারের ভাল ও মন্দ দুইদিক্ বিচারের চেষ্টা ও সাধনা সাংবাদিককে সম্ভ্রমসম্পন্ন করে। সেরূপ সাংবাদিকই আদর্শ সাংবাদিক।

সম্পাদকের কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শুধু সংবাদ পরিবেশনই যে সম্পাদকের কর্ত্তব্য, এ কথা বল্‌লে ভুল বলা হবে। সংবাদ পরিবেশন ক'রে তার ভিতর দিয়ে পাঠকদের কর্ত্তব্যবুদ্ধির উদ্দীপন চেষ্টাও তার এক পবিত্র কর্ত্তব্য। যে কোনও একটী সংবাদ অবলম্বন ক'রে সহস্র-পৃষ্ঠাব্যাপী দর্শন-শাস্ত্র রচনা তাঁর প্রয়োজন নয়। তিনি দুটী একটী বাক্যের ভিতর দিয়েই নিজের মতামত প্রকাশ কর্ব্বেন, কিন্তু একই মত, একই পথ সম্পর্কে পাঠককে সচেতন রাখ্‌বার জন্য তাঁকে hammering (হাতুড়ি-পেটা) কত্তে হবে। পেরেকের উপরে হাতুড়ীর ছোট ছোট ঘা বারংবার পড়তে পড়তে যেমন পেরেকটাকে তেমন শক্ত দেওয়ালের ভিতরেও ঢুকিয়ে দিতে পারে, সম্পাদকের কাজও তাই।

তীর্থ কাহাকে বলে

মধ্যাহ্নের পরে শ্রীশ্রীবাবা বালকদের দ্বারা গঠিত একটী আত্মোৎকর্ষ-বিধায়ক সমিতির গৃহে আগমন করিলেন। উপস্থিত বালকবৃন্দের প্রশ্নানুযায়ী বহু সৎকথার আলোচনা হইতে লাগিল।

এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তীর্থবাসে চিত্ত নির্ম্মল হবে, পবিত্র হবে, এই আশাতেই তীর্থবাসের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাবা, যেখানে নিয়ত ভগবৎ-চিন্তন হয়, ভগবৎ-কথা হয়, পরনিন্দা-বর্জ্জিত সর্ব্বজীব-শুভের আলোচনা হয়, সে স্থানই তীর্থ। সর্ব্বজীব-হিতে রত, সর্ব্ব-জীব-শুভচিন্তক, আত্মসুখ-পরিত্যাগী, পরহিত-ব্রতধারী, পরনিন্দাবর্জ্জক, প্রেমময়-স্বভাবসম্পন্ন মহৎ ব্যক্তিরা যেখানে অবস্থান করেন বা গমন করেন, সেই স্থানই তীর্থ। আরো বড়

তীর্থ হচ্ছে, তোমার নিষ্কাম নিষ্কলুষ ভগবৎ-পাদপদ্মে সমর্পিত পবিত্র মন। এই তীর্থে প্রেমস্বরূপ ভগবান্ নিত্য লীলা কচ্ছেন। সেই লীলা-রস আস্বাদনই জীবনের পরম শ্লাঘ্য প্রাপ্তি।

ব্রহ্মদর্শন কাহাকে বলে

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রত্যেক জীবের অন্তরে সেই অন্তর-বিহারী বিহার কচ্ছেন। তাঁর প্রেমময় স্বভাবে তিনি প্রত্যেক হৃদয়ে প্রেম-পবনের হিল্লোল আর প্রেম-প্রবাহেব তরঙ্গ তুল্‌ছেন। সর্ব্বজীবের অন্তরের মাঝে সেই একই প্রেমময়ের প্রেম-মাধুরী-মাখা লীলাকে দর্শন করারই নাম ব্রহ্মদর্শন।

উচ্চ কে, নীচ কে ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবান্‌কে যে ভালবাসে, তাকে নীচ বা নিকৃষ্ট ব'লে জ্ঞান করার মত পাপ কিছু নেই। ভগবানে যার ভক্তির অভাব, সেই নীচ। ভগবানে যার অফুরন্ত প্রীতি, ত্রিজগতে তার চেয়ে উচ্চ আর কে আছে? উচ্চ বংশে জন্ম নিলেই কেউ উচ্চ হয় না,—ভগবানে মন-প্রাণ সঁপ্‌লেই সে উচ্চ হয়। ধনীর গৃহে জন্মিলেই কেউ উচ্চ হয় না,—ভগবান্‌কে প্রাণের প্রাণ ব'লে জান্‌লেই সে উচ্চ হয়। অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্য, দেহ-সৌষ্ঠব বা স্বাস্থ্য, কান্তি ও পুষ্টি নিয়ে জন্মালেই কেউ উচ্চ হয় না,—ভগবানকে জীবন-মরণের পরম শরণ ব'লে জান্‌লেই মানুষ উচ্চ হয়। যে তা কত্তে পারে না, সে কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেও চণ্ডালই থেকে যায়।

মহতের পথে চল

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রকৃত উচ্চজনের সঙ্গ কর, প্রকৃত উচ্চজনের বাক্য শোন, তাঁদের প্রদর্শিত ও অনুষ্ঠিত সদাচারের পথে চল,—এতেই তীর্থভ্রমণের ফল হবে, এতেই ক্রমশঃ সর্ব্বজীবের ভিতরে এক আত্মারামের দর্শন পাবে।

নাম ও সৎসঙ্গ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সর্ব্ববিধ দৈহিক, কৌলিক ও সামাজিক কদাচার বর্জ্জন

ক'রে নম্র চিত্তে সৎসঙ্গ কর, আর সর্ব্ববিধ কামনা-বিরহিত হ'য়ে ভগবানের নাম কর। এর ভিতর দিয়ে যে সৌভাগ্যের উদয় হবে, কুবেরের ভাণ্ডারও তার তুলনায় তুচ্ছাতিতুচ্ছ। 'হে ঠাকুর পেট ভ'রে খেতে দাও, হে ঠাকুর অষ্টসিদ্ধি প্রদান কর, হে ঠাকুর যশস্বী কর, যুদ্ধজয়ী কর,—এ সব প্রার্থনার সঙ্গে নামজপের কোনো সম্পর্ক রে'খ না। নাম জপ্‌বে নিষ্কাম হ'য়ে, মনের ভিতরে কোনও প্রার্থনার কোনো দাবীর ভাব না রেখে। মিষ্টি মিষ্টি কথা শুন্‌ব, এই উদ্দেশ্য নিয়েও সাধুসঙ্গ ক'রো না। মহতের প্রেমময় স্বভাবটী আমার হবে, এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সৎসঙ্গ কর্ব্বে।

মায়াময় জগতে মায়াতীত জীবন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এই মায়াময় মোহময় প্রপঞ্চময় মিথ্যা জগতে বাস ক'রেও তুমি মায়াতীত মোহাতীত প্রপঞ্চাতীত সত্যময় জীবন লাভ কত্তে পার। তার উপায় সত্যময়ের চরণে নিজেকে বিকিয়ে দেওয়া, মায়াধীশের পায়ে নিজেকে সমর্পণ করা।

প্রণব সর্ব্ব-তত্ত্বের অম্বুধি

তৎপরে প্রণব-তত্ত্বের কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জগতের যত ধ্বনি, সব এই একটী নাদে গিয়ে পর্য্যবসিত হচ্ছে। সেটি হচ্ছে 'ওঙ্কার'। যত ধ্বনি, যত সুর, যত মন্ত্র, যত গান, যত স্তব, যত বাদ্য, সব গিয়ে ঐ একটি জিনিষে নিজেকে হারিয়ে ফেল্‌ছে। কিন্তু সেই একটী জিনিষ থেকেই সব পুনরায় ফিরে আস্‌বে। জগতের যত অতীত যুগের জ্ঞান, বিস্মৃত যুগের যত ধ্যান, যত চিন্তা, যত ভাব, যত উন্নত উপলব্ধি সব একটী মাত্র নাদের ভিতরে লুকিয়ে আছে। আবার এই একটী মাত্র নাদের সাধনের ভিতর দিয়ে তা' তোমাদের কাছে এসে ধরা দেবে। প্রণবকে জান্‌বে সকল তত্ত্বের, সকল জ্ঞানের মহাসমুদ্র।

প্রণব সকল দ্বন্দ্বের অতীত

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মন্ত্রে মন্ত্রে কলহ আছে কিন্তু প্রণবের সাথে কারো দ্বন্দ্ব

নেই। এক মন্ত্র আরেক মন্ত্রকে কোথাও ভাবের দিক দিয়ে অস্বীকার করে, কোথাও বা সাধন-প্রণালীর দিক দিয়ে লঙ্ঘন করে। কিন্তু প্রণব-মন্ত্র কাউকে অস্বীকার করে না, কাউকে লঙ্ঘন করে না, কোনো মন্ত্রের তত্ত্বের সাথে বিরোধ করে না। সকলেরই পরিণতি প্রণবে, সকলেরই উদ্ভব প্রণবে, সকলের সমষ্টিভূত রূপই প্রণব,—তাই প্রণব, সকল দ্বন্দ্বের অতীত, সকল সংঘর্ষের অতীত।

প্রণবে সর্ব্বতত্ত্বের স্বীকৃতি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সাহিত্যিক প্রয়োগে 'ওম্' শব্দের মানে হচ্ছে—"হাঁ, Yes" অর্থাৎ স্বীকৃতি, সম্মতি, অনুমোদন। আধ্যাত্মিক অর্থে 'ওম্' শব্দের মানে হচ্ছে—eternal yea. যত কিছু মত, যত কিছু পথ, যত কিছু মন্ত্র, যত কিছু তন্ত্র, যত কিছু সাধন, যত কিছু ভজন, তাদের পরস্পরের মধ্যে হাজার বৈষম্য থাকুক, হাজার অসামঞ্জস্য থাকুক, প্রণব সব কিছুকেই স্বীকার ক'রে নিচ্ছেন; কোনো কিছু-কেই অস্বীকার কচ্ছেন না। ওঙ্কারের কাছে কোনো কিছুতেই আর 'না' নেই ; সব কিছুতেই হাঁ, নিত্যকাল হাঁ, অনন্ত যুগ-যুগান্তরব্যাপী হাঁ। কৃষ্ণ ভজ্‌তে চাও? জপ কর 'ওঁ কৃষ্ণ,' কোনো বাধা নেই। কালী ভজতে চাও? জপ কর 'ওঁ কালী,' কোনো বাধা নেই। 'ওঁ ক্লীং' বল্‌তেও বাধা নেই 'ওঁ ক্রীং' বল্‌তেও বাধা নেই। 'ক্লীং হুং' বল্‌তে হয়ত কেউ বাধা দেবে, শ্রীংহুং বল্‌তেও হয়ত কেউ বাধা দেবে, ক্লীং ক্রীং একত্র বলতে হয়ত বৈষ্ণবের প্রচণ্ড আপত্তি হবে, কিন্তু 'ওঁ ক্লীং' বলতে, 'ওঁ শ্রীং' বলতে, 'ওঁ ক্রীং' বল্‌তে বা 'ওঁ হুং' বলতে কারো আপত্তি হ'বে না,—তান্ত্রিকের না, বৈদিকের না, বৈষ্ণবের না, শাক্তের না বা শৈবের না। কারণ ওঙ্কার সর্ব্ব-তত্ত্বের স্বীকৃতির মন্ত্র। এজন্যই প্রণবকে বলা হয় মহামন্ত্র।

প্রণবই সর্ব্বমন্ত্রের প্রাণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রণব সর্ব্বমন্ত্রের প্রাণ। দেহের ভিতরে লক্ষ্য করলেই প্রাণের ক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু প্রাণকে যেমন দেখতে পাওয়া যায় না, ঠিক তেমনি হ্রীং বল, শ্রীং বল, ক্রীং বল, ক্লীং বল, প্রত্যেক মন্ত্রের ভিতরেই ওঙ্কার

প্রাণরূপে রয়েছেন, কিন্তু স্থূল দৃষ্টিতে তা' দেখা যায় না। যে-কোনো মন্ত্রের একাগ্র সাধন কত্তে কত্তে সেই প্রাণ-স্বরূপ ওঙ্কারের দর্শন পাওয়া যায়। অর্থাৎ তখন হ্রীং-এর হ্ থাকে না, র থাকে না, দীর্ঘ ঈ থাকে না, অনুস্বার থাকে না, অথচ অবিরাম নামের ঝঙ্কার চল্‌তে থাকে। অর্থাৎ তখন ক্লীং-এর ক থাকে না, ল থাকে না, ঈ থাকে না, অনুস্বার থাকে না, কিন্তু নামের অবিচ্ছেদ গুঞ্জন মুখর প্রবাহ চলতে থাকে। প্রণবই যে সর্ব্বমন্ত্রের প্রাণ, এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই একটা সাবধান বাণী উচ্চারণ করা আছে যে, প্রাণহীন মন্ত্রজপ নিষ্ফল। এজন্যই দূরদর্শী দীক্ষাদাতারা প্রত্যেক মন্ত্রই প্রণবযুক্ত ক'রে তবে শিষ্যকে দান করেন। সূক্ষ্মভাবে প্রণবই যখন সকল মন্ত্রের প্রাণ, তখন স্থূলভাবে তার সঙ্গে প্রণব সংযুক্ত ক'রে দিয়ে একথা স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা হ'য়ে থাকে যে, দেখো, ভুলে কিন্তু যেয়ো না যে, প্রণবই সর্ব্বমন্ত্রের প্রাণ। অল্পদৃষ্টি গুরুরা ব্রাহ্মণেতর বংশে জাত শিষ্যকে প্রণব দিতে কুণ্ঠা করেন সত্য, কিন্তু উদারচেতা পুরুষেরা প্রণব-বর্জ্জিত মন্ত্রদানকে মিথ্যা দীক্ষা বা বৃথা দীক্ষা ব'লে জ্ঞান করেন। কারণ, প্রণবই মন্ত্রের প্রাণ, অতএব প্রণব-বর্জ্জিত মন্ত্র প্রাণহীন মন্ত্র। প্রণব সর্ব্ব-মন্ত্রের প্রাণ বলেই প্রণবকে বলা হয় 'মন্ত্ররাজ'।

প্রণবই সর্ব্বতন্ত্রের আদি, মধ্য ও অন্ত

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—লক্ষ্য ক'রে থাকৃবে যে, ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্রের আদিতে একটী প্রণব, আবার অন্তে একটী প্রণব। এর মানে হচ্ছে এই যে, সকল তত্ত্বের উৎপত্তিও প্রণব থেকে, নিলয়ও গিয়ে প্রণবেই। কোনো কোনো অঞ্চলে ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্রের মধ্যে তিনটী প্রণবের প্রচলন দেখা যায়; একটী আদিতে, একটী মধ্যে, একটী অন্তে। এরও মানে এই যে প্রণবই সর্ব্বতত্ত্বের আদি, সর্ব্বতত্ত্বের মধ্য, সর্ব্বতত্ত্বের অন্ত। অর্থাৎ প্রণবই সর্ব্বময় এবং সব কিছুই প্রণবময়। প্রণবেই তত্ত্বের বা বস্তুর সৃষ্টি, প্রণবেই স্থিতি এবং শ্রীবৃদ্ধি, প্রণবেই উপসংহার বা পরিপূর্ণতা।

প্রণবে সর্ব্বমন্ত্রের সমন্বয়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রণবই সর্ব্বমন্ত্রের সমাহার বা সর্ব্বতত্ত্বের সমষ্টি। শঙ্খ বাজে, কিন্তু তার নিজস্ব একটী ধ্বনি আছে। ঘণ্টা বাজে, কিন্তু তারও নিজস্ব একটী ধ্বনি আছে। কাসর বাজে, তারও নিজস্ব একটা ধ্বনি আছে। মৃদঙ্গ বাজে, তারও নিজস্ব একটা ধ্বনি আছে। কিন্তু এই সকল ধ্বনি মিলে যে মহাধ্বনি, সেটিই প্রণব। হ্রীং-মন্ত্রের নিজস্ব একটা আওয়াজ আছে, ক্লীং মন্ত্রের নিজস্ব একটা আওয়াজ আছে, ক্রীং মন্ত্রের নিজস্ব একটা আওয়াজ আছে, শ্রীং মন্ত্রের নিজস্ব একটা আওয়াজ আছে, "মা" শব্দের নিজস্ব একটা আওয়াজ আছে, "প্রভু" শব্দের নিজস্ব একটা আওয়াজ আছে, কিন্তু সকল মন্ত্র সকল শব্দ একত্র হ'লে যে মহাধ্বনি হয়, সেইটীই হচ্ছেন প্রণব। স্থতরাং একমাত্র প্রণব জপ কল্লেই সর্ব্বমন্ত্র জপ করা হয়। বিশেষ ক'রে এজন্যও প্রণবকে বলা হয়, মন্ত্ররাজ। প্রণবে সর্ব্বমন্ত্রের সমন্বয়, সর্ব্বমতের সমন্বয়, সর্ব্বতত্ত্বের সমন্বয়।

প্রণবের সাধনা অল্প-প্রচলিত থাকার কারণ

একটী প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ব্রাহ্মণেরা, সর্ব্বস্থলে ইচ্ছা ক'রেই দ্বিজেতর জাতির লোকদিগকে প্রণব-মন্ত্রে বা প্রণব-তত্ত্বে বঞ্চিত রেখেছেন, এমন বলা চলে না। এই বঞ্চনার অনেক কারণ থাকতে পারে। ব্রাহ্মণের বংশে জন্মেও, অনেকে হয়ত নিজেরাই প্রণবের সাধন করেন নাই, ফলে না-জানা বিদ্যা বিতরণের প্রশ্নই অবান্তর হয়েছে। নিজেরা প্রণবের একনিষ্ঠ সাধক হ'য়েও অনেকে দীক্ষাপ্রার্থীকে প্রণব দিতে পারেন নি, কারণ হয়ত শিষ্য এ মন্ত্রের সর্ব্বব্যাপী তত্ত্ব বুঝতে অপটু হবে। প্রণবে দীক্ষিত ব্যক্তির একদিকে প্রয়োজন সর্ব্বালিঙ্গনকারী দার্শনিক দৃষ্টি, অপর দিকে থাক্‌বে দীক্ষাপ্রাপ্ত নামে একান্ত অভিনিবেশ। হয়ত শিষ্যদের ভিতরে গুরু এই দুইটীর বিকাশের উপযুক্ত উপাদান লক্ষ্য করেন নাই। অন্তরের সঙ্কীর্ণতা স্থল-বিশেষে কারণ হ'লেও সকল স্থলেই কারণ, বা ওটাই এক মাত্র কারণ, তা' মনে করো না। গ্রহীতা যদি না চান, দাতা কি জোর ক'রে তা' শিষ্যের কাঁধে চাপাবেন? অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, শিষ্য বাড়ী থেকেই ঠিক

ক'রে নিয়ে আসেন যে গুরু তাঁকে কোন্ মন্ত্র দেবেন। গুরু যদি শিষ্যের রুচিমত মন্ত্র না দেন, তবে সে গুরুকে মানে কে? সুতরাং শুধু গুরুর দোষেই নয়, শিষ্যের দোষেও সাধনরূপে প্রণব এত অল্প-প্রচলিত হয়ে রয়েছেন।

যুগ-নাট্যের পট-পরিবর্ত্তন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু অতি দ্রুত যুগ-নাট্যের পট-পরিবর্ত্তন হচ্ছে। আগে যা তিন শতাব্দীতে হ'ত, এখন তা' ত্রিশ বছরে হবে। সমাজের উচ্চতম থেকে নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র প্রণব-মন্ত্রের দিব্য সাধনার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে। এজন্য পরধর্ম্মের গ্লানি করার প্রয়োজন হবে না, কোন্ ধর্ম্ম বড়, আর কোন্ ধর্ম্ম ছোট, কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় বেশী সম্মানী আর কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্মান কিছু কম, এসবের চুলচেরা বিচার আবশ্যক হবে না। আদিমন্ত্র প্রণব যুগের প্রয়োজনে সর্ব্বজাতিতে সর্ব্ববর্ণে সমন্বয় সাধন ক'রে নিজেকে নিজে প্রতিষ্ঠিত কর্ব্বেন।

চাঁদপুর
১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬।

পল্লীগ্রাম হইতে একজন ভদ্রলোক আসিয়াছেন। ইনি ভাগবতাদি পাঠ এবং লীলা-কীর্ত্তনাদি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। লোকটী খুবই বিনয়ী এবং নম্রভাষী। তিনি কথায় কথায় প্রচুর আত্মগ্লানি করিয়া বলিলেন যে, যদিও শ্রীমদ্ভাগবতে নারদ-বচনে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ রহিয়াছে—"ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত" অর্থাৎ শাস্ত্র-ব্যাখ্যা দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবে না, তথাপি পেটের দায়ে ইনি অর্থের বিনিময়ে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা ও কথকতাদি করিতেছেন।

শাস্ত্র-ব্যাখ্যাদির প্রকৃত উদ্দেশ্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন;—শাস্ত্র-পাঠ ও কীর্ত্তনাদির উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য, নিজের মনকে ইষ্টনামে রুচিসম্পন্ন করা ও ইষ্টধ্যানে নিমগ্ন করা। দ্বিতীয় এবং গৌণ উদ্দেশ্য, নিজের এই উপকারটীর সঙ্গে সঙ্গে আরও দশজনের ঐ উপকার দুটী যাতে হয়, তার সহায়তা দেওয়া। উভয় উদ্দেশ্যই পারমার্থিক এবং এইগুলিই শাস্ত্র-পাঠ বা নাম-কীর্ত্তনাদির প্রকৃত উদ্দেশ্য।

শাস্ত্র-ব্যাখ্যা দ্বারা জীবিকার্জ্জন অনুচিত

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু শাস্ত্র-ব্যাখ্যানকে যদি জীবিকার্জ্জনের উপায় বা ব্যবসায় রূপে গ্রহণ করা হয় তাহ'লে তা' থেকে পারমার্থিক দৃষ্টি ও পারমার্থিক চেষ্টা চ'লে যাবে। মুখে আমরা শাস্ত্রকথা বল্‌ব, শ্রোতৃগণের চিত্তচমৎকারী বচন-বিন্যাসে বুদ্ধিকে নিয়োজিত ক'রে মনটীকে রাখব নিয়ে বাড়ীর কর্ত্তার পকেটে বা হরিসভার ম্যানেজারের ট্যাঁকে। এর ফলে গ্রামোফোন রেকর্ডের বাজনা হয়ত ভালই জম্‌বে, কিন্তু হাজার বার বাজালেও রেকর্ডের লাভ নেই এক কণাও। সে যে প্রাণহীন জড় পদার্থ! তারই রসনায় লক্ষ লক্ষ বার হরিগুণ গান হচ্ছে কিন্তু তার প্রাণে বিন্দুমাত্রও রসের সঞ্চার হচ্ছে না। শাস্ত্র-ব্যাখানকারীরা যাতে প্রাণহীন গ্রামোফোন-রেকর্ডে পরিণত না হ'য়ে যান, তারই জন্য মহর্ষি নারদ বল্‌ছেন,—"ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত" ধর্ম্মকে ব্যবসায়ের জিনিষ ক'রো না। যে কুলে যে সমাজেই জন্মগ্রহণ করুন, ধর্ম্মব্যাখ্যাতা প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মণ, তিনি বণিগবৃত্তি অবলম্বন কত্তে পারেন না। ব্যবসা কত্তে গেলেই তাকে চালু রাখ্‌বার জন্য দশ রকমের ফন্দী-ফিকির কত্তে হয়, কখনো হয়ত দুটো মিছে কথা বল্‌তে হয়, কখনো হয়ত বাহ্যাড়ম্বর দেখাতে হয়, কখনো অতিরঞ্জন বা অতিশয়োক্তি কত্তে হয়, কখনো পারিশ্রমিকরূপে দুটী রূপোর চাক্তি বেশী পাবার জন্য নিতান্ত অধার্ম্মিক ধনগর্ব্বিত লম্পট ব্যক্তিকে জিতেন্দ্রিয় ও পরম ভাগবত ব'লে স্তুতি কত্তে হয়। ব্যবসায়ীর এসব বহুবিধ দুর্গতি রয়েছে। সুতরাং শাস্ত্র-ব্যাখ্যানের দ্বারা আত্মকল্যাণ এবং সর্ব্বজীবের কল্যাণ সম্পাদন যাঁর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, তাঁকে জীবিকারূপে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা কত্তে নিষেধ করা হ'ল। নিষেধের উদ্দেশ্য অতীব মহৎ।

পারিশ্রমিক নিলেই কেহ অধার্ম্মিক হয় না

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু পারিশ্রমিক না নিয়ে যাঁরা শাস্ত্র-ব্যাখ্যা কত্তে পারেন বা কত্তে চান, এখন লোকের যেখানে অভাব ঘট্‌বে, সেখানে পারিশ্রমিক নিয়ে কেউ শাস্ত্র-ব্যাখ্যা কর্ল্লে একেবারে নরকে যেতে হবে, এমন মনে করার কারণ কি? শ্রোতার প্রয়োজন, সৎকথা শুনে মনকে ভগবন্মুখ করা, নামে রুচি

বৃদ্ধি করা, ইষ্টে নিষ্ঠা জমান। সেই প্রয়োজন যদি সিদ্ধ হয়, তাহ'লে শ্রোতা কখনো বিচার কত্তে যাবে না যে, ব্যাখ্যা-কর্ত্তা কত টাকা পারিশ্রমিক নিলেন। যাঁরা পয়সা নিয়ে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করেন, তাঁদের অনেকে যে লোক-সমাজে অসাধারণ সমাদর লাভ করেছেন, তার কারণ হচ্ছে এই। অবশ্য, যিনি নিজের জীবনে ধর্ম্মকে আচরণ ক'রেছেন, তাঁর মুখ-নিঃসৃত ধর্ম্মকথা সহজে শ্রোতার মর্ম্মভেদ করে কিন্তু যেহেতু পয়সা নিয়ে কেউ ধর্ম্মকথা শোনাচ্ছেন, তার জন্যই তিনি অধার্ম্মিক, একথা মনে কর্‌বার হেতু কি? সংসার পালনের জন্য অনেককে পয়সা রুজি কত্তে হয় এবং সংসারী লোকের ভিতরেও হাজার হাজার প্রকৃত ধার্ম্মিক, প্রকৃত প্রেমিক, প্রকৃত মহাপুরুষ আছেন।

চাঁদা আদায় করাও এক প্রকারের ব্যবসা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এক ভদ্রলোক নিজের পারিশ্রমিক নির্দ্ধারণ ক'রে নিয়ে ভাগবত-পাঠ কত্তে বস্‌লেন, আর এক ভদ্রলোক ভাগবত পাঠ সেরে তারপরে বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে জোর-জবরদস্তি ক'রে, গাল দিয়ে, অভিসম্পাতের ভয় দেখিয়ে, নিজেদের কৃতকর্ম্মের প্রশংসা শুনিয়ে তার চেয়ে শতগুণ অধিক চাঁদা আদায় কর্ল্লেন,—এ দু'জনের মধ্যে কাকে কম ব্যবসায়ী বল্‌ব? নগদ পয়সা টিকিট ঘরে চুকিয়ে দিয়ে তারপরে হলের ভিতরে ঢুকে যার গান শুনতে হয়, সেই ব্যবসায়ী, না, গড়ের মাঠে খোলা জায়গায় গানের আসর জমিয়ে তারপরে শ্রোতাদের ধ'রে ধ'রে বাধ্য ক'রে যে চাঁদা আদায় ক'রে নেয়, সেও ব্যবসায়ী? ব্যবসায়ী দু'জনেই। মাত্র আদায়ের পন্থার রকমফের। সুতরাং এক ব্যবসায়ীর পক্ষে অপর ব্যবসায়ীকে গলাগাল দেওয়া শুধু অশোভনই নয়, দস্তুরমত অসাধুতা। ভাগবত পাঠ ক'রে আমি যদি আমার মঠের জন্য চাঁদা তুল্‌তে পারি, ভাগবত পাঠ ক'রে তুমিও তা' হ'লে তোমার পুত্র-কন্যা প্রতিপালনের জন্য পারিশ্রমিক নিতে পার। তফাৎ শুধু পুত্র-কন্যায় আর মঠে। আমি যদি বলি মঠ আমার সর্ব্বজীব-শুভার্থে, ভগবৎ-সেবার্থে, তুমিও তেমন বল্‌তে পার, পুত্র-কন্যা প্রতিপালনও তোমার ভগবদ্বিহিত অবশ্যপাল্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, সুতরাং উপেক্ষা করার উপায় নেই। তুমি তোমার

গৃহে ব'সে যেমন ক্ষিদের সময়ে আহার কর, মঠবাসীরাও তাই করেন, ভগবৎ-সেবায় জীবন উৎসর্গ ক'রেছেন ব'লে তাঁরা উপবাস ক'রে থাকেন না। হয়ত সংযম এবং সদাচারের দিক্ দিয়ে তাঁরা তোমার চাইতে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু আবার সমাজের বহুজনের প্রতি নানাবিধ কর্ত্তব্য পালনের দিক্ দিয়ে তোমার দায়িত্ব অধিক। তবু তুমি যদি ভগবৎ-কথা শুনাবার ব্রত নিয়ে থাক, তা'হলে সামান্য কিছু পেট চল্‌বার মত আর্থিক সাহায্য নাও ব'লে আমি তোমাকে পতিত ব'লে জ্ঞান কর্ব্ব না, নারকী ব'লে গাল দিব না।

নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কথায় বলে, নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল। অর্থাৎ পারিশ্রমিক গ্রহণে অনিচ্ছুক ধর্ম্ম-ব্যাখ্যাতার অভাবে পারিশ্রমিক-গ্রহণকারী ধর্ম্ম-ব্যাখ্যাতা মন্দের ভাল। কিন্তু শুধু টাকা নিলেই কি পারিশ্রমিক নেওয়া হ'ল? লোকের করতালি কি এক প্রকারের পারিশ্রমিক নয়? বহুজনের প্রশংসা কি এক প্রকারের পারিশ্রমিক নয়? শত শত লোকের সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কি এক প্রকারের পারিশ্রমিক নয়? তারপরে চাঁদার টাকা ত' একেবারে সোজা পারিশ্রমিক। সুতরাং নারদ-বাক্য মান্‌তে হ'লে ভাগবত-ব্যাখ্যাতার যা হওয়া উচিত, তা ত' কোনো মঠেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ অবস্থায় কাণা মামাকে বাপান্ত করায় কোনো লাভ নেই।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শাস্ত্র-ব্যাখ্যান

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,— সংসারী লোকদের অর্থের প্রয়োজন আছে, সুতরাং সংসারী ধর্ম্ম-ব্যাখ্যাতারা অনেকে টাকা নিয়েই ব্যাখ্যা ক'রে থাকেন। আদর্শের দিক্ দিয়ে কাজটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয়। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হ'ত যদি, ব্যাখ্যান করার পরে নীরবে তিনি স্থান ত্যাগ ক'রে চলে যেতে পাত্তেন, এমন কি লোকের স্বেচ্ছাদত্ত দানও স্পর্শ কত্তে বিরত হ'তেন। মঠের জন্যই হোক, আর সংসারের জন্যই হোক্, কোনো প্রয়োজনের দাবীতেই ভাগবত শুনাবার পরে একটী কপর্দ্দক নেওয়া হবে না, এরূপ নিষ্কিঞ্চন-বৃত্তি নিয়ে যদি কেউ শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করেন, তবে তাঁর কাজ সর্ব্বাঙ্গ-

সুন্দর হ'ত, নিন্দার অতীত হ'ত। ভগবত-পাঠক নিষ্কাম মন নিয়ে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা কর্বেন, ভাগবত-শ্রোতা নিষ্কাম মন নিয়ে ব্যাখ্যান শ্রবণ কর্বেন,—এইটীই অনিন্দ্য, এইটীই আদর্শ। ধন-কামনাও নয়, প্রতিপত্তি-কামনাও নয়, সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের আনুকূল্য সৃষ্টির কামনাও নয়, কিম্বা মঠের জন্য চাঁদা তোলার কামনাও নয়। সকল কামনাকেই বলি দিতে হবে। অমুক সম্প্রদায়ের চাইতে আমার সম্প্রদায় শ্রেষ্ঠ ব'লে প্রতিপন্ন হোক্, এই কামনাও নয়। সর্ব্বকামনা বর্জ্জন ক'রে একমাত্র ভগবৎ-প্রীতির উদ্দেশ্য নিয়ে যে শাস্ত্র-ব্যাখান, তাই হচ্ছে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।

শাস্ত্র-ব্যাখ্যা ও ভগবৎ-কৃপা

সর্ব্বশেষে—শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বক্তা বা ব্যাখ্যাতার লক্ষ্য থাকা উচিত, শাস্ত্র-ব্যাখ্যার উপলক্ষে তাঁর নিজের যেন অন্তরের গলদ কেটে যায়, সংস্কারের মোহ কেটে যায়, বাসনার আবিলতা দূর হয়। এ'কে প্রধান লক্ষ্য ক'রে কাজ ক'রে যাও, ক্রমশঃ ভগবানের কৃপা উপলব্ধি কত্তে পার্বে। তাঁর কৃপা সর্ব্বস্থানে পড়্তে পারে, সে শক্তি কৃপার আছে। আজ আমি অধম ব'লেই কোনো দিনই তাঁর কৃপা লাভ কত্তে পার্ব্ব না, এ ধারণা ভ্রান্ত। বরং অধমের জন্যই তাঁর করুণা অধিক।

বিদ্যাবিক্রয়

ভাগবত-পাঠক প্রণামান্তর প্রস্থান করিলে স্থানীয় কোনও অবৈতনিক বিদ্যালয়ের একজন কর্ম্মী শিক্ষক প্রশ্ন করিলেন,—আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্ররাও মাইনে দেয় না, মাষ্টাররাও মাইনে নেন না। এ সম্পর্কে আপনার মতামত কি ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মতামত প্রশংসাপূর্ণ। কিন্তু মাইনে না দেওয়া বা মাইনে না নেওয়ায় চাইতে বড় কথা হ'ল বিদ্যার আদান-প্রদান, শিক্ষক কি পটুত্বের সাথে বিদ্যাদান কচ্ছেন ? ছাত্র কি অভিনিবেশ সহকারে বিদ্যার্জ্জন কচ্ছে ? মাষ্টার মাইনে না নিলে তা' অতি উত্তম কথা। অতীত ভারতের বিদ্যাদাতারা কেউ বিদ্যা-বিক্রয়কারী ছিলেন না, দ্রোণাচার্য্য থেকে ভারতে বিদ্যাবিক্রয় সুরু হ'ল। এতে ভারতের চিরন্তন আদর্শের উপরে গুরুতর আঘাত পড়্‌ল।

সেই সনাতন আদর্শকে আমাদের ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। কিন্তু একথা কি বলা চলে যে, অর্জ্জুনাদির অস্ত্রশিক্ষা কিছু কম হয়েছিল? আদর্শের বিচারে বিনামূল্যে বিদ্যাদানকারী বেতন-গ্রাহী বিদ্যাদাতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু একজন অদক্ষ বিদ্যাদাতা যদি বিনামূল্যে বিদ্যাদান করেন, তবে ছাত্রের পক্ষে সেখানে বিদ্যার্জ্জন লাভকর, না, একজন সুদক্ষ বিদ্যাদাতা যদি বেতন নিয়ে বিদ্যাদান করেন, তবে ছাত্রের পক্ষে সেখানে বিদ্যার্জ্জন লাভকর? বিনিময়ে কিছু নিলেন কিনা, এর চাইতে বড় কথা হচ্ছে, দাতার দেবার মত জিনিষ কি আছে। একজন যদি বিনামূল্যে ছোলাভাজা দেন, আর একজন যদি মূল্য নিয়ে ছানার পায়েস দেন, কোন্‌টী গ্রহণীয় হবে, বল ত? বিনা বিনিময়ে বিদ্যা বিতরণকারীরা যদি বিদ্যাদান বিষয়ে সুদক্ষ হন, তবেই প্রাচীন ভারতে আদর্শ রক্ষা সম্ভব হবে।

ব্রহ্মবিদ্যা বিক্রয়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রাচীন ভারতে বৈষয়িক বিদ্যা শিখ্‌বার জন্য অনেককেই গুরুর নিকট যেতে হ'ত না, নিজ নিজ পিতার নিকট থেকেই অধিকাংশের বৈষয়িক শিক্ষা হ'ত। কামারের ছেলে, কুমারের ছেলে, খনকের ছেলে বা গণকের ছেলে নিজ নিজ জাত-ব্যবসা নিজ নিজ ঘরে ব'সেই প্রায় আয়ত্ত কত্ত। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যার বেলা সে নিয়ম খাট্‌ত না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের ছেলেরা দলে দলে গুরুগৃহে গিয়ে ব্রহ্মবিদ্যা আয়ত্ত কত্ত। এই বিদ্যাকে বিক্রয় করা চিরকালই দোষের ছিল, চিরকালই দোষের থাক্‌বে। আর্য্যপন্থাবর্জ্জিত ব্যক্তির আহারীয় রন্ধনকারী ব্রাহ্মণ, হরিনাম বিক্রয়কারী ব্রাহ্মণ, আর বিদ্যাবিক্রয়কারী ব্রাহ্মণ, এই তিনজনকে এই জন্যই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে বিষহীন উরগের সাথে তুলনা করা হ'য়েছে। অর্থাৎ বিষহীন সাপকেও দেখ্‌লে সবাই ভয় করে যে বুঝি বিষ আছে, কিন্তু কাউকে দংশন ক'রে বিপন্ন করার তার ক্ষমতা নেই, শুধু ফোঁস্-ফোঁসানিই সার, ঠিক তেমনি এসব ব্রাহ্মণের পৈতা আর টিকি দেখে অনেকে মনে কত্তে পারে যে এঁদের বুঝি ব্রহ্মতেজ সত্য সত্যই আছে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এদের মধ্যে সেই তপোলভ্য মহাবস্তুর নাই এক কণাও। অর্থাৎ এঁদের ব্রাহ্মণ

বলাটা "ব্রাহ্মণ" শব্দটীর একপ্রকার অপব্যবহার মাত্র। শাস্ত্রাদিতে এভাবে ব্রহ্মবিদ্যাবিক্রয়কারীকে গর্হণ করা হয়েছে।

হরিনাম বিক্রয়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবানের নাম ব্রহ্মবিদ্যার সারাৎসার। আগেকার দিনের গুরুগৃহ আজ নেই, কিন্তু নাম আছে, আর তার দীক্ষা র'য়ে গেছে। সেই দীক্ষা দিতে যে পয়সা নেয়, সে হরিনাম বিক্রয়ের অপরাধে অপরাধী। কিন্তু সংসারী গুরুর সংসার চালাতে হয়, পয়সা না হ'লে চলে কৈ? মঠাধিপতি গুরুর মঠ চালাতে হয়, পয়সা না হ'লে চলে কৈ? কেউ হয়ত সোজাসুজি ব'লে বসেন, অত দিতে হবে, নৈলে মন্ত্র পাবে না; কেউ বা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলে থাকেন যে, অমুক অমুক জিনিষ না হ'লে দীক্ষা দিই কি ক'রে? মোটকথা কিছু পাওয়া চাই। এসব দীক্ষাকে হরিনাম-বিক্রয় বল্‌তেই হবে।

প্রকৃত দীক্ষাদাতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দীক্ষাদাতার সঙ্গে তোমার দেখা হ'ল। তিনি তোমাকে বল্লেন,—"তোমার দীক্ষা প্রয়োজন? এস আমি দীক্ষা দিচ্ছি, এর বিনিময়ে তোমার কাছে ধন চাই না, মান চাই না, প্রতিপত্তি চাই না,—আজও চাই না, কালও চাই না; এমন কি আমাকে গুরু ব'লে লোকের কাছে পরিচয় দিতে হবে, এতটুকু বাধ্য-বাধকতা পর্য্যন্ত তোমার উপরে নেই। পার্থিব বা অপার্থিব কোন রকমেরই বিনিময় চাই না।" এ কথা ব'লে যিনি দীক্ষা দিতে পারেন, তাঁর দেওয়া দীক্ষাই প্রকৃত দীক্ষা। দীক্ষা দিবার সময়ে হয়ত আমি টাকা-কড়ি কিছুই নিলাম না, কিন্তু পরে নানাভাবে নিজ আর্থিক প্রয়োজনের দাবী মিটাবার ব্যবস্থা তোমার ঘাড়ে তুলে দিলাম; আমি সুদীক্ষাদাতা হব না। কিম্বা তোমার কাছে টাকা-কড়ি হয়ত এখনো চাইলাম না, ভবিষ্যতেও চাইব না, সরল সোজাভাবেও না, ঘুরিয়ে পেঁচিয়েও না কিন্তু তুমি যখন তোমার কর্ম্মবলে দেশের ভিতরে সমাজের মাঝে প্রতিপত্তির এক শ্লাঘ্য আসন অধিকার করেছ, তখন আমি দাবী কত্তে বস্‌লাম যে, তুমি

আমারই শিষ্য। এভাবে যিনি সুকৌশলে নিজের প্রতিপত্তি বাড়াবার জন্য শিষ্যের প্রতিপত্তিকে ব্যবহার করেন, তিনিও সুদীক্ষাদাতা নন। প্রকৃত দীক্ষা-দাতা শিষ্যের কাছ থেকে ঐহিক বা পারত্রিক কোনো সুবিধাই আদায়ের চেষ্টা কর্ব্বেন না। ব্রহ্মবিদ্যাদানের এইটীই চিরাদর্শ।

ভারতীয় নার্স ও ভারতীয় শিক্ষকের পেটভাতা

অতঃপর অন্য একটী প্রসঙ্গ উঠিল। তদুত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মাইনে নিয়ে যাঁরা সমাজের সেবা করেন, আর মাইনে না নিয়ে যাঁরা সমাজের সেবা করেন, এই দুই শ্রেণীর সমাজসেবীর মধ্যে প্রথমোক্ত শ্রেণীর প্রতিই লোকের শ্রদ্ধা চিরকাল বেশী থাক্‌বে। কিন্তু ভেবে দেখ, রুগ্নের চিকিৎসার জন্য দেশে দেশে যে সহস্র সহস্র হাসপাতাল আছে, তার প্রত্যেকটী ডাক্তার আর প্রত্যেকটী সেবক-সেবিকা বিনে মাইনেতে চিরকাল কাজ কত্তে পার্ব্বেন, এ আশা করা চলে না। কম্‌সে-কম পেট-ভাতাটা প্রত্যেকেরই প্রয়োজন। ভারতবর্ষের হাস-পাতালগুলিতে যে সব ভারতীয় নার্স আছেন, তাঁরা যে মাইনে পান, ওতে কোনো প্রকারে পেটটা মাত্রই চলে। ভারতবর্ষের স্কুলগুলিতে যে সব শিক্ষক আছেন, তাঁদের শতকরা পঁচানব্বই জন যে মাইনে পান, ওতে অস্থিচর্ম্মসার দেহটাকে কোনো প্রকারে রক্ষা করা মাত্র চলে। এ অবস্থায় এঁদের বিনে-মাইনের সমাজ-সেবী ব'লেই গণনা করা উচিত।

মরণ অবশ্যম্ভাবী

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবা স্বগণসহ চাঁদপুরের শ্মশানে আসিয়া বসিয়াছেন। কিছুক্ষণ নিঃস্তব্ধভাবে সকলে নামজপ করিলেন। তৎপরে উপদেশ আরম্ভ হইল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—লোকে শ্মশানকে ভয়ের স্থান ব'লে মনে ক'রে থাকে। কেননা মৃত্যুর সাথে এর সম্বন্ধ নিবিড়। কেউ ত' জগতে মর্‌তে চায় না, সবাই চায় বেঁচে থাক্‌তে। জীবনের প্রতি যার মমত্ব যত অধিক, শ্মশানের প্রতি বিদ্বেষ তার তত অধিক। কিন্তু লক্ষ্য ক'রে দেখ, প্রত্যেকটী প্রশ্বাসের সাথে সাথে আমরা মৃত্যুর আস্বাদন কচ্ছি, প্রত্যেকটী মুহূর্ত্তের সাথে সাথে আমরা মৃত্যুর মুখে

অগ্রসর হচ্ছি, হৃদয়ের প্রত্যেকটী স্পন্দন নিরন্তর মৃত্যুর সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ বাঁচতে যতই চাও, মৃত্যু তোমার অখণ্ডনীয় ভবিতব্য। এর হাত কেউ এড়াতে পার্‌বে না। মরণ অবশ্যম্ভাবী। কোন্‌দিন কার যে শেষ প্রশ্বাস ছাড়্‌বার সময় হবে, তার কেনো স্থিরতা নেই।

জীবন ও মরণকে সার্থক করার পথ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু মরণের হাত এড়াবার উপায় না থাক্‌লেও মরণকে সার্থক করার উপায় আমাদের হাতে আছে। বেঁচে ত' আমরা সকলেই আছি। কিন্তু জীবন সার্থক আমাদের ক'জনের? প্রত্যেকটী নিঃশ্বাসকে জান্‌বে জীবনের প্রতিনিধি, প্রত্যেকটী প্রশ্বাসকে জান্‌বে মরণের প্রতীক। এদের সাথে সত্যময় ভগবানের মঙ্গলময় নামটী যুক্ত ক'রে নাও। জীবনও সার্থক হবে, মরণও সার্থক হবে। অসার্থক জীবনের বোঝা ব'য়ে যে বেড়ায়, অসার্থক মরণের অপবাদ থেকে মুক্তি পাবার তার উপায় নেই। জীবনে ও মরণে অথাৎ শ্বাসে ও প্রশ্বাসে সর্ব্বমঙ্গলনিলয় ভগবানের প্রেমমধুমাখা নামকে আলিঙ্গন ক'রে ধর। তাতে জীবনও সফল হবে, মরণও সফল হবে।

ঢাকা

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬

বেলা এগারটায় শ্রীশ্রীবাবা ঢাকা পৌঁছিয়াছেন। অপরাহ্নে দুই তিনটী যুবক সহ রমনার মাঠের নিকটে বেড়াইতেছেন।

ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদান

একটী স্কুলের ছাত্র বলিলেন,—আমার বন্ধুরা আমাকে অমুক রাজনৈতিক দলের দিকে আকৃষ্ট কর্ব্বার জন্য চেষ্টা কচ্ছেন। এ সম্পর্কে আমার কর্ত্তব্য কি?

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—আমি যদি বলি, "যেও না" তা হ'লে ত' দলের কর্ত্তারা আমার মাথায় লাঠি ভাঙ্গ্‌বেন।

সকলে হাসিয়া উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—হাসির কথা নয়রে বাছা, হাসির কথা নয়! যাঁরা

রাজনৈতিক দল গড়েন, তাঁরা যদি দেখেন যে, কারো উপদেশে দলের সংখ্যাবৃদ্ধির সম্ভাবনা কম্‌ছে, তা' হ'লে তাঁরা চট্‌বেন না ? কিন্তু তোমাদের কথা হচ্ছে এই যে, ছাত্রাবস্থায় কোনো দলে-ফলে না ভিড়াই ভাল। কারণ তাতে বিদ্যার্জ্জনের ব্যাঘাত হবে। রাজনীতিকে ডিজরেলী বল্‌তেন, পৃথিবীর সেরা জুয়াখেলা। রাজনীতিতে ঢুক্‌লে কে যে কোথা থেকে ছিট্‌কে গিয়ে কোথায় পড়্‌বে, তার কোনো নিশ্চয়তাই নেই। সুতরাং এই অনিশ্চিত ব্যাপারের মাঝে তার যাওয়া উচিত নয়, যার আশু প্রয়োজন বিদ্যার্জ্জন।

দেশের দুঃখ-দৈন্যের খবরা-খবর রাখিবে

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু তাই ব'লে দেশের সুখদুঃখের সংবাদ ছাত্রেরা রাখবে না, এমন বিধান অবেজো। দেশের লোক সম্পদের অপচয় করে, না, অনাহারে থাকে, অতি-সৌভাগ্যে বিলাসের পল্বলে ডুবে মরে, না, অভাবের তাড়নায় বর্ষায় আশ্রয়হীন আর শীতে বস্ত্রহীন জীবন যাপন করে, কুশিক্ষায় আত্মগরিমা বিস্মৃত হ'য়ে পরপদ-লেহনকে জীবনের চরম চরিতার্থতা ব'লে জ্ঞান করে, না, অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে থাকার দরুণ বাঁচবার উপায় থাকা সত্ত্বেও তিলে তিলে মরে,—এ খবর তোমরা রাখবে না ত' কে রাখ্‌বে ? দেশের দুঃখ ও দৈন্য, ব্যাধি ও জরা, অভাব ও অভিযোগ, অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ, বন্যা ও বাত্যা, অপমৃত্যু ও অকালমৃত্যু এ সবের খবর তোমরা রাখবে না ত' কে রাখবে ? এ সকলের প্রতীকারের পন্থা কি, তৎসম্পর্কেও শ্রেষ্ঠ মনীষীদের চিন্তা ও উদ্ভাবনের সঙ্গে তোমাদের নিবিড় পরিচয় স্থাপন আবশ্যক। কিন্তু কোনো দলে ঢুকো না।

দলে ঢোকার বিপত্তি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—রাজনীতিই বল, অর্থনীতিই বল, সমাজ-নীতিই বল, যে কোনো দিক্ দিয়ে অধঃপতিতের অভ্যুদয় সাধন কত্তে হ'লে বা দুঃখপরিক্লিষ্টের দুঃখাপনোদন কত্তে গেলে সঙ্ঘবদ্ধতার প্রয়োজন হয়। কিন্তু যাদের চিন্তা করার শক্তি জন্মে নি, তাদের সঙ্ঘবদ্ধতায় অনেক কুফলও আছে। পালের গোদাটী ভুল পথে চল্লেও এক পাল চিন্তাহীন নিরীহ মেষশাবক তারই অনুসরণ করে। একবার

চলন্ত রেল গাড়ীর নীচে এভাবে এক পাল মেষকে মরতে দেখা গিয়েছিল। এক পাল চিন্তাশক্তিবর্জ্জিত দুর্ব্বৃত্ত মিলিত হ'য়ে দেশোদ্ধারের নাম ক'রে শেষ পর্য্যন্ত একটা লুঠপাটের দলেই পরিণত হ'য়ে গেল, এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নয়। নেতার আদেশ না মান্‌লে দল চলে না, আবার নিজের চিন্তাশক্তির ব্যবহার কর্‌লে দলে থাকা যায় না। দলের ভিতরে এসব অনেক ভাববার মত সঙ্কট রয়েছে। এজন্যই জগতে সঙ্ঘবদ্ধতার আবশ্যকতা থাক্‌লেও একটা দলের ভিতরে ঢুকে পড়ার আগে শতসহস্র বার পরিণাম চিন্তা করার প্রয়োজন।

দল ত্যাগের বিপত্তি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—একবার একটা দলে তুমি ঢুক্‌লে, কিন্তু ক'দিন পরে বুঝলে যে, এটার ভিতরে তোমার থাকা পোষাবে না। তখনকার অবস্থাটা ভাবো। যাঁদের দল ছাড়বে, তাঁরা হবেন শত্রু। যাঁদের দলে নূতন এসে ভিড়তে চাইবে, তাঁরা কর্‌বেন সন্দেহ। আর, বাইরের যত নির্দল নরনারী, তাঁরা তোমার কথা শুনে দলত্যাগী ব'লে দেবেন টিটকারী। একটা দলে ঢুকে ক'দিন পরে তাকে ছেড়ে সরে পড়ার বিপদ এইখানে। ফলে তুমি হয়ত বাইরের চাপে বা উৎপীড়নের ভয়ে বা নিন্দা-গ্লানির আশঙ্কায় কিছুতেই আর দলত্যাগ কর্‌বে না, কিন্তু সর্ব্বদা বিবেকের বিরুদ্ধে কথা বল্‌তে ও কাজ কর্ত্তে বাধ্য হবে। মন বল্‌ছে,—"পূর্ব্বদিকে যাওয়াই উচিত", কিন্তু দলের চাপে তোমাকে বল্‌তে হবে, "চল পশ্চিমে।" ফলে জীবন একটা দারুণ বোঝা হ'য়ে দাঁড়াবে।

সাধিয়া আপদ্ধর্ম্মের প্রয়োজন সৃষ্টি করিও না

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বিবাহ করা, দীক্ষা নেওয়া বা কোনো একটা দলে প্রবেশ করা এইজন্যই কখনো সামান্য চিন্তার ফলে হওয়া উচিত নয়। বিয়ে করার পরে যদি বল্‌তে হয়,—"দাও বউটাকে ছেড়ে", তবে তার মত আর বিপদ কি আছে? দীক্ষা নিয়ে পরে যদি বল্‌তে হয়,—"দাও পথটাকে ছেড়ে" তা'হলে তার মতই বা বিড়ম্বনা আর কি আছে? দলে ঢুকে তার পরে যদি বল্‌তে হয় যে,—"দাও দলটাকে ছেড়ে", তবে তার মত আর দুর্ভাগ্য কি আছে? অবশ্য, আপদ্ধর্ম্মে সবই সঙ্গত

অর্থাৎ ঠেক্‌লে বাঘে ধান অবশ্যই খাবে। কিন্তু নিজের বিবেচনার ক্রটীতে একটা আপদ্ধর্ম্মের মধ্যে গিয়ে পড়ার কোন্ আবশ্যকতা আছে? যে বউটাকে বিয়ে করার পরে পরিত্যাগ কত্তে হবে, যে গুরুদেবকে দীক্ষা নেওয়ার পরে অগ্রাহ্য কত্তে হবে, যে সঙ্ঘকে গ্রহণের পরে বর্জ্জন কত্তে হবে, তার সঙ্গে যাতে আদৌ কোনো বাধ্যবাধকতার বন্ধন সৃষ্টই না হ'তে পারে, তারই জন্য গোড়ায় বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। আপদ্ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে চল্‌বার মত অবস্থায় জীবনে কখনো পড়, এটা কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নয়। একটু বড় হ'য়ে বিকশিত বুদ্ধির পূর্ণ সহায়তা নিয়ে যদি কোনো কাজ কত্তে হয়, তাতে নিষেধ কর্ব্বার কিছু নেই। কিন্তু ছোট ছোট ছেলেরা রাস্তার এক পার থেকে একদল হাঁকে, "রামবাবুকী জয়," অমনি রাস্তার অপর পার থেকে আর এক দল উচ্চতর কণ্ঠে জবাব দেয়,—"শ্যামবাবুকী জয়" এবং কণ্ঠের উচ্চতার প্রতিযোগিতা শেষে গিয়ে হাতাহাতি, লাঠালাঠি মারামারি, কাটাকাটি প্রভৃতিতে পরিণত হয়,—এর ভিতরে আমি সমর্থনের কিছুই পাইনে।

চাঁদপুর
২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬

শ্রীশ্রীবাবা চাঁদপুর ফিরিয়াছেন। ভক্ত এবং অনুগত ব্যক্তিরা উপদেশ শুনিতে আসিয়াছেন।

মহাপুরুষদের মধ্যে তুলনা করিও না

একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মহাপুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের বা নিকৃষ্টত্বের বিচার কত্তে যাওয়া সাধারণ লোকের পক্ষে অতি বিপজ্জনক ব্যাপার। কারণ তাতে প্রসঙ্গক্রমে মহাপুরুষ-নিন্দা এসে যেতে পারে। তাই তোমাদের উচিত, প্রত্যেক মহাপুরুষেরই জীবন থেকে শুধু উপদেশ সংগ্রহ করা এবং অন্য মহাপুরুষের সঙ্গে তুলনা ক'রে তাঁকে ছোট বা বড় করার চেষ্টা আদৌ না করা। নিত্যানন্দ কলসীর কাণার আঘাতে রক্তাক্ত-কলেবর হ'য়েও ব'লেছিলেন,—"মেরেছিস্ কলসীর কাণা তাই ব'লে কি প্রেম দিব না?" আবার যীশু ক্রুশবিদ্ধ হ'য়েও ব'লেছিলেন,—"হে স্বর্গস্থ পিতা, এদের অপরাধ ক্ষমা কর; এরা জানে না

এরা যে কত অপরাধী।" এমন দুটী মহদ্‌দৃষ্টান্তকে তুলনায় তু'লে যীশুকে বা নিত্যানন্দকে একজনকে অপর জনের চাইতে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট কত্তে যাওয়ার মত ভ্রম কিছু হ'তে পারে না। কারণ যদি বল, "যীশু শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তিনি প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়ে দিলেন", অমনি আর একজন নিশ্চয়ই ব'লে বস্‌বে,—"ক্রুশে বিদ্ধ ক'রে দিলে নিত্যানন্দও অম্লানবদনে প্রাণ দিয়ে দিতেন, দ্বিরুক্তি কত্তেন না।" তার প্রতিবাদে তুমি নিশ্চয়ই বলবে,--"কি সত্যি সত্যি ঘটেছে, তাই দিয়ে যীশুকে বিচার কচ্ছি কিন্তু আনুমানিক ঘটনা কল্পনা ক'রে বলা হচ্ছে যে নিত্যানন্দও অনুরূপ অবস্থায় অনুরূপ অথবা ততোধিক শ্রেষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিত কত্তেন। সংঘটিত ব্যাপারের সঙ্গে আনুমানিক ব্যাপারের তুলনা মূর্খতা।" সঙ্গে সঙ্গে নিত্যানন্দ-ভক্ত ব'লে বস্‌বেন,—"এভাবে প্রেমদাতা নিতাইকে অসম্মান করা হচ্ছে, কিন্তু কলসীর কাণা খেয়ে ত' নিতাই ক্ষতের যন্ত্রণায় একবারও বলেন নি, হে প্রভো, তুমি কি আমাকে ভুলে গিয়েছ,—কিন্তু যীশু পেরেকের খোঁচায় অতিষ্ঠ হ'য়ে সে কথা বলেছিলেন,—সুতরাং যীশুর চাইতে নিত্যানন্দ শ্রেষ্ঠ।" নিশ্চয় তুমি সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠবে,—"একটা কলসীর কাণার যন্ত্রণার সঙ্গে মৃত্যু-যন্ত্রণার যে তুলনা করে, সে একটা বনের বৃষ।" ফল হবে কি ? না, লাঠালাঠি। আর যদি লাঠালাঠি তোমরা না কর বা না কত্তে পার, তাহ'লে হঠাৎ একজন ব'সে বস্‌বেন ;—"ভারী ত ক্রুশে বিদ্ধ হওয়া ! ভীষ্ম শরশয্যাতে মাসের পর মাস পড়ে রইলেন, একবারটীর জন্য কাতরোক্তি কর্লেন না, বরং তিলে তিলে মৃত্যুকে আস্বাদন কত্তে কত্তে মোক্ষপর্ব্বের হাজার হাজার অমৃততুল্য উপদেশ যুধিষ্ঠিরকে বিতরণ ক'রে গেলেন। সুতরাং যীশু ভীষ্মের চাইতে নিকৃষ্ট।" সঙ্গে সঙ্গে তুমি বলিবে,—"যীশু খ্রীষ্ট ঐতিহাসিক ব্যক্তি, আর ভীষ্ম পৌরাণিক কাহিনীর সৃষ্টিমাত্র ; এ দুজনের আবার তুলনা কি হে ? যীশুর নামে খ্রীষ্টাব্দ চল্‌ছে, ভীষ্মের নামে কি চ'লেছে হে ?" অমনি সে আবার জবাবে বল্‌বে,--"এখনো হিন্দুমাত্রই ভীষ্মের নামে পিতৃপক্ষে জল-তিলের তর্পণ করে, এটা কি তোমার অব্দের চেয়ে কম কথা ? একজনের নামে সন চলেছে বলেই তিনি ঐতিহাসিক, আর একজনের নামে তর্পণ

চলেছে, তবু তিনি অনৈতিহাসিক ? মিউনিসিপাল অফিসে ইংরাজি শেখা কেরাণীর হাতে লেখা জন্ম-রেজেষ্টারীই জন্মের প্রমাণ, আর আমার নিজের গ্রামের সংস্কৃত-শেখা আচার্য্য ঠাকুরের তৈরী স্বদেশী কোষ্ঠি-ঠিকুজী জন্মের প্রমাণ নয় ?" তুমি এর পরে হয়ত সাম্‌লাতে না পেরে ব'লে বস্‌বে,—"কোথায় কাশীরাজকন্যাদের হরণকারী, অম্বার প্রতি অবিচারকারী, দুর্য্যোধন-সভায় দ্রৌপদীর অসহ্য অসম্মান স্বচক্ষে দর্শন ক'রেও দু'মুটা অন্নের জন্য বিবেক-বিক্রয়কারী ভীষ্ম, আর কোথায় জগতের সকলের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্তকারী যীশু! তোমরা কি পাতালকে আকাশের সঙ্গে তুলনা দিতে চাও ?" এই কথাটী ব'লে শেষ করার পূর্ব্বেই তুমি দেখবে যে বিরাশী সিক্কার একটী ঘুষি তোমার কাণ ছুঁয়ে গেল। আর দৈবাৎ কোনো বন্ধু যদি সেই ঘুষিটাকে থামিয়ে দিলেন, অম্‌নি আর একজন ব'লে বস্‌বে,—"ভীষ্ম যদি পৌরাণিক, যীশু আর কতটা ঐতিহাসিক হে ? কত খ্রীষ্টানের বংশাবতংশেরাই গবেষণা ক'রে ক'রে বল্‌ছেন যে, যীশু নামে জগতে কেউ ছিল কিনা সন্দেহ, সেণ্ট জন বা সেণ্ট পল যীশুর নাম দিয়ে একটা উপন্যাস রচনা ক'রে জগৎকে ঠকিয়েছে। তোমরাই বল দেখি, শিবিরাজা একটা কবুতরকে রক্ষার জন্য স্বেচ্ছায় শরীরের মাংস কেটে কেটে দিলেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ, না পাইলেটের বিচারে ইচ্ছার বিরুদ্ধে যীশু ক্রুশকাষ্ঠে আরোহণ কর্ল্লেন, এটা শ্রেষ্ঠ ?" ইত্যাদি ক'রে শেষ পর্য্যন্ত যে কত অকথা আর কুকথার অনুশীলন হবে, তা' বলে শেষ করা কঠিন। সুতরাং মহাপুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আর নিকৃষ্টত্বের তুলনায় তোমরা যেয়ো না। তোমরা প্রত্যেক মহাপুরুষের চরিত্র আলোচনার সময়ে অন্য সকল মহাপুরুষের কথা থেকে মনকে তুলে এনে তাঁরই জীবনে কোন্ স্থানে তোমার কতটুকু গ্রহণীয় ও শিক্ষণীয় আছে তাই দে'খো।

দুইজন স্বল্পকালতিরোহিত মহাপুরুষ

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবা দুইজন স্বল্পকালতিরোহিত মহাপুরুষের আচরণ সম্পর্কে একটী ঘটনা বলিতে লাগিলেন,—কল্‌কাতাতে একজন সুকবি নাট্যকার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী অবলম্বন ক'রে একখানা নাট্য রচনা ক'রে তাকে বিখ্যাত এক

থিয়েটারে মঞ্চস্থ করলেন। সেই সময়ে দু'জন প্রেমিক মহাপুরুষ কলকাতার দুই উপকণ্ঠে বাস কচ্ছেন, ভাবীকালে এই দুইজনেরই শিষ্যরা দুটী বিরাট বিরাট মঠ প্রতিষ্ঠা ক'রে হিন্দুধর্ম্মের দুটী বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রচার করেছেন। নাট্যকার প্রথমে বিষ্ণুভক্ত মহাপুরুষকে গিয়ে প্রণাম ক'রে বললেন,—"প্রভো, এই নাট্যের প্রথম অভিনয়-রজনীতে আপনাকে কৃপা ক'রে সভাপতিত্ব ক'রে অনুষ্ঠানকে মর্য্যাদা দান কত্তে হবে।" মহাপুরুষ বল্লেন,—"কি বলছ? কাম-কাঞ্চনের দাসেরা এসে হরিনাম কর্ব্বে, আর তাই আমাকে শুনতে হবে? অসতী বারনারী এসে শ্রীগৌরাঙ্গের ভুবনমোহন মূর্ত্তিকে উপহাস ক'রে তাঁর পবিত্র লীলার মর্কটাভিনয় দেখাবে, আর তাই দেখে আমি প্রাণধারণ কর্ব্ব? আমোদ-প্রমোদলিপ্সু দর্শকদের চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের পরিতর্পণের জন্য গণিকাকে দিয়ে গৌরাঙ্গ-লীলার অভিনয় করাবে, আর কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছাকে জীবনের একমাত্র উপজীব্য ব'লে গ্রহণ করার পরে আমি সেই তরল আমোদে ইন্ধন দিব? লোকের পকেট থেকে টাকা বের ক'রে নিয়ে তোমরা মদ খাবে, গণিকার পদসেবা করবে, আর গৌরাঙ্গ-লীলাভিনয়ের ছল ক'রে টাকা কেড়ে নেবার যে ফাঁদ পেতেছ, তার মাঝে আমি দর্শক হয়ে গিয়ে বসে তোমাদের বাহাবা দিব? নিশ্চয়ই না। হরিনামের এই অপমান আমার সহনক্ষমতার অতীত।" নাট্যকার বড় আশা ক'রে এসেছিলেন যে, যে মহাপুরুষ হরিকথা বলাকেই জীবনের একমাত্র ব্রতরূপে গ্রহণ করেছেন, হরিনাম শুনলে যাঁর দেহে পুলক-প্রকাশ হয়, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যই যাঁর উপাসনার বিগ্রহ, তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাভিনয় দেখবার আমন্ত্রণ পেয়ে কতই না জানি আহ্লাদিত হবেন! কিন্তু হ'ল বিপরীত। ক্ষুণ্ণ মনে তিনি গেলেন কলকাতার অপর উপকণ্ঠে দ্বিতীয় মহাপুরুষের নিকট। এই মহাপুরুষ দেবীভক্ত, কালীমাতার পাষাণ-প্রতিমা পূজা করেন। নাট্যকার তাঁর চরণে প্রণতঃ হয়ে নিজের মনোভাব নিবেদন কত্তেই তিনি বল্লেন,—"চৈতন্য! চৈতন্যের লীলা তুমি অভিনয় করবে! বেশ ত' বাছা, জগতের আদি মধ্য অন্ত সবই ত' চৈতন্যের লীলা, একমাত্র চৈতন্য ছাড়া আর ত' কিছুই কোথাও নেই!"

এ কথা বলেই মহাপুরুষ বারংবার "চৈতন্য" শব্দ উচ্চারণ কত্তে লাগলেন এবং "চৈতন্য" "চৈতন্য" বল্‌তে বল্‌তে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে মহাপুরুষ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখ্‌তে এসেছেন। একটী অল্পবয়স্কা গণিকা শ্রীচৈতন্যের ভূমিকায় পাঠ বল্‌তে এসে মঞ্চে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে দেবীভক্ত মহাপুরুষ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দর্শকরা ভাব্‌ল, এ কি পাগল নাকি ? কিন্তু দেখা গেল, তাঁর দৃষ্টি স্থির, চক্ষু অপলক, দক্ষিণ বাহু ঊর্দ্ধে প্রসারিত, শরীর মৃতদেহের ন্যায় কাষ্ঠ-কঠিন, শ্বাস নেই, প্রশ্বাস নেই। সে এক অদ্ভুত অবস্থা। "এই ত শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব হয়েছে,"—এই একটীমাত্র ভাবকে আশ্রয় ক'রে মহাপুরুষ বাহ্য জগৎকে একেবারে বিস্মৃত হয়েছেন, ভাব-সমাধিতে ডুবে গেছেন। নাট্যকার তাঁর নাট্য ফেলে ছুটে এসে পড়্‌লেন মহাপুরুষের পায়ে এবং কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লেন,—"প্রভো, মদ্যপ, গণিকাসক্ত, লম্পট আমি, আমাকে তোমার রাতুলচরণে একটু স্থান দাও, আমাকে উদ্ধার কর।"

উদ্দেশ্যের বিভিন্নতায় মহাপুরুষদের আচরণের বিভিন্নতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এই দুইজন মহাপুরুষের মধ্যে যদি তুলনা সুরু কর, নিশ্চয়ই তোমার প্রবৃত্তি হবে প্রথমোক্ত মহাপুরুষকে ছোট এবং শেষোক্ত মহাপুরুষকে বড় বল্‌তে। যুক্তি দেখাবে—উনি হচ্ছেন, নাসিকাকুঞ্চনকারী ছুৎমার্গী, আর ইনি হচ্ছেন, সর্ব্বজীবে সমদর্শী প্রেমিক। কিন্তু এতে তোমার বিপদ আছে। হয়ত গণিকার মুখে হরিনাম শুনেও প্রথমোক্ত মহাপুরুষের প্রাণে দিব্য প্রেমেরই সঞ্চার হ'ত, অনিত্যদেহবিশিষ্টা গণিকাকে উপেক্ষা ক'রে নিত্যবস্তু নাম তাঁকেও হয়ত সমাধিস্থ কত্ত, এতটা গভীর এতটা নিবিড় প্রেমরসসঞ্চার তাঁর হৃদয়েও হয়ত আছে। কিন্তু হরিনামকে উপলক্ষ্য ক'রে মানুষ যে গণিকাকেই দেখ্‌তে যায়, গণিকারই সংস্রব পেতে চায়, মানুষের সেই পাপকে সেই দুর্ব্বলতাকে প্রতিবাদের আঘাতে দূর করা তিনি লোকহিত তথা ভগবানের কাজ ব'লে মনে করেছেন। তাই তিনি সর্ব্বজীবে সমদর্শী হয়েও চান যে মানুষ শুদ্ধদেহে শুদ্ধ মনেই হরিনাম

করুক বা হরি-কথা বলুক, নিজের কর্ণ-সুখের জন্য হরিনাম-গান না শুনে ভগবানের প্রীতি উদ্দেশ্য ক'রেই শুনুক ; ভগবানের নামের দোহাই দিয়ে আহৃত অর্থ সাধারণ মানুষের ভোগ-পরিতৃপ্তিতে ব্যয়িত না হ'য়ে ভগবানের সেবায় লাগুক। সুতরাং তাঁর পক্ষে পরমপ্রেমিক হয়েও এরূপ নিমন্ত্রণ রক্ষার কোনো উপায় নেই। কে কি উদ্দেশ্যে কোন কাজটী করেছেন, চিন্তা করলে আর সাধুনিন্দার পাপে পড়তে হয় না। আমি যে মহাপুরুষদের কথা তোমাদের বললাম তাঁর মধ্যে প্রথমোক্ত মহাপুরুষের শিষ্যানুশিষ্যদের আচরণ এবং কর্ম্ম দেখলে অবাক হ'তে হবে যে বৈষ্ণব-নামধারীদের ভিতর থেকে ব্যভিচারকে তাঁরা কি ভাবে ঝেটিয়ে বিদায় করেছেন। শিষ্য-প্রশিষ্যদের সংকীর্ত্তি থেকে এরূপ বিচার করা চলে যে, প্রথমোক্ত মহাপুরুষ থিয়েটারে গৌরলীলা অভিনয় দেখতে অস্বীকার ক'রে আদর্শ-নিষ্ঠারই পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর জীবন থেকে তোমরা এই উপদেশ নিতে পার যে, সিদ্ধ-মহাপুরুষেরও যখন আদর্শ-নিষ্ঠা প্রয়োজন, তখন আমাদের মত সামান্য মানবের পক্ষে কোনো যুক্তিতেই আদর্শ-পরিত্যাগ সঙ্গত হবে না অর্থাৎ দু'জনের মধ্যে তুলনা ক'রে শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্টের বিচারে সময় ও প্রতিভার অপচয় না ক'রে পৃথক ভাবে ধ'রে কার জীবন থেকে আমরা কতটুকু কুশল আহরণ কত্তে পারি, সেই চেষ্টাই করা কর্ত্তব্য।

মহাপুরুষদের জাতিবিচার করিও না

অপর একটী প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা ববিলেন,—মহাপুরুষদের জাতি-বিচার কত্তে যেও না। 'মহাপুরুষ'ই একটা আলাদা জাতি। নরহরি ঠাকুর, সাধক রামপ্রসাদ প্রভৃতি ছিলেন বৈদ্যের ছেলে। কিন্তু তাঁরা নিজেরা বৈদ্য ছিলেন না, ছিলেন মহাপুরুষ। বুদ্ধদেব, জীন মহাবীর, গুরু নানক প্রভৃতি ক্ষত্রিয়ের ঘরে জন্মেছিলেন, কিন্তু নিজেরা কেউ ক্ষত্রিয় ছিলেন না, ছিলেন মহাপুরুষ। নরোত্তম দাস ঠাকুর, দাস রঘুনাথ গোস্বামী, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি ছিলেন কায়স্থের ছেলে। কিন্তু তাঁরা নিজেরা কায়স্থ ছিলেন না,—ছিলেন, মহাপুরুষ। বলদেব বিদ্যাভূষণ খণ্ডাইতকুলে

জন্মেছিলেন—কিন্তু নিজে খণ্ডাইত ছিলেন না, ছিলেন মহাপুরুষ। উদ্ধারণ ঠাকুর জন্মেছিলেন সোণার বেনের ঘরে, ঝড়ু ঠাকুর জন্মেছিলেন ভুঁইমালীর ঘরে, কবীর সাহেব আর ঠাকুর হরিদাস জন্মেছিলেন মুসলমানের ঘরে, কিন্তু জাতিতে এঁরা কেউ সোণার বেনে, ভুঁইমালী বা মুসলমান ছিলেন না, ছিলেন মহাপুরুষ। দাদূজী আর রোহিদাসের কি কেউ জাতি জিজ্ঞাসা করেছে? সবাই তাঁদের মহাপুরুষ ব'লেই পূজো করেছে।

মহাপুরুষের জন্মভূমি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—উপাস্যের চরণে অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণই মহাপুরুষের প্রকৃত জন্মস্থান। ভগবানে সর্ব্বতোভাবে নিজেকে আহুতি দেওয়াই হচ্ছে মহাপুরুষের জন্মভূমি। কোন্ যোনিতে কে জন্মেছেন, তা' জিজ্ঞাসা কত্তে যেও না। প্রত্যেক মহাপুরুষকেই অযোনিজ ব'লে জ্ঞান করবে।

সর্ব্বসাধারণ সম্পর্কে জাতিবিচার-বিলোপ

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—জাতি-বিচার এক সময়ে একটা মঙ্গল-উদ্দেশ্যকে অবলম্বন ক'রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু যুগের দাবী আলাদা। আজকের যুগ জাতিবিচারকে মানুষের উন্নতির সহায়ক ব'লে মনে কচ্ছে না, বিঘ্ন ব'লে জ্ঞান কচ্ছে। রাষ্ট্রে, ধন-বণ্টনে, সমাজে সর্ব্বত্র আজ সাম্যের দাবী মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এই সময়ে তোমাদের প্রত্যেকের ভেবে দেখা উচিত যে, শুধু মহাপুরুষদের বেলায়ই জাতির বিচারকে তুচ্ছ করা নয়, পরন্তু সর্ব্বসাধারণের প্রতি ব্যবহারেও জাতি-বিচারকে উপেক্ষা করার সৎ-পন্থা আছে কিনা। "সৎ-পন্থা" কথাটা এজন্য ব্যবহার কল্লাম যে, যে কার্য্যের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া কার্য্যের মঙ্গলকে নষ্ট ক'রে দেয়, সেই কার্য্য করার চাইতে না-করা ভাল। তোমাদের ভেবে দেখতে হবে যে, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রকে সমান করার পথ আছে কিনা, থাকলে সে পথটী কেমন এবং সে পথে চলার ফলে নিখিল সমাজ ও দেশের কুশল হ'তে পারে কতখানি আর অকুশল হ'তে পারে কতখানি।

কাজের পরিণাম-ফল দ্বারা তাহার বিচার

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দেশ জুড়ে রেল লাইন হ'লে তাতে একস্থানের মাল-পত্র অন্য স্থানে নেবার আনবার সুবিধে হবে, এক দেশের মানুষের সঙ্গে অন্য দেশের মানুষের অর্থ, ভাব, সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান সম্ভব হবে ভেবে রেল লাইনের প্রতিষ্ঠাকালে যাঁরা খুব উৎফুল্ল হয়েছিলেন, তাঁরা এখন দেখ্‌তে পাচ্ছেন যে, Culvert (পোল)গুলি ছোট ছোট এবং সংখ্যায় অতি কম হওয়াতে কোথাও জল আটকে বন্যা হচ্ছে, কোথাও স্বাভাবিক গতিতে প্রচুর জল যেতে না পারাতে জলাভাব ও অজন্মা হচ্ছে, আর যাদের মরবার কথা নয়, বছর বছর পঁচিশ পঞ্চাশ লাখ ক'রে তেমন সব লোক ম্যালেরিয়ায় মর্‌ছে। কয়েক কোটি টাকা খরচ ক'রে দামোদর নদে বাঁধ দেওয়া হ'ল জলহীন কৃষিক্ষেত্রে জল দিয়ে বর্দ্ধমানকে শস্য-শ্যামল কর্ব্বার উদ্দেশ্যে, আর এখন দেখা যাচ্ছে যে, বাঁধের ফলে প্রতি বৎসর অর্ব্বুদ টন বালি জ'মে জ'মে দামোদরের বুক হয়েছে উঁচু, আর সামান্য একটু বেশী বৃষ্টি যদি হাজারীবাগের জঙ্গলে হ'ল ত' মহা-মহা-পণ্ডিত ইঞ্জিনীয়ার-বরিষ্ঠদের মস্তিক-প্রসূত বুদ্ধিতে রচিত বাঁধ ভেঙ্গে কোনো বার পঁচিশ হাজার লোক জলে ডুবে মরে, কোনো বার ত্রিশ হাজার লোক তাল গাছের ডগায় ব'সে সাহায্যের প্রতীক্ষায় দিন গুণে গুণে শেষে অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। অর্থাৎ কাজ একটা ক'রে ফেল্লেই হ'য়ে গেল না, কাজটার পরিণাম-ফল থেকে বিচার হবে যে, কাজটা ভাল হ'ল কি মন্দ হ'ল। যুগের বাণীর প্রতি বধির হয়ো না, কিন্তু কর্ত্তব্য নির্ণয়ে মাথার ঘিলু খরচ কত্তে হবে।

বুদ্ধিকে ঈশ্বরানুগত কর

উপসংহারে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু মাথার ঘিলু থাক্‌লেই যে তা প্রয়োজন মত খরচ করা যায়, তা' নয়। প্রতিভার বল বা বুদ্ধির শক্তি অনেকেরই আছে, কিন্তু অহামিকা-প্রবুদ্ধ হ'য়ে তার প্রয়োগ হচ্ছে ব'লে তার অপব্যয়ই হচ্ছে। বুদ্ধির যেখানে সদ্ব্যয়, সৎকাজের সেখানেই পত্তন। নিজের বুদ্ধিকে

নিজের ব'লে জ্ঞান না ক'রে তাকে ঈশ্বরাভিপ্রায়ের অনুগত কত্তে চেষ্টা কর। প্রতিভার প্রাখর্য্যকে' তোমার নিজস্ব এক সম্পদ ব'লে গণনা না ক'রে তোমার জীবন-প্রভুর এক গচ্ছিত ধন ব'লে অনুভব কর। তারপরে তাঁরই প্রয়োজনে এ'কে সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর হাতে সঁপে দাও। এর ফলে প্রতিভা এমন এক দিব্য ব্যবহারে নিয়োজিত হ'য়ে যাবে, যা অঙ্ক কষে ঠিক করা যায় না। ভগবানের কাজ মানুষের হিসাবী বুদ্ধির অনেক উর্দ্ধ দিয়ে আর অনেক নিম্ন দিয়ে চলে।

চট্টগ্রাম,

? ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬

শ্রীশ্রীবাবা চট্টগ্রাম পাথরঘাটা আশ্রমে আসিয়াছেন। কয়েকটী উন্নতিকামী যুবকের সহিত কথাবার্ত্তা হইতেছে।

ক্ষণস্থায়ী আত্মসুখের প্রতি বিদ্রোহ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মানুষের প্রতি মানুষের অপ্রেমই জগতের সকল অশান্তির মূল। আবার ক্ষণস্থায়ী আত্মসুখের প্রতি অস্বাভাবিক লালসাই মানুষের প্রতি অপ্রেমের উৎস। এস আমরা ক্ষণস্থায়ী আত্মসুখের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করি।

আত্মসুখ-বিদ্রোহ ঘোষণায় চরিত্রবলের আবশ্যকতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু বিদ্রোহ-ঘোষণা নিতান্ত মুখের কথা নয়, নিতান্ত ছেলেখেলা নয়। বিদ্রোহ-ঘোষণায় চরিত্রবল লাগে। চরিত্রে যার বল নেই, তার বিদ্রোহ-ঘোষণা নাটুকেপনা ছাড়া আর কিছুই নয়। আদর্শ-নিষ্ঠাই বিদ্রোহের প্রাণ। সেই নিষ্ঠা আসে চরিত্র থেকে।

কুমিল্লা,

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬

ভক্তগণ মধ্যে বসিয়া নানা সৎকথার আলোচনা হইতেছে।

অতীতের জ্ঞানীদের দান তোমাদের জন্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জগতে যুগে যুগে কত কত মনীষীর আবির্ভাব হচ্ছে,

জগৎকে তাঁরা কত রকমের চিন্তার সম্পদ দিয়ে যাচ্ছেন। কেউ রম্য বেশ, কেউ দিব্য ভূষা, কেউ মূল্যবান্ হীরা-মাণিক্য, কেউ মধুময় তত্ত্ব জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে উপহার দিচ্ছেন। এ সবই তোমাদের জন্য, অতীতের সকল মহতের সকল দান অনন্ত অনাগতের সকল মানব-সন্তানের জন্য। মুনির অন্ত নেই, মনীষীর অন্ত নেই, কবির অন্ত নেই, দার্শনিকের অন্ত নেই, ঋষির অন্ত নেই, তপস্বীর অন্ত নেই,—এ সব অনন্ত মহাজন অনন্ত-বৈচিত্র্য-সম্পন্ন জ্ঞানরাশি তোমাদের জন্যেই রেখে গেছেন।

সকল জ্ঞানীর জ্ঞানই তোমার কাজে না আসিতে পারে

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু সকলের সকল কথাই যে তোমারই কাজে আস্‌বে, এরূপ মনে করা ভুল। বাজারে শত শত দোকান থাকে। সব দোকান থেকে সওদা কত্তে গেলে তোমার কড়িতে কুলুবে? জগতের লক্ষ লক্ষ জ্ঞানীদের সকলের সকল কথা শুনতে গেলে তোমার পরমায়ুতে বেড় পাবে? এজন্য, কোন্‌টীতে তোমার দরকার, আর কোন্‌টী তোমার নিষ্প্রয়োজন, তা নির্দ্ধারণ ক'রে নেবার শক্তি তোমার থাকা দরকার। ক্যাণ্ট, হেগেল, স্পিনোজা, স্পেনসার, বেইন, বেকন, কপিল, কণাদ, গৌতম, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতি ক'রে সকল দেশে সকল যুগে নানা মনীষীরা নানা প্রকারের দান তোমার জন্য রেখে গেছেন। কিন্তু তুমি অনুসরণ কর্ব্বে কাকে? কার বাণী শুনে নিজেকে চালাবে? একের মতের সাথে অপরের মতের বিরোধ আবিষ্কারের জন্য প্রতিভার প্রয়োজন হবে না, মতামতের সংঘর্ষ ও অসামঞ্জস্য সাধারণ লোকের চ'খেও পড়্‌বে। দু'জন চারজন বা দশজন জ্ঞানীর মতামতকে খিচুড়ী পাকিয়ে গ্রহণ করায় অসুবিধা আছে। কারণ, ডাল আর চাল পৃথক্ বস্তু হ'লেও তাদের মধ্যে স্বাদের সামঞ্জস্য আছে, তাই খিচুরী পাকালে চলে। কিন্তু ঋষি-মহর্ষিদের বিভিন্ন মতামতের ভিতরে সেই সামঞ্জস্য খুঁজে বের করা অত সহজ কর্ম্ম নয়।

সাম্প্রদায়িক আচার্য্যদের উপদেশ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এজন্যই শিষ্যকে একনিষ্ঠার পথে চালাবার উদ্দেশ্যে এক এক আচার্য্য এক একটা ক'রে সম্প্রদায় গড়েছেন এবং ভিন্ন ভিন্ন মহদ্ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মতামতের হট্টগোলের মধ্যে শিষ্যকে যেতে নিষেধ ক'রে ব'লে দিচ্ছেন—"হাজার দোকানদার হাজার জিনিষের ক্যানভাস্ কচ্ছে, তাতে তোমার কি? তাদের মনোহারী বচন-বিন্যাসে আকৃষ্ট হ'য়ো না, তাদের চিত্ত-বিনোদনকারী স্তোকবাক্যে অনাদর কর, আমি যা' ব'লে দিয়েছি, শুধু সেইটুকুতেই ঐকান্তিকী আস্থা স্থাপন কর, এর ভিতর দিয়েই পরমকুশলকে আহরণ কর।" চৈতন্য-পন্থী বল্‌ছেন,—"শঙ্করমতকে summarily reject (সদ্য না-মঞ্জুর) কর।" রামানুজ-পন্থী বল্‌ছেন,—"সাবধান, পাগলা হাতীতেও যদি তাড়া করে, তবু শৈব-মন্দিরে আশ্রয়ার্থি হ'য়ে যাবে না।" বৈষ্ণবমতাবলম্বী বল্‌ছেন,—"বুদ্ধদেব ভগবানেরই অবতার, কিন্তু তিনি এই উদ্দেশ্যেই অবতার হয়ে এসেছেন যেন সকল লোক উদ্ধার পেয়ে গোলোক-বৈকুণ্ঠে ভিড় জমাতে না পারে।" কথা শুনে মনে হয় যেন সেখানে ventilationএর প্রয়োজন! যিনি নিজ-সম্প্রদায়ভুক্ত শিষ্যকে যাই বলুন, কথাগুলির ভাল-মন্দ বিচার না ক'রে উদ্দেশ্যকে খুঁজ্‌তে গেলে দেখা যাবে যে, প্রত্যেকেই চাচ্ছেন, শিষ্য একনিষ্ঠ প্রযত্নে সাধন-পরায়ণ যেন হয়, দশ জায়গায় চাখাচাখি কত্তে গিয়ে শেষে যেন খেই হারিয়ে না ফেলে। বহু পুরুষের সাথে প্রীতিপূর্ণ ঘনিষ্ঠতা রক্ষা কত্তে গেলে অনেক সময়ে নিতান্ত সতী রমণীরও যেমন পাতিব্রত্যে পাতিত্য আসা সম্ভব, বহু প্রকারের মতামতের সাথে ঘনিষ্ঠতা কত্তে গেলে সাধকেরও তেমন নিজ সাধনে নিষ্ঠার চ্যুতি ঘ'টে যেতে পাবে। বাক্যগুলি সাম্প্রদায়িক আচার্য্যেরা যার কাছে যেমন ক'রেই বলুন, তাঁদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজ-সম্প্রদায়ভুক্ত শিষ্যদের সাধন-নিষ্ঠাকে অটুট ও অটল রাখা।

মহাপুরুষদিগকে লোক-বঞ্চনাকারী বলা অন্যায়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু অপরাপর মত-প্রচারকেরা সব দোকানদার,

আমরাই একমাত্র বিনামূল্যে প্রেম-বিতরণকারী, এই রকম ধারণা রাখা প্রায় কুসংস্কারের সামিল্। যত মতবাদী আর যত পথধারী নিজ নিজ মতের ও পথের প্রশংসা কচ্ছেন, তাঁরা-সব জীবকে বঞ্চনা কর্ব্বার জন্যই এত কষ্ট স্বীকার কচ্ছেন, এরূপ অভিযোগ অত্যন্ত অন্যায়। ভদ্রতাজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের এরূপ অভিযোগ করা উচিত নয়। বরং সত্য কথাটী এই যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ অনুভূতি ও সত্যোপলব্ধির অনুযায়ী জীবের হিতসাধন-সঙ্কল্পেই এত শ্রম কচ্ছেন। জীবকে প্রবঞ্চিত কর্ব্বার জন্যই আচার্য্য শঙ্কর মাত্র বত্রিশটী বছর পরমায়ুর ভিতরে আসমুদ্র হিমাচল আর আসাম থেকে কাশ্মীর বেদান্তবাণী শুনাতে শুনাতে পদব্রজে ভ্রমণ ক'রে বেড়ালেন, এরূপ অভিযোগ শুধু অন্যায়ই নয়, পাগ্‌লামীও বটে। জীবকুল যাতে বিষ্ণুপাদপদ্ম আশ্রয়ে নিঃশ্রেয়স লাভ ক'রে যমরাজকে পেন্সান দিয়ে না বসে, সেই আশঙ্কা দূর করার জন্যই বুদ্ধদেব তরুণ কৈশোরেই জীবের জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু দেখে কেঁদে উঠ্‌লেন, যৌবনে রূপবতী ভার্য্যা, প্রাণসম পুত্র আর বিপুল রাজৈশ্বর্য্য ত্যাগ ক'রে বোধিদ্রুমমূলে দীর্ঘকালব্যাপী তপশ্চর্য্যা কল্লেন এবং একাশী বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে বৃক্ষতলাশ্রয় ক'রে বা পর্ণকুটীরে বাস ক'রে ধর্ম্মদেশনা কর্ল্লেন,—এ সব কথা নিরেট মূর্খকেও বিশ্বাস করান কঠিন, যদি তার মাথার গোলমাল না থাকে। বস্তুতঃ জগতের সকল মহাপুরুষই লোকহিতকল্পেই যা-কিছু ব'লেছেন বা করেছেন। লোককে প্রতারিত কর্ব্বার বুদ্ধি তাঁদের কারোই ছিল না। এক এক জাতীয় লোকের জন্য এক এক প্রকারের বাণীর প্রয়োজন হয়েছে, এক এক চরিত্রের লোকের জন্য এক এক ধরণের মহাপুরুষের আবশ্যকতা পড়েছে। যুগ এবং লোকপ্রকৃতির দাবী অনুসারে এক এক প্রকারের মতামত নিয়ে এক এক প্রকারের মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে। ভারতের মাটীতে মহম্মদের আবির্ভাব কখনো সম্ভব হ'ত না, আরবের মাটীতেও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সম্ভব হ'ত না। কারণ, ভারতের লোক-চরিত্র আর আরবের লোকচরিত্র এক ছিল না। এক ছিল না ব'লেই মহম্মদের মুখে গীতার তত্ত্ব প্রকাশিত হয় নি, এক ছিল না বলেই শ্রীকৃষ্ণের মুখে

কোরাণের বয়েৎ নাজেল্ হয় নি। তাই ব'লে কি একজন মুসলমান বল্‌বে যে গীতার বাণী ঝুটা, আর একজন হিন্দু বল্‌বে যে কোরাণের বাণী মিথ্যা? অথবা গায়ের জোরে সবই বলা চলে, লাঠির জোরে প্রতিবাদকে দাবিয়েও রাখা যায়, কিন্তু উপলব্ধির জোরে সে কথা বলার সাহস কার আছে?

নামের মধ্যে বিশ্বের তত্ত্ব নিহিত

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে যে, তোমরা চল্‌বে কোন্ পথে। তোমরা শাক্ত নও, বৈষ্ণব নও, সাকারোপাসক নও, নিরাকার উপাসকও নও,—এমতাবস্থায় তোমরা কোন্ মতের শাস্ত্রগ্রন্থকে তোমাদের প্রামাণ্য ব'লে গ্রহণ ক'রে মতবাদের হট্টগোল থেকে বাঁচবার পথ ক'রে নেবে? তার উত্তর সোজা। যীশুই বল, আর মহম্মদই বল, শঙ্করই বল আর চৈতন্যই বল, নানকই বল আর কবীরই বল, সকলের জ্ঞানের উৎসও ভগবানের নাম, মতবাদের উৎসও ভগবানেরই নাম। তোমরাও ভগবানের নামেই মনকে লাগাও, প্রাণকে ডুবাও, চিত্তকে মজাও। জগতের আর সব কিছুকেই অতিরিক্ত জ্ঞান ক'রে অনন্যশরণ হ'য়ে একমাত্র নামেরই ভজনা কর। নামের ভিতর থেকেই আপনা আপনি তোমার নিজের দর্শন-শাস্ত্র ফুটে উঠ্‌বে। জগতের যত মত, যত পথ, সব তোমার ঐ একটী নামেই আছে। একটা ক্ষুদ্র বটবীজের ভিতরে যেমন অতি বৃহৎ মহীরুহ তার বহুদূর-বিস্তারী শিকড়, দশদিক্‌প্রসারী শাখাপ্রশাখা, বহু শাখীর জীবনধারণোপায়স্বরূপ কোটি কোটি ফল এবং বহু পান্থের আশ্রয়বিধায়িনী ছায়া নিয়ে লুকিয়ে থাকে, ঠিক্ তেম্‌নি জগতের সকল মতের, সকল পথের, সকল তত্ত্বের, সকল জ্ঞানের, সকল উপলব্ধির পরিপূর্ণ ভাণ্ডার জান্‌বে ভগবানের নামকে। নামকে নিত্যৈকশরণ কর, নামকে পরমাশ্রয়রূপে অবলম্বন কর। নামের মাঝে চ'খ ডুবাও, কাণ ডুবাও, মন ডুবাও, প্রাণ ডুবাও। দেখ্‌বে, নিখিল জগতের নিখিল মতবাদের সামঞ্জস্য নিয়ে তত্ত্ব তোমার নিকটে আপনি ফুটে উঠ্‌ছে। চৈতন্য বা শঙ্কর যাঁর পদানত হ'য়ে তত্ত্বকে দর্শন করেছিলেন, অকপট হৃদয়ে সহজ বিশ্বাসে

সরল আবেগে তাঁরই পদানত হও। কোনো দ্বিধা, কোনো দ্বন্দ্ব আর থাক্‌বে না,—কোনো সংশয় কোনো সন্দেহ আর তোমাকে পীড়া দেবার সাহস পাবে না।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১লা আষাঢ়, ১৩৩৬

নানা সৎপ্রসঙ্গ হইতেছে।

ভগবান্‌কে ডাকিতে সময়াভাব

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—একটা গান আছে না, "সকল কাজের পাই হে সময়, তোমারে ডাকিতে পাই নে"? আমাদের সকলেরই অবস্থা প্রায় তাই। "বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ, তরুণস্তাবত্তরুণীরক্ত, বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ, পরমে ব্রহ্মণি-কোঽপি ন লগ্নঃ।" বাল্যকাল কাটালাম খেলায়-ধুলায় আর ভাবলাম,—"বড় হ'লে ভগবানকে ডাক্‌ব," যৌবন কাটালাম ইতর সুখে আর আমোদ-প্রমোদে, বার্দ্ধক্য কাটালাম অতীতের দুষ্কৃতিসমূহের কথা স্মরণ ক'রে দুশ্চিন্তায়,—মন ভগবানে আর লাগল না।

আমার, মন মজিল না,
তব নামে কত মধু—
এখনো বুঝিল না।
বৃথা-বচন-আলাপে
রসনা সময় যাপে,
রহিল ডুবি শোক-তাপে
তোমারে ভজিল না।

ঠিক এই অবস্থাটা আমাদের প্রায় প্রত্যেকের। "নাম কত্তে হয়, কাল করব, আজ অন্য দশটা প্রয়োজনীয় কাজ সেরে নিই,"—আমাদের হিসাব এই ধরণের। "যতদিন যায়, তত কাজ বাড়ে, অবসর কই আর মিলিল না।"

কোনও ভুলই সংশোধনের অতীত নয়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু It is never too late to mend, অর্থাৎ ভ্রম-সংশোধনে আজও লেগে যাওয়া চলে; দেরী হ'য়ে গেছে ব'লেই হাল ছেড়ে দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এতদিন ত' তাঁকে ডাকিনি, কিন্তু আজ থেকেই যেন স্থরু করি।

বিপাকে পড়েছি হরি,
যেও না আজি পরিহরি,
রেখো চরণে নিজগুণে,
দীন অধমে ত' পূজিল না।
আমার মন মজিল না।

ময়মনসিংহ
৪ঠা আষাঢ়, ১৩৩৬

অধনে যতন করিও না

শ্রীশ্রীবাবা ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মপুত্রতীরে আসিয়া একটী নিভৃতস্থানে বৃক্ষতলে বসিয়াছেন। কতিপয় কলেজের ছাত্র উপদেশ শুনিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দেখ, একজন বৈষ্ণব মহাপুরুষ ব'লেছেন,—"অধনে যতন করি, ধন তেয়াগিনু। আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু।" অধনে যতন ক'রো না, প্রকৃত ধনের জন্য লালায়িত হও,—জগতের সেরা উপদেশ হচ্ছে এই।

শ্রীশ্রীবাবা কথাবার্ত্তা আর বেশী কহিলেন না। নদী-নীরের প্রতি লক্ষ্যহীন দৃষ্টি রাখিয়া নামজপে বসিয়া গেলেন। দুই একজন যুবক উপদেশের প্রতীক্ষায় কিছুকাল বসিয়া থাকিয়া তৎপরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

কয়েকজন বসিয়াই রহিলেন। তাঁহারা যখন লক্ষ্য করিলেন যে, শ্রীশ্রীবাবা চুপ করিয়া বসিয়া কি যেন করিতেছেন, তখন নিজেরাও দেখাদেখি যাঁর যাঁর রুচিমত নামজপ স্থরু করিলেন।

একটু রাত্র হইয়া আসিয়াছে এমন সময়ে শ্রীশ্রীবাবা গাত্রোত্থান করিলেন।

আচার্য্যের আচরণ

একটী যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমরা আপনার মূল্যবান্ উপদেশ শুন্‌ব ব'লে আশা কচ্ছিলাম, আর আপনি গেলেন চুপ মেরে!

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মুখে বল্‌লুম যে অধনে যতন ক'রো না, আর কাজের বেলায় বাক্‌চর্চ্চা নিয়েই থাকব? কথা না ব'লে যে চুপ ক'রে ছিলাম তাতে কি তোমাদের প্রাপ্তি বেশী হয় নি? হাজার টন কথার চাইতে কি একটী সর্ষপ পরিমাণ কাজের দাম বেশী নয়?

সকল নারীই শ্রীকৃষ্ণের কান্তা

রাত্রি প্রায় এগারটার সময়ে স্থানীয় একজন বৈষ্ণব-পন্থাবলম্বী ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—স্ত্রীলোকদের প্রতি আমাদের ভাব কি রকম হওয়া উচিত?

শ্রীশ্রীবাবা বলিালন,—আপনি যখন বৈষ্ণব, তখন আপনার দৃষ্টিতে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কেউ পুরুষ থাকা উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র নিত্যপুরুষ এবং আপনি থেকে সুরু ক'রে ত্রিজগতের সকল প্রাণী তাঁরই প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী প্রকৃতি ছাড়া আর কিছুই নন। সুতরাং আপনার কাছে নারীমাত্রেই কৃষ্ণ-কান্তা। কোনো নারীকেই আপনি নিজের নারী বা অপরের নারী ব'লে ভাবতে পারেন না। সকল নারীই কৃষ্ণের নারী। নিজের প্রেয়সী বা পরের প্রেয়সী ব'লে একটা কথাই থাক্‌তে পারে না। সবাই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই প্রেয়সী। নিজের ভোগ্যা বা অপরের ভোগ্যা ব'লে একটা কল্পনাই মনের কাছে আস্‌তে দেবেন না। জান্‌বেন, সবাই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-ভোগ্যা।

নিজেকে জানো কৃষ্ণদাস

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নারীকে ত' কৃষ্ণকান্তা জ্ঞান কর্ল্লেন। কিন্তু নিজেকে আবার জান্‌তে হবে, কৃষ্ণদাস। নারীকে বল্‌ব কৃষ্ণকান্তা, আর নিজেকে ভাব্‌ব

কৃষ্ণের সাথে অভেদ, এ' বড় ভয়ঙ্কর কথা। কয়েকজনকে মন্ত্র দিয়ে শিষ্য কল্লেন, তাঁরা বল্‌বেন,—"গুরু কৃষ্ণ অভেদ"। বাস্ আপনিও ভাব্‌তে সুরু কল্লেন,—"আমি যখন গুরু, তখন আমি ত' কৃষ্ণের সঙ্গে অভেদই!" ফল হবে কি? মৃত্যু এবং নরক।

কলিকাতা
৬ই আষাঢ়, ১৩৩৬

বিজ্ঞান কলেজের একটী ছাত্র আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে একজন আইন কলেজের ছাত্র-বন্ধু। বংশানুক্রম সম্পর্ক দু'জনের ভিতরে তর্ক লাগিয়া গেল। একজনের মত এই যে, পৈত্রিক বীজের সঙ্গে যে সব গুণাবলি নিয়া মানুষ আবির্ভূত হয়, তাহাই তাহার সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনকে পরিচালিত করে, শিক্ষা বা সংসর্গের ফল কিছুই নয়। অপর জনের মত এই যে, পৈত্রিক গুণাবলি যে যাহাই নিয়া আসুক, তাহার উপরে তাহার জীবনের ভবিষ্যৎ বলিতে গেলে মোটেই নির্ভর করে না, শিক্ষা এবং প্রতিবেশ-প্রভাবই তার সমগ্র ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রিত করে। দুজনেই বর্ত্তমান জীব-তত্ত্ব-বিদ্যা এবং সমাজতত্ত্ব-বিদ্যায় ওয়াকিফহাল।

সকল আপোষই অসত্যের প্রশ্রয় নহে

দুজনের তর্কের উৎসাহ কমিয়া আসিলে শ্রীশ্রীবাবা বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মতের গোঁড়ামি নিয়ে না থেকে, দুজনেই একটু এগিয়ে এসে আপোষ কর না হে! তাতে সত্যের উপরে অবিচার হবে না। সকল আপোষই অসত্যদুষ্ট নয়। অনেক আপোষ আছে, যেখানে পূর্ণ সত্যটাকে পাওয়া যায়। কেউ বল্‌ছেন,—"ভগবান্ জীবের সঙ্গে অভেদ, ভেদজ্ঞান অজ্ঞানতার ফল। অজ্ঞানতা বশতঃই জীব একজনকে অর্চ্চ্য এবং একজনকে অর্চ্চক মনে করে,—কিন্তু 'নানা' কিছুই নেই, সবই একমাত্র অদ্বিতীয় সত্তার মধ্যে বিরাজিত, সুতরাং দ্বৈতবাদ অসত্য।" কেউ বলছেন,—"ভগবান আর জীব কখনো অভেদ হ'তে পারেন না। একজন সেব্য, অপর জন সেবক, সেব্য না থাকলে সেবক অর্থহীন, সেবক না থাক্‌লে, সেব্য অর্থহীন; সুতরাং অদ্বৈত্যবাদ অসত্য।" এইভাবে এক এক মতবাদী নিজ নিজ

গোঁড়ামিতে বদ্ধ হ'য়ে পূর্ণ সত্যকে দেখতে অসমর্থ হচ্ছেন। কিন্তু ভগবান্ যে জীবের সঙ্গে অভেদ হ'য়েও আবার একই সঙ্গে জীব হ'তে ভিন্ন হ'তে পারেন, তিনি যে জীব হ'তে ভিন্ন হ'য়েও আবার একই সঙ্গে তাঁর সাথে অভিন্ন হ'তে পারেন, এই কথাটাকে একটা আপোষ বলা চলে। কিন্তু আপোষ ব'লেই যে এই কথাটা অন্য দুটা কথার চেয়ে কম সত্য, তা' বল্‌তে পারো ? আপোষের প্রতি অনেকেরই একটা তীব্র বিরক্তি দেখা যায়। তার কারণ হচ্ছে, অনেক সময়ে আপোষের দ্বারা সত্যকে অসম্মান করা হয় কিম্বা ন্যায়কে লঙ্ঘন করা হয়। কিন্তু সব আপোষই অসত্যের প্রশ্রয়দাতা এরূপ মনে করা ঠিক নয়।

বর্ত্তমান্ জীব-বিদ্যা মানুষের উপরে পরীক্ষিত নহে

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমাদের তর্কের বিষয়টী সম্পর্কেও সে কথা খাটে। বংশানুক্রম-তত্ত্ব সম্পর্কে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে সব গবেষণা করেছেন, তার উপাদান বা উপকরণ হচ্ছে গাছ, লতা আর জীবজন্তু। মানুষকে এখন পর্য্যন্ত সে সব পরীক্ষার উপাদান বা উপকরণ করা হয় নি। একটা পুরুষ-ইঁদুরের সাথে একটা স্ত্রী-ইঁদুরের মিলন সাধন করিয়ে হয়ত তার ফলাফল পরীক্ষা করা হ'ল। একটা লাল ফুলের রেণুর সাথে একটা শাদা ফুলের রেণু-বিনিময় ক'রে হয়ত তার ফলাফল পরীক্ষা করা হ'ল। কিন্তু একটা নির্দ্দিষ্ট-গুণসম্পন্ন পুরুষ-মানুষের শুক্র নিয়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক একটা নির্দ্দিষ্ট-গুণসম্পন্না মেয়ে-মানুষের গর্ভে আহিত ক'রে তার-পরে তার ফলাফল গবেষণার দ্বারা পরীক্ষা করা হয় নি। এরূপ পরীক্ষায় অসু-বিধাও আছে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে যার প্রত্যক্ষ গবেষণা হয় নি, এমন একটা পরীক্ষার ফলাফল ষোল আনা যে মানুষের বেলায় প্রযোজ্য হবেই, তা' মনে করা চলে না। এইজন্যই বৈজ্ঞানিকদের লব্ধ সবগুলি সিদ্ধান্তই মানুষের সম্পর্কে এক কথায় মেনে নেওয়া কঠিন হবে।

মানব শ্রেষ্ঠ কেন ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অন্যান্য জীবের সঙ্গে মানুষের একটা বিশেষ জায়গায়

তফাৎ আছে। সেই পার্থক্যটা হ'ল এই যে, অতীত কালের মানুষ ততোঽধিক অতীতের মানবের জ্ঞান এবং ভাষা শিক্ষা কত্তে পেরেছিলেন এবং বর্ত্তমান মানুষ অতীত কালের মানুষের জ্ঞান ও ভাষাকে আয়ত্ত কত্তে সমর্থ। এই সামর্থ্য মানবেতর জীবকে দেওয়া হয় নি। এই কারণেই মানব সর্ব্বজীবের শ্রেষ্ঠ। অতীতের জ্ঞান যে মানব অপরের কাছ থেকে আহরণ কত্তে পারে, এইটীই মানব-জীবনের এক বিধিদত্ত মহিমা। চৈতন্য, শঙ্কর, বুদ্ধ এঁরা কেউ আজকের মানুষ নন। কিন্তু দুর্ল্লভ মানব-তনু লাভের ফলে তাঁদের উপদেশকে, তাঁদের নির্দ্দেশকে আমি বা তুমি উপলব্ধিতে আন্‌তে পারি এবং সেই অনুসারে জীবনকে পরিচালিত কর্ব্বার চেষ্টা কত্তে পারি। একটী পশু বা একটী পক্ষী তার সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে ম'রে যায়, কিন্তু Instinct বা সহজাত সংস্কাররূপে যা সে নিজে তার পিতার কাছ থেকে পেয়েছে, তার অতিরিক্ত কোনো অভিজ্ঞতাই অপরকে দিয়েও যেতে পারে না, অপরের জন্য রেখেও যেতে পারে না। আর যারা রইল, তারাও সহজাত সংস্কারটুকু ছাড়া মৃতদের পরিত্যক্ত কোনো জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাকে নিজের কাজে লাগাতে পারে না। হাজার বছর আগেকার পাখী যে ভাবে উড়্‌ত, যে ভাবে বাসা তৈরী কত্ত, যে ভাবে ডিম পাড়্‌ত, আজকের পাখীর মধ্যে তার বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন হয় নি। অথচ দেখ, পঞ্চাশ বছর আগে মানুষ যে ভাষায় কথা বলত, আজ সেই ভাষাতে ঢং-এর পরিবর্ত্তন এসেছে, নব নব কত শব্দের সমাবেশ হয়েছে, পঞ্চাশ বছর আগেকার বেশভূষার পদ্ধতি আজ আর নেই; সৈনিক থেকে গ্রাম্য বামুন-পণ্ডিত পর্য্যন্ত সকলের বেশ-ভূষার ঢং বদল হয়েছে। মানুষ এ ভাবে বাইরের প্রভাবকে স্বীকার ক'রে নিজের ভিতরে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন আন্‌তে সমর্থ। মানুষের এই সামর্থ্যকে অবলম্বন ক'রে জগতে যুগে যুগে মানুষের নব নব সভ্যতার নব নব কৃষ্টির নব নব সংস্কৃতির পত্তন হয়েছে।

সংসর্গের শক্তি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সুতরাং একথা স্বীকার কত্তেই হবে যে, সংসর্গ এবং

প্রতিবেশ-প্রভাব মানুষের জীবন গড়ার পক্ষে এক মস্ত বড় জিনিষ। অনুকূল হ'লে এর দ্বারা তার সমূহ উন্নতি হ'তে পারে, প্রতিকূল হ'লে এর দ্বারা তার প্রভূত অবনতি ঘটতে পারে। চতুর্দ্দিকের সমাজ যেখানে পঙ্কিলতার দৃষ্টান্তই মাত্র প্রদর্শন কচ্ছে, সেখানে উত্তম লোকের ঔরসে জ'ন্মে বা উত্তমা নারীর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হ'য়েও জীবনটা মন্দ হবার সম্ভাবনাই খুব বেশী। আবার যেখানে চতুর্দ্দিকের আবেষ্টন সাধুতাময়, সেখানে স্বেচ্ছাচারী পাপিষ্ঠের ঔরসে এবং অসচ্চরিত্রা কু-রমণীর গর্ভে জন্মেও প্রতিবেশ-প্রভাবে জীবনটা ভাল পথে চল্‌বার সম্ভাবনা খুব রয়েছে। কুসঙ্গ যদি না পায়, তাহ'লে চোরের ছেলে চোরই হবে, সব সময়ই এমন মনে করা যায় না। সুসঙ্গ যদি না পায়, তা' হ'লে সৎলোকের ছেলে সৎই হবে, এমনও মনে করা যায় না। পৃথিবী-বিখ্যাত অনেক দৃঢ়চেতা ধর্ম্ম-নিষ্ঠ আচারবান্ সাধু ব্যক্তির পুত্রকেও অনেক সময়ে অস্থিরমতি, চঞ্চলচিত্ত, দুর্ব্বলমনা, কদাচারী ও স্বধর্ম্মত্যাগী হ'তে দেখা যায়। আবার, কুখ্যাত অসচ্চরিত্র পরস্বাপহারী নির্ম্মমহৃদয় ব্যক্তির পুত্রকেও অনেক সময়ে সচ্চরিত্র পরার্থপর পরদুঃখকাতর হ'তে দেখা যায়। এ সব হচ্ছে সংসর্গের ফল, প্রতিবেশের ফল, শিক্ষার ফল। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ছেলে রেস্তোঁরাতে ব'সে কুখাদ্য খায়, এটা কি তার পৈত্রিক বীর্য্যের ফল, না সঙ্গদোষের মহিমা?—সুতরাং সংসর্গের ফলে, চতুর্দ্দিকের সামাজিক অবস্থার প্রভাবে, শিক্ষার প্রভাবে মানুষের যে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হ'তে পারে, এটা মান্‌তেই হবে।

বংশানুক্রমসম্পর্কে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—চোরের ছেলে জন্মের পর থেকে যদি কোনো চোরের সংশ্রব না পায়, তা'হলে সে চোর হবে না, কিন্তু তার তস্কর পিতার প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব সে বংশানুক্রমিকতার নিয়মেই পাবে। ফলে, তাকে যদি অনুরূপ সংসর্গে রাখা যায়, তা' হ'লে সে অন্য কোনও রকমের জীবিকা অবলম্বন ক'রে সেই পৈত্রিক সম্পদ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সদ্ব্যবহার কর্ব্বে। কবির ছেলে কাব্যের

সংশ্রবে না থাক্‌লে বা কাব্যসম্পর্কিত শিক্ষা ও অনুশীলন না পেলে কবি হবে না, কিন্তু তার কবি পিতার যে সূক্ষ্মানুভূতির ক্ষমতা, তার কবি পিতার যে ক্ষুদ্র বস্তুর ভিতরে বৃহৎকে লক্ষ্য করার ক্ষমতা, পৈত্রিক উত্তরাধিকাররূপে তাকে সে বংশানুক্রমিকতার নিয়মেই পাবে এবং জীবনের অন্যতর এক কর্ম্মক্ষেত্রে সেই প্রাপ্ত ক্ষমতার ব্যবহার ক'রে কৃতিত্ব দেখাবে। এইটী হ'ল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বংশানুক্রমসম্পর্কে মতামত।

পৈত্রিক গুণাবলী সঞ্চরণের বৈজ্ঞানিক রহস্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পিতামাতার দেহ থেকে পুত্র কন্যা তাদের দেহ পায়, সুতরাং পিতামাতার মস্তিষ্ক থেকে পুত্রকন্যা তাদের মস্তিষ্কও পায়। পাশ্চাত্যদের বিচার এই জড় দৃষ্টিতে চলেছে। স্ত্রী-রজের বা পুং-বীর্য্যের সূক্ষ্মতম অংশে (nucleusএ) অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজাংশসমূহ রয়েছে, যাকে তাঁরা নাম দিয়েছেন ক্রোমোসোম (chromosomes) ব'লে। এই প্রত্যেকটী বীজাংশের মধ্যে একটী ক'রে বংশানুক্রমিক গুণের সমাবেশ রয়েছে। একটী শ্বেতাঙ্গ স্ত্রীলোকের প্রত্যেকটী রজঃকীটের সূক্ষ্মতম অংশে এ রকম আটচল্লিশটী গুণ-বাহিক বীজাংশ বৈজ্ঞানিকেরা দেখেছেন। স্বামীর বীর্য্যে ও স্ত্রীর রজে মিলে এ ভাবে অসংখ্য বীজাংশ হয়েছে। শুক্রের গর্ভ-প্রবেশের পরে স্বামী আর স্ত্রীর বীজাংশসমূহের মধ্যে এক তীব্র আলোড়ন হ'য়ে তাদের এমন ভাবে সংমিশ্রণ হ'য়ে যায় যে, হয়ত স্বামীর কতকগুলি গুণ ভ্রূণের মধ্যে প্রধান হ'য়ে গেল, বাকী গুণগুলি অপ্রধান বা অর্দ্ধলুপ্তবৎ থেকে গেল ; স্ত্রীর আবার কতকগুলি গুণ ঐ ভ্রূণটীর মধ্যে বিশেষভাবে প্রকট হ'য়ে গেল, কিন্তু আবার কতকগুলি গুণ কোনও এক অজ্ঞাত কারণে প্রচ্ছন্নবৎ র'য়ে গেল। পিতার শুক্রে বীজাংশসমূহে পৈত্রিক কত কত দোষগুণ ছিল, মাতার শুক্রে আবার তার পৈত্রিক কত দোষগুণ ছিল। সেই সব এসে মিশ্রণের বেলায় একই মাতা-পিতার সন্তান একটী হ'লেন হালুয়া, একটী হ'লেন পোলাউ, একটী হ'লেন খিচুড়ী, একটী হ'য়ে গেলেন পায়েস। একই

রজোবীর্য্য রয়েছে, তবু একটী সন্তানে কেন কতকগুলি দোষগুণ প্রবল হ'ল, আর একটীতে সে গুলি হয় অপ্রবল, তৃতীয়টীতে সেইগুলি থাকে একেবারে লুপ্ত, এই সমস্যার মীমাংসা আমাদের পাশ্চাত্য ভায়ারা কত্তে পারেন নি।

জন্মকে ভারতীয় ঋষিরা আত্মার দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভারতে নরনারীর শুক্রশোণিতগত মিশ্রণকে সাধু উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালনের জন্য বহুশতাব্দীব্যাপী পুরুষানুক্রমিক চেষ্টা হয়েছিল। সন্তানকে তাঁরা শুক্র ও শোণিতের সংমিশ্রণে উৎপন্ন একটী মস্তিষ্কসংযুক্ত দেহ মনে না ক'রে একটী আত্মা ব'লে সর্ব্বদা দেখেছেন। নরনারী যখন সন্তানার্থে মিলিত হচ্ছেন, তখন পুরুষের একবিন্দু বীর্য্য নারীর গর্ভ মধ্যে প্রবেশ কল্ল, বা একটী সূক্ষ্ম পুং-বীজ গিয়ে একটী সূক্ষ্ম স্ত্রী-বীজের মধ্যে আহিত হ'ল,—ভারতীয় ঋষি সেই দৃষ্টিতে ব্যাপারটীকে দেখেন নি। তিনি তাঁর যোগলব্ধ প্রজ্ঞাবলে দেখেছেন যে, শুক্র এবং শোণিতের মধ্যগত উপাদানকে নিজ ক্রমবিকাশের অনুকূল জেনে একটী অদৃশ্য আত্মা * এসে পুং-বীজকে আশ্রয় ক'রে দ্রুতগতিতে স্ত্রী-বীজে বা ডিম্বকোষে প্রবেশ কল্ল এবং এই প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সেই আত্মার পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মফলানুযায়ী পিতৃবীজ ও মাতৃবীজের সূক্ষ্মবীজাংশ সমূহের (chromosomes) মিশ্রণ হ'ল। এক একটী আত্মা অতীতের সঞ্চিত এক এক প্রকারের কর্ম্মফল নিয়ে মাতৃগর্ভে প্রবেশ কচ্ছে ; এই কারণেই গুণবিধায়ক পৈত্রিক বীজাংশ এবং গুণবিধায়ক মাতৃকবীজাংশগুলির এক রকমেরএক Permutation and Combination (মিশ্রণ) হচ্ছে। এতেই এক সন্তানের মধ্যে একপ্রকারের এবং অপর সন্তানের মধ্যে অন্য প্রকারের গুণ-বিকাশ দেখা যাচ্ছে।

---

* শ্রীশ্রীমৎস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" গ্রন্থে উপসংহারের পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আধ্যাত্মিক পুরুষানুক্রমিকতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জন্মকে আর্য্য-ঋষিরা আত্মার দৃষ্টিতে দেখেছেন, তাই প্রত্যেক সুকর্ম্মা সুকৃতি নবজাতব্য শিশু অতীত জন্মের পুঞ্জীকৃত পুণ্যফল নিয়ে যেন এই গর্ভে আর এই ঔরসে আকর্ষণের মত বস্তু পেয়ে এখানেই এসে প্রবেশ করে, তার ব্যবস্থাকেই বিবাহিত জীবনের প্রধানতম কর্ত্তব্য ব'লে মনে ক'রেছেন। তাই তাঁরা প্রত্যেক দম্পতীকে দেহে পবিত্র, মনে পবিত্র, এমন কি সম্ভোগ-কালে পর্য্যন্ত পবিত্র রাখ্‌বার প্রয়াস পেয়েছেন বা তার জন্য পন্থা খুঁজেছেন। তাঁরা পুরুষানুক্রমকে অতি দৃঢ়তার সঙ্গে মেনেছেন, এবং দৈহিক দিক্ দিয়ে পুরুষানুক্রমকে যথাসম্ভব উৎকৃষ্ট কর্ব্বার চেষ্টাতেই তৎকালে,—জাতিভেদই বল আর নারীর সতীত্ব-মর্য্যাদাই বল, কিম্বা বিবাহ-সম্পর্কিত নানা অনুষ্ঠানই বল,—এসব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু তার চেয়েও তারা বেশী বিশ্বাস করেছেন, আত্মার উৎক্রমণকে। আত্মার দৃষ্টিতে সন্তানের জন্মকে দেখেছেন ব'লেই তাঁরা একথা মনে কত্তে পেরেছেন যে, একজন রাজা দশরথের ঘরে বিষ্ণুর পুনরাবির্ভাব হ'তে পারে বা একজন দৈবকীর গর্ভে ভগবান জন্ম নিতে পারেন। মানুষ নিজের ভিতরে উৎকর্ষের চরম শ্রেষ্ঠতাকে প্রতিষ্ঠিত কত্তে পার্লে সে আশা কত্তে পারে যে দৈবী বিভূতি তার গর্ভে বা ঔরসে মানব-তনু নিয়ে আবিভূত হ'তে পারে। আবির্ভূত হয় আত্মা, দেহ তার আবির্ভাবের বাহন মাত্র। সুতরাং আর্য্যঋষির যে পুরুষানুক্রমিকতাতে অচল বিশ্বাস, সেটী হচ্ছে প্রকৃত প্রস্তাবে আধ্যাত্মিক পুরুষানুক্রমিকতা।

আধ্যাত্মিক পুরুষানুক্রমিকতাবাদীর প্রতিবেশ-প্রভাবে তাচ্ছিল্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পুরুষানুক্রমিকতার দৃষ্টি যেখানে আত্মাকে লক্ষ্য ক'রে, সেখানে প্রতিবেশ-প্রভাবের মর্য্যাদা ত' কম হবেই। চোরের ছেলেকে অন্য স্থানে নিয়ে সাধুসঙ্গে রাখ্‌লে সে চোর হবে না, এই হচ্ছে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের

অনুমান। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, মানুষের দেহটাকে চোরও বলা চলে না, সাধুও বলা চলে না। একটা আত্মা যে এসে এত সব সাধু-সজ্জন থাকৃতে বেছে-বুছে একটা চোরেরই ঔরসে দেহ নেয়, তার কারণ কি? কর্ম্মফলে বিশ্বাসী ব্যক্তি বলবেন যে, তার কারণ তার নিজের পূর্ব্বজন্মের চৌর্য্যসংস্কারের অনুকূল এবং সাধুসংস্কারের প্রতিকূল কর্ম্মনিচয়।—একটী বেশ্যার মেয়েকে লেখাপড়া শেখাবার পরে কোনও ব্রাহ্ম পরিবারে বিবাহ দেবার প্রস্তাব উঠেছিল। মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এতে তীব্র আপত্তি ক'রে বলেছিলেন যে, বেশ্যার গর্ভে যে জন্মগ্রহণ করেছে, সে নিশ্চয়ই ঐরূপ একটা অপবিত্র দেহে প্রবেশের প্রাক্তনসংস্কার নিয়েই ভ্রূণমধ্যে প্রবেশ করেছিল। অতএব এখন যদি তাকে কুলবতী ক'রে নব-ব্রাহ্মিকারূপে কোনও সাধু-পরিবারের অন্তর্ভুক্তা ক'রে নাও, দুদিন হয় ত' সে সংসর্গের প্রভাবে প্রশংসনীয় জীবনই যাপন কর্ব্বে, কিন্তু কিছুদিন পরে তার মাতৃশোণিতের প্রমাণ তার আচরণের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পাবে এবং তাতে সমাজ ধ্বংশ হবে। এ ভাবে আধ্যাত্মিক পুরুষানুক্রমিকতাবাদীরা প্রতিবেশ-প্রভাবকে কতকটা তাচ্ছিল্যই করেন।

আধ্যাত্মিক পুরুষানুক্রমিকতাবাদীর প্রতিবেশ-প্রভাব ও শিক্ষার শক্তি স্বীকৃতি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু যে আজ চোরের ঔরসে বা অসতীর গর্ভে দেহ নিয়েছে, সে যাতে আগামী জন্মে একটা চোরের ঔরস সহযোগে একটা অসতী নারীর গর্ভেই গিয়ে পুনরায় দেহপ্রাপ্তির কাঙ্গাল না হয়, সে যাতে যোগী, শ্রীমান, সন্ত পুরুষের ঔরসে তদুচিত মহীয়সী মহিলার গর্ভে নবতনু ধারণের সুযোগ পায়, তার জন্য কি আজ তার সৎসংসর্গের প্রয়োজন হবে না? তার জন্য কি আজ তার সৎশিক্ষার দরকার হবে না? তার জন্য কি আজ তার সৎকথা শ্রবণ, সদ্‌বিষয়ের মনন, সৎকর্ম্মের অনুশীলন আবশ্যক হবে না? অর্থাৎ ভবিষ্যতের কুশলের জন্য তার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং সর্ব্বাঙ্গীন—thorough—শিক্ষার প্রয়োজন।

অতীতে এই শিক্ষা যদি সে পেত, তা' হ'লে সে আর এবার একটী চোরের ছেলে হয়ে জন্মাত না। সুতরাং অধ্যাত্ম-পুরুষানুক্রমিকতাবাদী প্রকারান্তরে শিক্ষা, সৎসংসর্গ এবং প্রতিবেশের প্রভাবকেও স্বীকার ক'রে নিচ্ছেন।

বংশানুক্রম ও শিক্ষার যুগপৎ মিলন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ফলে দাঁড়াল এই যে, জড়বাদী পাশ্চাত্য আর অধ্যাত্মবাদী ভারত উভয়েই একদিকে যেমন পুরুষানুক্রমিকতার শক্তিকে স্বীকার কচ্ছেন, অপর দিকে তেমন শিক্ষার মহিমাকেও স্বীকার কচ্ছেন। অর্থাৎ পৈত্রিক সম্পদ আর শিক্ষালব্ধ সম্পদ উভয়েরই সমান আবশ্যকতা আছে। আমরা যে জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত, ত্যাগবলে প্রবুদ্ধ, কর্ম্মবলে বলীয়ান্ ভবিষ্যৎ ভারতের কল্পনা কচ্ছি, তার আত্ম-প্রকাশ হবে বংশানুক্রমিকতার বিশোধন এবং শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরতা সম্পাদন—এই দুটী কাজের যুগপৎ অনুষ্ঠানে। একমাত্র বংশানুক্রমিকতার জয়-কীর্ত্তন ক'রেও নয়, কিম্বা শুধু শিক্ষার শক্তির স্তুতিপাঠ ক'রেও নয়, পরন্তু মানব-জীবন গঠনে, সমাজের কুশল বর্দ্ধনে, আত্মার বিকাশ সাধনে, অন্নের অর্জ্জনে এবং ধর্ম্মের আচরণে, জ্ঞানের অনুশীলনে আর প্রেমের পরাকাষ্ঠা লাভে এই দুইটী শক্তিকে সমযোগে অনুকূল করার আপ্রাণ চেষ্টার মধ্য দিয়ে মানবের মুক্তিপথ কণ্টক-রহিত হবে।

সারগ্রাহী হও

কিছুক্ষণ পরে কলিকাতার একটী নবপ্রতিষ্ঠিত মঠের একজন ত্যাগী আসিয়া আলোচনা শ্রবণে বসিলেন। তিনি বলিলেন,—স্বামীজী, বংশানুক্রম প্রভৃতি সম্পর্কে আপনি যে এত সব কথা বল্‌ছেন, ওসব কথায় সন্ন্যাসীর কি কাজ? হরি-বিমুখ জন-সমাজকে হরি-চরণের প্রতি আকৃষ্ট করাই আপনাদের কর্ত্তব্য। যে কথার সঙ্গে সাক্ষাৎ হরি-ভজনের কোনো সম্পর্ক নেই, তা' নিয়ে আপনি এত কালক্ষয় করেন কেন?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কথা বলেছেন ঠিক্। একমাত্র হরিভজন-প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য প্রসঙ্গ করাও উচিত নয়, শোনাও উচিত নয়।

আইন-কলেজের ছাত্রটী বলিলেন,—ইনি যেন এতক্ষণ বাজে প্রসঙ্গেই সময় নষ্ট করেছেন, কিন্তু আপনি আবার ধৈর্য্য ধ'রে এতক্ষণ সময় নিয়ে এই কথাগুলি শুনে যে হরি-ভজন থেকে বিচ্যুত হলেন, এটী আরো দুঃখের কথা হ'ল।

প্রশ্নকর্ত্তা-সাধুর মুখমণ্ডলে বিরক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—আমি যে এতক্ষণ স্বামীজীর কথা শুনেছি, আমি কি সঙ্গে সঙ্গে মালা জপি নাই ?

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—সে ত' ঠিক্ কথা !

প্রশ্নকর্ত্তা সাধু চটিয়া গিয়া বলিলেন,—গৃহীরা গ্রাম্যজীব, নারকী, ভোগাসক্ত, মোহান্ধ। আপনি তাদের চর্চ্চা নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। হরি-ভজন কি গৃহীর কাজ ? কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাই জীবনের লক্ষ্য যাদের, তারা কর্‌বে হরি-ভজন ?

আইন-কলেজের ছাত্রটী হাসিয়া বলিলেন,—তারা যদি হরি-ভজনের যোগ্যই না হ'ল, তবে আর তাদের কাছে হরি-কথা ব'লে লাভ কি সাধুজী ?

সাধুজী গৃহস্থাশ্রমীদের অপদার্থত্ব সম্বন্ধে অতি বিশুদ্ধ ভাষায় আরও কতকগুলি কটূক্তি বর্ষণ করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে বিজ্ঞান-কলেজের ছাত্রটী জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাশয়, এখন কোথা থেকে আস্‌ছেন জিজ্ঞাসা কত্তে পারি কি ?

সাধুবর একটু নরম হইয়া বলিলেন যে তিনি মঠের জন্য ভিক্ষা-সংগ্রহে বাহির হইয়াছিলেন এবং ভিক্ষাটন সারিয়া এখন মঠে ফিরিতেছেন।

আইন-কলেজের ছাত্রটী জিজ্ঞাসা করিলেন,—জিজ্ঞেস্ কত্তে পারি কি যে, আপনি কোথায় কোথায় ভিক্ষার জন্য গিয়েছিলেন ?

সাধুজী বলিলেন যে তাঁহাদের মঠের কয়েকজন ভক্ত অমুক অমুক গলিতে বাস করেন, তাঁদের নিকটেই গিয়াছিলেন এবং যৎকিঞ্চিৎ সেখানে পাইয়াছেনও।

প্রশ্ন হইল,—এসব দাতারা কি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ?

সাধুজী বলিলেন,—না, তা' নন, তবে খুব সাধন-ভজন-পরায়ণ গৃহী লোক।

"বলেন কি? গৃহী লোক? গৃহীরা সাধন-ভজন-পরায়ণ হ'তে পারে?"—এই কথা বলিয়া কলেজী ছেলে দুইজন হাসিয়া উঠিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাদিগকে সংযত করতঃ সাধুবরকে বলিলেন,—এঁদের শিক্ষা-সংস্কৃতি আপনার শিক্ষা-সংস্কৃতির থেকে এত তফাৎ যে, এঁদের সঙ্গে বাক্যালাপে আপনি আনন্দ পাবেন না।

সাধুবর প্রস্থান করিলেন।

যুবকদ্বয় সাধুদের মঠ সম্পর্কে অপ্রীতিকর মন্তব্যে উদ্যত হইলে শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাদের থামাইয়া দিয়া বলিলেন,—দেখ বাবা, সাধুটী যে ভাব-ভঙ্গীই প্রদর্শন করুন, তিনি সকল কথার সেরা একটা কথা এই ব'লেছেন যে, হরি-কথাই কথা, হরি-ভজনই কাজ। তাঁর অনেক কথা থেকে এই সারটুকু কেন গ্রহণ কর না? একটা আম তোমাকে কেউ খেতে দিলে তুমি তার বাকল আর আঁঠি ফেলে দিয়ে অমৃত-রসটুকুই গ্রহণ করবে। কিন্তু ইনি যে কাঁঠাল পরিবেশন ক'রেছেন, তার আসল খাদ্য ফেলে দিয়ে কাঁটার নিন্দা, বোথার নিন্দা, আঠার নিন্দা কচ্ছ কেন? পৃথিবীর কত লোকে কত রকমের ভাব নিয়ে আছেন। এক একটা মূলভাবকে অবলম্বন ক'রে তাঁরা তাতে এমন প্রগাঢ় অভিনিবেশ দেন যে, এতে অন্যদিকে কিছু যতি-ভঙ্গ হচ্ছে কিনা, কিছুটা disproportionate হ'য়ে গেল কি না, সেইদিকে লক্ষ্য দেবার অবসর পান না। এসব ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা কথার আর প্রত্যেকটা আচরণের চুলচেরা বিচার না ক'রে সারের দিকে লক্ষ্য দিতে হয়। তোমরাও সারগ্রাহী হও বাবা, সারগ্রাহী হও।

ধর্ম্মান্দোলনসমূহের প্রসারে পুরুষানুক্রমিকতা

যুবকদের মধ্যে একজন বলিলেন,—একদিকে একটু প্রগাঢ় অভিনিবেশ দিতে যাচ্ছি ব'লে অন্যদিকে যতিভঙ্গ কেন হয়? এর প্রকৃত কারণ কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এ প্রশ্নেরও উত্তর ঘুরে ফিরে সেই বংশানুক্রম আর প্রতিবেশ-প্রভাব, কৌলিক-শক্তি আর শিক্ষা। ভিন্ন মতের ভিন্ন পথের প্রতি

সহিষ্ণুতাসহকারে নিরপেক্ষ থাকা আর নিজের পথে দৃঢ় থেকেও চতুর্দ্দিকের ভারসাম্য রক্ষা ক'রে চলা, কতকটা কৌলিক-শক্তি-সাপেক্ষ, কতকটা শিক্ষা ও সংসর্গ-সাপেক্ষ। জগতে এক একটা ধর্ম্মমতকে নিজের জীবনে আচরিত ও সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত প্রসারিত করার জন্যে যে শত শত লোক জীবন দিয়েছেন, একটু লক্ষ্য কর্‌লেই দেখা যাবে যে, তাঁরা এক একটা নির্দ্দিষ্ট type-এর লোক। মহম্মদের ধর্ম্ম যাঁরা প্রচার ক'রেছেন, তাঁদের সকলের মধ্যে একটা জিনিষ এমন common যে, তাঁদের সকলকে একটা নির্দ্দিষ্ট type ব'লে মনে করা চলে। যাশু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম যাঁরা প্রচার ক'রেছেন, তাঁদের মধ্যেও একটা জিনিষ এমন common যে, তাঁদেরও প্রায় সকলকে একটা নির্দ্দিষ্ট type ব'লে মনে করা চলে। বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতির অনুবর্ত্তীদের মধ্যেও লক্ষ্য কর্‌লে এক একটা typeএর হদিস্ পাওয়া যাবে। অনেক লোকের ভিতরে যদি কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট গুণ বা ভঙ্গীর অল্পাধিক সমাবেশ দেখা যায়, তা হ'লে তাঁদের একটা নির্দ্দিষ্ট type-এর অন্তর্ভুক্ত ব'লে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু একটা নির্দ্দিষ্ট type-এর লোক যে একই যুগে অনেকগুলি পাওয়া যায়, তার এক কারণ শিক্ষা, অপর কারণ কৌলিক গুণসংক্রমণ। শিক্ষা বা সংসর্গ-প্রভাবের চেয়েও কৌলিক সংক্রমণ এ ক্ষেত্রে হয়ত বেশী কার্য্যকর। জগতে এত এত ধর্ম্মান্দোলন হ'য়েছে, কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম্মান্দোলনের মাঝে বংশানুক্রমিক গুণ-সংক্রমণ কতখানি অবদান দিয়েছে বা শক্তিসঞ্চার ক'রেছে, তার কোনো হিসাব ত' কেউ রাখে নি! একদল লোক জন্ম থেকেই এমন মস্তিষ্কের গঠন নিয়ে আসে, যারা অত্যন্ত সাহসী, অত্যন্ত উগ্র, অত্যন্ত বিশ্বাসী, অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্, অথচ অত্যন্ত অসহিষ্ণু। আর একদল লোক জন্ম থেকেই এমন মস্তিষ্কের গঠন নিয়ে আসে, যারা প্রেমিক, কোমল, ইষ্ট-বিশ্বাসী, নিষ্ঠাবান্ কিন্তু অত্যাচারে পটু নন, অত্যাচার-সহনে পটু। এই মস্তিষ্কের গঠনটা, বংশানুক্রমিকতার দান। শিক্ষার ফলে একটু এদিক-সেদিক করা চলে বটে, কিন্তু মোটামুটি পূর্ব্বপুরুষের রক্তের ধর্ম্মটাই প্রবল থাকে। সুতরাং বুঝ্‌তে পাচ্ছ, হে ছেলেরা, নিজের মতে অটুট নিষ্ঠা সত্ত্বেও যারা

অন্যের ব্যাপারে অসহিষ্ণু নয়, এমন ভারসাম্যবান্ ধার্ম্মিকদের আবির্ভাব যদি চাও, তা' হ'লে বংশানুক্রমকে সংশোধনের জন্য দেশব্যাপী এবং যুগ-যুগান্তব্যাপী প্রয়াসের প্রয়োজন আছে।

কলিকাতা,
৭ই আষাঢ়, ১৩৩৬

বহু জিজ্ঞাসু যুবকেরা সমবেত হইয়াছেন। এক একজন এক একটী করিয়া প্রশ্ন করিতেছেন, আর শ্রীশ্রীবাবা তাহার উত্তর দিয়া যাইতেছেন।

সর্ব্বভূতে গুরুদর্শন

একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জগতের সকলকে তোমার গুরু কর, অর্থাৎ সর্ব্বভূতে গুরুদর্শন কর। সকলের সাথে এমন আচরণ কর, যেন তাঁরা প্রত্যেকে তোমার নিকটে একটী না একটী শিক্ষণীয় তত্ত্বের আবরণ উন্মোচন করেন। কারো বাক্যে, কারো ব্যবহারে তোমার শ্রবণ মনন ভগবৎ-প্রেমরসে উদ্দীপিত হোক্। সকলের কাছেই আমাদের শিখবার আছে, কারণ সকলের ভিতরেই নিত্যগুরু অধিষ্ঠিত রয়েছেন। কিন্তু কারো কাছেই আমরা কিছুই শিখ্‌তে পারি না বা কিছুই শিখ্‌বার মত পাই না; কারণ, আমরা কারো ভিতরেই নিত্যগুরুর অবস্থিতি লক্ষ্য করার জন্য দৃষ্টি-পরিচালনা করি না। বিনীত ভাবে প্রেমময় নয়নে আমরা কারো পানে তাকাই না। তাকাই উদ্ধত অহমিকা নিয়ে। তাকাই প্রাণ ভরা অহঙ্কার নিয়ে,— নিজে কত মহৎ, নিজে কত শ্রেষ্ঠ সেই দাম্ভিকতা নিয়ে। চিত্ত বিনীত হ'লে ভগবান্ প্রত্যেকটী আধারের ভিতর দিয়ে তাঁর জ্ঞানদাতা মঙ্গলময় রূপটী নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন।

নামের অচঞ্চল প্রদীপ জ্বালাও

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সন্ধ্যাকালে ঘরে ঘরেই প্রদীপ জ্বলে। এ দৃশ্য প্রত্যহ আমরা কে না দেখ্‌ছি! কিন্তু অন্তর-ভরা অমাবস্যার জমাটবাঁধা অন্ধকার গভীর নিশীথের বিভীষিকারাশি সৃষ্টি কচ্ছে, তার দিকে লক্ষ্য

দিচ্ছি কই ? "জ্বাল দীপশিখা নগরে নগরে, তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।" বাইরে প্রদীপ জ্বেলে কি হবে ? সে প্রদীপ ত' কিছুক্ষণ পরেই নিবে যায়। ভিতরে প্রদীপ জ্বালো। এমন প্রদীপ জ্বালো, যে প্রদীপ আর কখনো নিভে না। মোহ-তমসার নিবিড় পরাক্রম ভগবানের নামের বাতি জ্বেলে পরাহত কর। লক্ষ যুগের অন্ধকারও একটীমাত্র প্রদীপ-শিখাতেই দূর হয়। কিন্তু এমন শিখা জ্বালো, যা আর নিবে যায় না, যা কিছুতেই নিষ্প্রভ হয় না। শিখা মাত্রেই চঞ্চল, কিন্তু এমন শিখা জ্বালো, যা' অচঞ্চল, সুস্থির। নাম চালাও,—অবিরাম, অবিশ্রাম, নিরবধি। নাম চালাও, অহর্নিশ, অনুক্ষণ, অফুরন্ত।

ভক্তদের জাতিভেদ নাই

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দুই শ্রেণীর লোকের জাতিভেদ-বুদ্ধি থাকে না। এক শ্রেণীর লোক হচ্ছেন ভক্ত, আর এক শ্রেণীর লোক হচ্ছে লম্পট। লম্পট পুরুষের দৃষ্টি যে রমণীর উপরে যায়, তার মাঝেই নিজের ভোগের বস্তু খুঁজে বেড়ায়, ব্রাহ্মণের মেয়ে আর চণ্ডালের মেয়েতে তার ভেদজ্ঞান থাকে না, সুস্থ লাবণ্যবতী আর রুগ্ন কঙ্কালমূর্ত্তি এ দুয়ের ভিতরে পার্থক্য করার তার ক্ষমতা থাকে না, গৌরবর্ণা না কৃষ্ণাঙ্গী তার বিচার থাকে না, একবার চ'খে পড়লেই হ'ল, মন তারই পিছনে পিছনে ছুটে বেড়াবে। অসতী নারীর দৃষ্টি যে পুরুষের উপরে পড়ে, তাকেই সে মনে মনে কামনা করে, এখন সে স্বজাতীয়ই হোক আর বিজাতীয়ই হোক, রাজপুত্রই হোক্ আর মুচী-মেথরই হোক। লম্পট পুরুষ আর অসতী নারীর এই হাল। আবার ভক্তগণেরও তাই। স্ত্রী দেখুন আর পুরুষ দেখুন, সকলের মাঝে সেই প্রেমঘনতনু শ্রীভগবানেরই ভক্ত-দের উপস্থিতি তাঁরা লক্ষ্য করেন। স্বজাতি-বিজাতির বিচার নেই, স্বদেশ-বিদেশের বিচার নেই, দ্বিজ-শূদ্রের বিচার নেই, সকলের মাঝেই তাঁরা সেই একই পরমদয়িতের নিত্যসেবকদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন। উদ্ধারণ ঠাকুর সোণার বেনের ছেলে, প্রভু নিত্যানন্দ তাঁর হাতের পক্কান্ন খেতে কি দ্বিধাবোধ করেছিলেন ?

ঠাকুর হরিদাসকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণজ্ঞানে কি অদ্বৈত আচার্য্য পিতৃশ্রাদ্ধের পাত্র অর্পণ কত্তে কোন্ বংশে তাঁর জন্ম, সেই বিচার করেছিলেন? বরঞ্চ ভক্ত-সমাজে হরিদাসের এত সম্মান যে, তাঁকে 'যবন' হরিদাস বল্লে দস্তুরমত অপরাধ করা হ'ল ব'লে মনে করা হয়। একজন ভক্তও তাঁকে 'যবন' হরিদাস বলেন না, সবাই বলেন 'ঠাকুর' হরিদাস।

ভগবদ্ভক্তিই তোমার স্বভাব

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সমগ্র জগৎ একদিন কোটি কোটি ভক্তে পূর্ণ হ'য়ে যাবে, এটা অলস কল্পনা নয়। বরং এটাই একান্ত স্বাভাবিক। তোমাদের প্রত্যেকের প্রকৃত মূর্ত্তিটী হচ্ছে এক একজন অনুরক্ত ভক্তের, একথা তোমরা জান না ব'লেই তোমাদের এত সন্দেহ। ভগবৎ-পাদপদ্মে নিজেকে সঁপে দেওয়াই তোমার স্বভাব। কৃত্রিম শিক্ষায়, কৃত্রিমতাপূর্ণ জীবনের প্রভাবে, কৃত্রিম সভ্যতায় ও কৃত্রিম সংস্কারে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছ বলেই তোমার নিজের স্বভাবকে নিজে জানতে পাচ্ছ না। কালক্রমে তোমার স্বভাব তোমাতে ফুটে উঠ্‌বে, এতে সংশয়ের কিছু নেই। যত্ন-চেষ্টা ক'রে নিজ-ভাবকে ছেড়ে পর-ভাবকে অঙ্গীকার করেছ, তাই এত সংশয়-সন্দেহের ঘন তমিস্রা। নামকে আশ্রয় কর, নামে ডোব, নামে মজ,—নামের আলোকে নিজের স্বরূপ প্রত্যক্ষ দর্শন কত্তে পাবে।

ভগবদ্ভক্তি বনাম জড় সভ্যতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সর্ব্বজীব ভগবদ্ভক্ত হবে ব'লেই রেল উঠে যাবে, টেলিগ্রাফ উঠে যাবে, ট্রাম, মটর, ষ্টীমার উঠে যাবে, তা' নয়। জড় সভ্যতা থেমে যাবে না, বরং নিজের স্বাভাবিক পরিণতিতেই বেড়ে চল্‌বে। কিন্তু এতদিন তোমরা ছিলে এই জড় সভ্যতার দাস, তখন এই জড় সভ্যতা হবে ভক্তের দাস, ভক্তির দাস, ভগবানের দাস। এঞ্জিন-ড্রাইভার সেদিন ইঞ্জিন চালাতে চালাতেও ভগবানেরই চরণের সাথে নিজের অন্তরকে প্রেমের ডোরে বাঁধতে

চেষ্টা কর্‌বে, টেলিগ্রাফ-মাষ্টার সেদিন এক স্থানের খবর অন্যস্থানে পাঠাতে পাঠাতে সেই টরে-টক্কার মধ্য দিয়েই নিত্য-প্রেমের অনুশীলন কর্ব্বে। অর্থাৎ দেহ দেহের কর্ত্তব্য কত্তে কুণ্ঠিত হবে না, কিন্তু মন থাক্‌বে ভগবৎ-সেবার অনুগত এবং দেহ হবে সেই সেবক মনের অধীন।

সৎসঙ্গ ও ভক্তির বিকাশ

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যিনি নিয়ত ভগবৎ-সেবায় নিজেকে নিয়োজিত ক'রে রাখেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল জীবকে ভগবন্মুখ কর্ব্বার চেষ্টা করেন, তিনি শুধুই মহাপুরুষ নন, তিনি পরোপকারী মহাপুরুষ। এরূপ মহাপুরুষ পেলে খুব শ্রদ্ধাসহকারে তাঁদের সঙ্গ কর্ব্বে। সৎ-সঙ্গ থেকে মহতের সদ্‌গুণসমূহ অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হয়, তাতে ভগবদ্‌ভক্তির বিকাশ ঘটে।

নাম-সঙ্কীর্ত্তন ও পরোপকার

অপর একটী প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—উচ্চৈঃস্বরে নাম-কীর্ত্তনের দুটো দিক্ আছে। একটী হচ্ছে নিজের কুশলের দিক্, অপরটী হচ্ছে সর্ব্বজীবের কুশলের দিক্। আমি যদি মনকে একমুখ ক'রে নাম গান গাই, তাতে আমার প্রেমভক্তি বর্দ্ধিত হবে, আবার অন্যে যদি তা শোনে, তবে তারও প্রেমভক্তির সঞ্চার হবে। সুতরাং উপকার শুধু আমার একারই হ'ল না, পরোপকারও করা হ'ল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন,—"ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার, জীবন সার্থক করি' কর পরোপকার।" কেবল নিজেই হরিনাম প্রেমরসে মজ্‌বে, আর জগৎকে এর আস্বাদন দিবে না, এ মধুময় নাম শুনিয়ে জগতের কর্ণে সুধা ঢাল্‌বে না,—এটা এক প্রকারের স্বার্থপরতা। সুতরাং নাম-কীর্ত্তন এক মহাযজ্ঞ জান্‌বে। যজ্ঞে আহুতি দিতে হয় হব্য, মহাযজ্ঞে দিতে হয় আত্মাহুতি। জগতের সকল প্রাণীকে নামামৃত পরিবেশনের জন্য জীবন দান করা এক মহাপরোপকার।

প্রকৃত কীর্ত্তন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু নামের মধু ঘরে ঘরে বিলিয়ে বেড়াব ব'লেই উচ্চ চীৎকারে গলা ফাটিয়ে ফেল্‌ব, কিম্বা মৃদঙ্গের চাঁটিতে গর্ভবতী নারীর জঠরস্থ ভ্রূণকে অকালে ভূমিষ্ঠ ক'রে ছাড়্‌ব, ধাবন-কুর্দ্দনে গৃহ-প্রাঙ্গনের এক ফুট মাটি তুলে ফেল্‌ব,—এমন কোন কথা নেই। বরং যে নামে পাষাণ গলে যায়, সে নাম গাইতে হবে এমন মধুর কণ্ঠে, যেন গায়কেরও ধ্যানাবেশ আসে, শ্রোতারও ধ্যানাবেশ আসে। কীর্ত্তনের মণ্ডপকে যুদ্ধক্ষেত্রে বা মল্লভূমিতে পরিণত করার কোন মানে হয় না, কিম্বা তাকে অভিনয়ের মঞ্চেও পরিণত হ'তে দেওয়া যায় না। অভিনয় থাকবে না এক কণা, অনাবশ্যক হুড়াহুড়ি থাক্‌বে না এক রতি, কণ্ঠের বিকৃতি বা অস্বাভাবিকতা থাক্‌বে না এক চুল। যেমন কণ্ঠে নাম-কীর্ত্তন কর্‌লে নামের মাঝে স্বরের মাধুর্য্য বিনা ক্লেশে আসে এবং সেই মাধুর্য্য প্রেমের প্রগাঢ়তা বর্দ্ধন করে, তেমন মধুর, তেমন মৃদু কণ্ঠে কীর্ত্তন কর্‌বে। কীর্ত্তনের সাথে হাত নাচিয়ে পা ছড়িয়ে একটা অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি না ক'রে নামের গুণে আপনা আপনি শরীরের ভিতরে ভাবের আবেশে যেটুকু আন্দোলন আসে, মাত্র সেটুকুকেই হ'তে দেবে,—এর বেশী হ'তে গেলে সংযমের বলে চেপে রাখ্‌বে। যশোলিপ্সা, মানলিপ্সা বা প্রতিপত্তিলিপ্সাকে কীর্ত্তন-মণ্ডপে ঢুক্‌তে দেবে না। তোমার চটী জুতো জোড়াকে যেমন ক'রে তুমি মণ্ডপের বাইরে রেখে আস, প্রশংসা-লোলুপতাকেও তেম্‌নি বাইরে রেখে নম্র মন, বিনীত বুদ্ধি নিয়ে তবে কীর্ত্তন-গোষ্ঠীতে প্রবেশ কর্ব্বে। লোকে তোমার কীর্ত্তন শুনে কতই না জানি প্রশংসা কচ্ছে, এই ভাবটী মনে আসা মাত্র জান্‌বে যে, তুমি কীর্ত্তন করার অযোগ্য। মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে দেখা যেত যে, কীর্ত্তন কত্তে কত্তে হঠাৎ থেমে গেলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বল্লেন,—"আমার আরাধ্য থেকে মন স'রে বাইরে অন্য বস্তুতে যাচ্ছিল, তাই থেমে গেলাম।" তিনিই কীর্ত্তন-বীর, কীর্ত্তনকালে যাঁর মন তাঁর পরমসেব্যের চরণ ছেড়ে অন্য-

দিকে যায় না, খোলের বাজনার দিকেও না, করতালের ধ্বনির দিকেও না, শ্রোতার দিকেও না, সংসারের দিকেও না। এঁদের পবিত্র মুখে উচ্চারিত কীর্ত্তনই কীর্ত্তন-পদবাচ্য। বাকী লোকের কীর্ত্তন হচ্ছে ছুঁচোর কীর্ত্তন বা মরার কান্না। তোমরা কেউ কখনো ছুঁচোর কীর্ত্তন করো না, তোমরা কেউ কখনো মরার কান্না কেঁদ না।

কীর্ত্তন-শ্রবণকারীর কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—একদল লোক আছেন, তাঁদের মত হচ্ছে এই যে, ছুঁচোর কীর্ত্তন করাও দোষ, শোনাও দোষ। করা যে দোষ, তাতে দ্বিমত নেই কিন্তু শোনা দোষ কিনা, বিবেচ্য। তুমি যখন কীর্ত্তন কর, তখন তোমার মনটা থাকে কোথায়, তা' তুমি খেয়াল করলেই জান্তে পার। সুতরাং ছুঁচোর কীর্ত্তন থেকে বিরত থাকা সহজ। কিন্তু অপরে যখন কীর্ত্তন করেন, তখন তাঁর মন কোথায় থাকে, তা তোমার জানা সহজে সম্ভব নয়। তাঁর মুখ থেকে যে নামের ধ্বনি বহির্গত হচ্ছে, তাকে অনিত্য শব্দ মাত্র মনে না ক'রে ভগবানের নিত্য নাম জ্ঞান ক'রে যদি তুমি ঐ নাম শুন্তে শুন্তে মনকে তোমার ইষ্টে লগ্ন কর, তাহ'লে তোমার পরমলাভ। সেই পরমলাভকে পরিত্যাগ ক'রে যদি খুঁজ্তে যাও যে, নাম-সঙ্কীর্ত্তনকারীরা বহির্মুখ কিনা, প্রশংসার লোভে কীর্ত্তন কচ্ছেন কি না, অভিনয় মাত্র ক'রে যাচ্ছেন কি না, তাহ'লে তোমার পক্ষে অন্যাভিনিবেশ করা হ'ল, তোমার পরমদয়িত পরমেশ্বরের চরণে মনকে লগ্ন করা আর হয়ে উঠ্‌ল না। সময় গেল, কিন্তু বৃথা গেল। ভাল মন নিয়েই করুন আর মন্দ মন নিয়েই করুন, একদল লোক যখন কীর্ত্তন কচ্ছেন, তখন তাঁদের পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তুমি যতটুকু পার, নিজের কল্যাণই সেধে নাও না। বক্তা বা সঙ্কীর্ত্তনকারী যতই পরোপকারক হোন না কেন, শ্রোতার পক্ষে আত্মোপকারই সবচেয়ে ভাল। কার কীর্ত্তন ছুঁচোর কীর্ত্তন আর কার কীর্ত্তন মরার কান্না, এই আলোচনা কীর্ত্তন-শ্রবণকারীর মনে থাকা ভাল নয়।

জীবন্মৃত্যু ও নিত্য-জীবন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এ জগতে মরার কান্নাই অধিকাংশে কাঁদে, জীবিতের কান্না কাঁদেন কয় জনে? তুমি দিবারাত্র শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ আর ত্যাগ কর ব'লেই কি তুমি জীবিত? তোমার কয়টী শ্বাসে আর কয়টী প্রশ্বাসে, প্রাণেরও প্রাণ যে ভগবান্, তাঁর নাম ধ্বনিত হয়? তোমার শ্বাস প্রশ্বাস যে প্রাণনাথহীন, সুতরাং প্রাণহীন। দিবারাত্রি তোমার হৃৎস্পন্দন চলেছে ব'লেই কি তুমি জীবিত? তোমার হৃদয়ের কয়টী স্পন্দনে, হৃদয়রঞ্জন যে ভগবান্, তাঁর নাম ধ্বনিত হয়? তোমার হৃদয়-স্পন্দন হৃদয়নাথহীন, অতএব হৃদয়হীন। বেঁচেও তুমি মরা, কারণ যিনি জীবনের সর্ব্বস্ব, তাঁর সাথে তোমার সম্বন্ধ-স্থাপন করনি। কি ভাবে তাঁর সাথে তোমার নিত্য-সম্বন্ধটী স্থাপিত হবে, তার খোঁজ আগে কর। তাহ'লেই নিত্যজীবন পাবে।

ধর্ম্ম-জীবনের গোড়া বাঁধ

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—একথা মনে ক'রো না যে, বাণপ্রস্থ অবলম্বন ক'রে তারপরে লোকের ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হবে। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার আগে শুধুই অধর্ম্ম আর অপধর্ম্মের সেবা করব, আর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়বার পরেই মহাধার্ম্মিক হয়ে পড়্ব—এ' কোনো কাজের কথাই নয়। জন্মমাত্র যে আতুর ঘরের প্রদীপ জ্বলে, তার শিখার সাথে সাথে ধর্ম্মের শিখা জ্বালা প্রয়োজন। পারিবারিক উপাসনা-মন্দিরই তোমাদের প্রথম তপস্যার স্থান হওয়া প্রয়োজন। সর্ব্বজনীন মন্দিরে যাও, বনে যাও বা তীর্থে যাও, সে ত' অনেক পরের কথা। পারিবারিক জীবনই ধর্ম্মজীবনের গোড়া। ধর্ম্মজীবনের গোড়াকে আগে বাঁধ। ঘরে ব'সেই কে ভগবান্‌কে কতখানি ডাক্‌তে পার, তার চূড়ান্ত একবার দেখে নাও। গৃহে ব'সে সাধন করে না, অথচ বাইরে ছুটে যাবার জন্য মন উচাটন হয়, এমন লোকেরা এক সংসার ছেড়ে পুনরায় নূতন সংসার গড়ে মাত্র। জগতের পবিত্রতম মন্দির তোমার সূতিকাগৃহ, জগতের পবিত্রতম তীর্থ তোমার

জন্মভূমি, জগতের প্রশস্ততম তপঃক্ষেত্র তোমার গৃহ। এখানে যে যতটুকু পার, আগে তপস্যা ক'রে নাও। এখানে ব'সে যে যতটুকু পার, ভগবৎ-প্রেমের অনুশীলন ক'রে দেখ। তারপরে এরই ফলে, হয় বিষয় থেকে বিষ চ'লে যাবে, সংসার অমৃতের সাগর হবে নতুবা সংসার আপনি তোমাকে ছেড়ে পালাবে, জীবন সম্পূর্ণ-রূপে ভগবানের হবে। গাছের গোড়ায় জল ঢালো, শাখা, পত্র, পুষ্প, ফল আপন স্বভাবে বিকশিত হবে।

ধর্ম্মহীন মানব অসম্ভব

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মৃত্তিকার রস ছাড়া যেমন গাছ বাঁচে না, ধর্ম্ম ছাড়া তেমন মানুষ বাঁচে না। বাইরে যিনি যতই নাস্তি-কতা প্রদর্শন করুন, কোনও না কোনও ধর্ম্মকে আশ্রয় ক'রে নেই, এমন মানব পাবে না। একদল লোক ব'লে থাকেন,—"আমরা ধর্ম্ম মানি না।" কিন্তু তাঁদের অবস্থা কেমন জান? যেমন অর্কিড্। একখানা শুষ্ক কাঠে বেঁধে বারান্দায় ঝুলিয়ে রেখেছ, এককণা মাটীর সঙ্গে সংশ্রব নেই, তবু বেঁচে আছে। শিশুরা দেখে যে, তারা কোনো রসই পায় না বা নেয় না, বিনা রসেই বেঁচে রয়েছে, বিনা রসেই তাদের পাতা গজাচ্ছে, বিনা রসেই শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে, বিনা রসেই নয়নানন্দবর্দ্ধক ফুলের ছড়া বেরুচ্ছে, কত তাদের বর্ণ-বৈচিত্র্য, কত তাদের সৌন্দর্য্য। কিন্তু অভিজ্ঞেরা জানেন যে, অর্কিড্ শূন্যে ঝুলে থাক্‌লে কি হয়, ঐ শূন্য থেকেই অতি গোপনে সকলের অজ্ঞাতে সে রস আহরণ কচ্ছে। তোমরা যাদের নাস্তিক ব'লে থাক, তাদের অবস্থাও সেই রকম। তাঁরা হয়ত নয়নগ্রাহ্য আধার থেকে তৃপ্তিময় খাদ্য-আহরণ করেন না, কিন্তু নয়নাতীত আধার থেকে ঠিক পেটটি ভ'রেই খাচ্ছেন। ধর্ম্মহীন মানব হ'তেই পারে না।

কলিকাতা,

৮ই আষাঢ়, ১৩৩৬

অদ্য উপদেশ-প্রার্থীদের ভিড় কল্য অপেক্ষা অধিক। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—

এক এক ক'রে প্রত্যেকে নিজ নিজ জিজ্ঞাস্য বিষয় প্রশ্নের আকারে লিখে দাও। তারপরে আমি যার প্রশ্নের যেমন পারি, উত্তর দিব।

একমাত্র পরমপ্রভুই দর্শনীয়

প্রায় সকলেই তদ্রূপ করিলেন। দুটী ছেলে কোনও প্রশ্ন লিখিলেন না।

শ্রীশ্রীবাবা জিজ্ঞাসা করিলেন,— কি হে, তোমাদের খবর কি?

যুবকেরা জানাইলেন যে, তাঁহারা কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বা উত্তর পাইতে আসেন নাই, এমন কি কোনও উপদেশ শোনাও তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে,— তাহারা শুধু দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবা প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—ঠিক্ বাবা, তোমরাই বাহাদুর। কথা বলা আর কথা শোনা দুটাই ঝকমারি। দেখে যাও, জগৎ দেখে যাও। প্রাণ ভ'রে আর মন ভ'রে দেখ, আর লক্ষ্য কর সব দৃশ্যমান পদার্থের ভিতরে কেমন করে তোমার চিরারাধ্য প্রভু বিরাজ কচ্ছেন। ত্রি-জগতে দর্শনীয় শুধু ঐ একজন। তাঁকে দেখে ধন্য হও।

সংরক্ষণ ও সংস্কার

অতঃপর প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হইল। একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সংরক্ষণশীলতা ও সংস্কারপ্রিয়তা এই দুটোই সমাজ-রক্ষার জন্য প্রয়োজন। চিরন্তন সত্য থেকে যাতে না ভ্রষ্ট হ'য়ে পড়ি, তার জন্য প্রয়োজন অটল সংরক্ষণশীলতা। আবার সত্যকে উপলক্ষ্য ক'রে বহু অসত্য সমাজের জীবনে প্রবেশ ক'রে থাকে এবং নিজের প্রাচীনত্বের দাবীকেই প্রকৃত সত্যের দাবী ব'লে প্রতিষ্ঠিত রাখ্‌তে চেষ্টা করে। সেই সব অসত্যকে ঝেঁটিয়ে বিদায় দেবার জন্য চাই সাহসে দুর্জ্জয় সংস্কারপ্রিয়তা। সংরক্ষণের মূল হচ্ছে নিষ্ঠা, সংস্কারের মূল হচ্ছে বিচার। প্রকৃত সত্য কখনো বিচারকে ভয় করে না, কারণ সীতার মত সতী অগ্নিপরীক্ষায় সব সময়েই উত্তীর্ণা হ'তে সমর্থা। প্রকৃত বিচার কখনো নিষ্ঠাকে দূষ্য ব'লে জ্ঞান করে না, কারণ চার্ব্বাকের মত নাস্তিক্যতাবাদীও নিশ্চয় সীতাকে অশ্রদ্ধা কত্তে

সাহস পাবেন না। এই যুগেই দেখ না কেন, কত কত যুক্তিবাদী তার্কিকের আবির্ভাব হ'ল, কিন্তু সীতা-চরিত্রের অপূর্ব্ব নিষ্ঠার দিক্‌কে কেউ মূর্খতা, গ্রাম্যতা বা কুসংস্কার ব'লে গালি দিতে পেরেছেন? সংস্কার এবং সংরক্ষণ পরস্পর পরস্পরের প্রতিপোষক, একে অন্যের বিরোধী নয়। একটা ইমারত গড়্‌লে তাতে চূণ-বালীর পলস্তারা দিতে হয়। দু'চার বছর পরে পরে পুরাতন পলস্তারা ধ্বসিয়ে দিয়ে নূতন পলস্তারা বসাতে হয়। এরই নাম সংস্কার। কিন্তু পলস্তারা বদল কত্তে হবে ব'লে কেউ আবার সমগ্র ইমারত ভেঙ্গে ফেলে তাকে নূতন ক'রে গড়্‌তে যায় না। সমগ্র ইমারত ভেঙ্গে ফেলা কখনো বা অসম্ভব, কখনো বা অলাভজনক। এরই নাম সংরক্ষণ। তোমার দেহমধ্যে প্রতিক্ষণে নূতন নূতন অনু-পরমাণুর সৃষ্টি হচ্ছে এবং বহু পুরাতন অনুপরমাণুর ধ্বংস হচ্ছে। সেই সব ধ্বংসপ্রাপ্ত অনুপরমাণুকে মলরূপে, মূত্ররূপে, কফরূপে, থুথুরূপে, ঘর্ম্মরূপে, পিছুটীরূপে, কর্ণমল-রূপে, ক্লেদরূপে পরিত্যাগ ক'রে দিচ্ছ এবং এই ক্লেদাদির রাজত্ব যাতে কায়েম হয়ে না যায়, তার জন্য স্নান, ধাবন, ঘর্ষণ, মার্জ্জন প্রভৃতি কত কি কচ্ছ। এরই নাম সংস্কার। কিন্তু শরীরকে রোগবর্জ্জিত, অস্বাস্থ্য-বর্জ্জিত ও ক্লেদবর্জ্জিত করবার উদ্দেশ্যে কেউ কখনো হৃৎপিণ্ডটাকে কেটে বের ক'রে দেয় না, বা মস্তিষ্কটাকে কেটেও দূরে ফেলে দেয় না। নিতান্ত ঠেক্‌লে মানুষ শরীরের বড় জোড় একটা গ্রন্থি কেটে ফেলে দেয়, বা চক্ষু উৎপাটন করে, বা হাত কাটে, পা কাটে। কিন্তু হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক বা মেরুদণ্ডের উপরে কোনো জুলুম বরদাস্ত করে না। কারণ, এ'দুটো গেলে অন্যগুলির থাকার কোনো মানে হয় না। এরই নাম সংরক্ষণ।

সংরক্ষণপন্থী ও সংস্কারপন্থীর বিরোধের কারণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—Reform আর Conservation যে পরস্পর বিরোধী, এরূপ মনে করার কারণ হচ্ছে অসম্যগ্‌দর্শন বা অস্পষ্ট দর্শন। সমাজ-সংস্কারপন্থীরা সংস্কারের নেশায় প্রমত্ত হ'য়ে মনে করেন যে, সংরক্ষণপন্থীদের যুক্তির ভিতরে কোনো সারবস্তু আছে কিনা, তা' বিচার করার আমার সময় কই? সমাজ-সংরক্ষণপন্থীরা সংরক্ষণের মোহে মুগ্ধ হ'য়ে মনে করেন যে,

সংস্কারপন্থীরা জানেই বা কি বোঝেই বা কি, সুতরাং তাদের কথায় কর্ণপাত করার প্রয়োজন নেই। বিরোধের কারণ এইখানে। সংস্কারপন্থীরা মনে করেন যে, সংরক্ষণপন্থীরা যত ভালো ভালো যুক্তিই প্রদর্শন করুন, তাঁদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেদের সনাতন স্বার্থকে রক্ষা করা মাত্র, সুতরাং যুক্তিগুলি অর্থহীন। সংরক্ষণপন্থীরা মনে করেন যে, সংস্কারপন্থীরা যত ভালো ভালো যুক্তিই প্রদর্শন করুন, তাঁদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে উচ্ছৃঙ্খলতাকে আমদানী করা, সমাজের কুশল সাধন শুধু একটী কথার কথা মাত্র। সংস্কারপন্থীরা ভাবেন যে, কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানকে কিছুতেই নষ্ট হ'তে দিব না ব'লে সংরক্ষণ-পন্থার যে দারুণ জেদ, তার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ একটা ব্যাপার উপলক্ষ ক'রেই তাঁরা সমাজের উপরে সর্ব্ববিষয়ে নিজেদের প্রভুত্বকে চিরস্থায়ী ক'রে রাখ্‌তে মতলব এঁটেছেন। সংরক্ষণপন্থীরা ভাবেন যে, কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যাপারে সংস্কারপন্থীরা যে কতকটা পরিবর্ত্তন আন্‌তে চাচ্ছেন, তার পশ্চাতে আসল উদ্দেশ্য রয়েছে সব কিছু ভেঙ্গে চুরে একেবারে নান্দীভস্ম ক'রে দেওয়া। এভাবে একদল যে অপর দলকে অবিশ্বাস করেন, একদল যে অপর দলের অভিপ্রায়ের সত্যতায় সন্দেহ পোষণ করেন, তাই হচ্ছে উভয়পক্ষের মধ্যে শোচনীয় বিরোধের কারণ।

প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দেখ, এই বিরোধ কোনো কোনো স্থানে এমন মারাত্মক আকার ধারণ করে যে, "সঞ্জীবনী" ব্রাহ্মদের পত্রিকা ব'লে অনেক বামুন পণ্ডিত স্পর্শ পর্য্যন্ত করেন না, "বঙ্গবাসী" সনাতনীদের কাগজ ব'লে ব্রাহ্মের ছেলেরা তার নামোচ্চারণ পর্য্যন্ত করেন না। কিন্তু এ বিরোধ ভাল জিনিষ নয়। এ'কে দূর কত্তে হবে। বিরোধ দূর কত্তে হ'লে প্রথমে চাই এমন একটা মনোভঙ্গী নিজের মধ্যে জন্মান, যাতে, অন্য কেউ কোনো কথা বল্‌লে তা' সদুদ্দেশ্যেই বল্‌ছেন, একথা বিশ্বাস করা যায়। লোকে অসদুদ্দেশ্যেই সব কথা বলে, এ রকম ভাবা একটা সাংঘাতিক সঙ্কীর্ণতা। যিনি সংস্কার-পন্থী, তাঁর ত' মনে এ রকম সঙ্কীর্ণতা থাকা মোটেই উচিত নয়, যিনি সংরক্ষণ-পন্থী, তাঁরও পক্ষে নয়। প্রতিপক্ষ যে সদুদ্দেশ্যেই

যুক্তি প্রয়োগ কচ্ছেন, এতটুকু সম্মানসূচক ভাব তাঁর প্রতি থাকা আবশ্যক। প্রতিপক্ষের যুক্তিগুলি প্রিয়ই হোক, কি অপ্রিয়ই হোক, গ্রহণীয়ই হোক কি গ্রহণের অযোগ্যই হোক্, তিনি যে মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে, মুখে এক কথা আর মনে আর এক ভাব নিয়ে, কপটতা নিয়ে যুক্তি বিস্তার কচ্ছেন না, একথা বিশ্বাস কত্তে পারার মত মনের গতিটী হওয়া প্রয়োজন। যেহেতু একজন আমার মতের বিরোধী, সেই হেতুই তিনি উদ্দেশ্য-গোপনকারী অসরল, এরূপ ধারণা করবার যে বহুকাল্‌কার অভ্যাস রয়েছে, সেইটী সর্ব্বাগ্রে পরিত্যাগ কত্তে হবে।

প্রতিপক্ষের বাক্য ভদ্রভাবে শ্রবণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তারপরে প্রয়োজন, একের কথা অপরের শোন্‌বার অভ্যাসটী সঞ্চয় করা। যতক্ষণ তুমি যুক্তি দিয়ে কথা বল্‌ছ, ততক্ষণ আমি শুন্‌ব। তোমার যুক্তি যদি আমার পক্ষে অকাট্য হয়, অখণ্ডণীয় হয়, কিন্তু আমার মনঃপূত না হয়, তবু আমি শুন্‌ব। তোমার যুক্তি শুনে যদি আপাততঃ আমাকে নিরুত্তর হ'য়েও যেতে হয়, তবু আমি শুন্‌ব এবং তোমার যুক্তিতে যদি মনকে না মানাতে পারি, তাহ'লে প্রতিবাদ কত্তে হয় পরে করব, কিন্তু তোমার কথার মাঝখানে হট্টগোল কর্‌ব না। কাশীতে এলেন আর্য্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ তাঁর সংস্কারপন্থী মতবাদ নিয়ে। কাশীর সনাতনী পণ্ডিতবর্গ আলোচনার মাঝখানে হৈ চৈ ক'রে সবাই মিলে ব'লে উঠ্‌লেন,—"দয়ানন্দ হেরে গেছে, দয়ানন্দ হেরে গেছে।" এরূপ মনোভঙ্গী নিয়ে আমি তোমার কথা শুন্‌ব না। তোমার মতকে পরাস্ত করাই আমার উদ্দেশ্য হবে না, পরন্তু তোমার মতামতে সত্যাসত্য কতটুকু কি আছে, তা বু'ঝে নেবার জন্যই তোমার কথা শুন্‌ব। মনে কর, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর মত সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় দানবীর এক ঋষিতুল্য ব্যক্তির নেতৃত্বে কোথাও নিজেদের মতামত ব্যক্ত করার জন্য সনাতনপন্থীদের একটা সভা হচ্ছে *। এর

* দুঃখের বিষয়, পরবর্ত্তী সময়ে ঠিক এইরূপ একটী ঘটনা কলিকাতা টাউনহলে ঘটিয়াছিল এবং এই উচ্ছৃঙ্খল আচরণে ভারতের এক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন অতি বিখ্যাত মণীষী ব্যক্তি নেতৃত্ব করিয়াছিলেন।

মধ্যে তুমি বা আমি কতকগুলি উদ্ধত যুবক নিয়ে গিয়ে সভাপতিকে সরিয়ে দিলাম মঞ্চ থেকে আর টেবিলের উপরে দাঁড়িয়ে তাণ্ডব নৃত্য সুরু কর্লাম। কোনো জ্ঞানী ব্যক্তির মাথায় লাগ্‌ল চোট, কোনো মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের হাতের কব্জি গেল ভেঙ্গে, নিভৃত পর্ণকুটীরবাসী কোনো বহুজনপূজ্য তপস্বী পুরুষের কেটে গেল ঠোঁট বা নাক। এ রকম অনার্য্য স্বভাব ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ নিয়ে আমি প্রতিপক্ষের বক্তব্য শুন্‌ব না, শুন্‌ব ভদ্র ও অমায়িক শ্রোতার মতন।

প্রতিপক্ষের যুক্তি ভদ্রভাবে খণ্ডন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শুধু শোন্‌বার কালেই আমি ভদ্র ও অমায়িক হব, আর বল্‌বার কালে ভদ্রতাজ্ঞান ও অমায়িকতাকে আবর্জ্জনা-স্তূপে নিক্ষেপ ক'রে ইতর ও বর্ব্বর হব, তাও নয়। শুনেছি যেমন ভদ্রভাবে, শুনাবও তেমন ভদ্রভাবে। তোমার অযৌক্তিকতার প্রতিবাদ যুক্তি দিয়েই কর্ব্ব, তোমার পারিবারিক কোনও গুপ্ত কলঙ্ক উদ্ঘাটন করা আমার কাজ হবে না, কিম্বা তোমার ব্যক্তিগত চরিত্রের কোনও অবাঞ্ছনীয় দিকের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্ব্বারও আমার রুচি হবে না। তুমি বল্‌ছ, সূর্য্য পশ্চিম দিকে উদিত হয়, এর প্রতিবাদে আমি বল্‌ব এবং প্রমাণ দেখাব যে, সূর্য্য পূর্ব্ব ছাড়া আর কোনও দিকে উদিত হয় নাই, হয় না, হবে না। কিন্তু তুমি সমগ্র রাত নেশা ক'রে বৃথা জাগরণ ক'রে প্রমত্ত-মস্তিষ্ক নিয়ে এসেই যে এ প্রলাপ বক্‌ছ, তা' সত্য হ'লেও আমি তৎসম্পর্কে বাঙ্‌নিষ্পত্তি কর্ব্ব না। তোমার ব্যক্তিগত চরিত্র তোমার নিজের দায়, তোমার পারিবারিক কলঙ্ক তোমার নিজের লজ্জা; তোমার পুত্রকন্যা যদি লোকলজ্জাকর কুকার্য্য ক'রে থাকে, তবে তার সাথে আমার যুক্তির কোনো সম্পর্ক নেই! কোনও কলঙ্ক-জনক ব্যাপারের দরুণে যদি লোকের মধ্যে তোমার সম্মানের ক্ষতি হয়ে থাকে, তবে লোকেরাই তা নিয়ে মাথা ঘামাক। আমার সত্য-নির্ণয় ও সত্য-প্রচারের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক দেখি না।

দলপতির প্রতি অন্ধ আনুগত্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সংস্কার ও সংরক্ষণ ব্যাপার নিয়ে যে এত মনান্তর, তার প্রধান কারণই হ'ল এই যে, যেভাবে সংস্কার করা দরকার, তাও আমরা করি না, যেভাবে সংরক্ষণ করা দরকার, তাও আমরা করি না। মতবাদের প্রচার অধিকাংশ সময়েই ব্যক্তিগত কুৎসা প্রচারেই পর্য্যবসিত হয়। যেহেতু বিধবা-বিবাহ আমি পছন্দ করি না, সেই হেতু চেষ্টা স্থরু করি যে, প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত বজ্রপুরুষের জীবনেও কোনো ভুল-ভ্রান্তি ত্রুটি-বিচ্যুতি খুঁজে বের কত্তে পারি কি না। যুক্তি শেষ পর্য্যন্ত গিয়ে ব্যক্তিকে আশ্রয় করে। যুক্তি হবে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ। যুক্তির লক্ষ্য হবে সমাজের হিত। আমরা অধিকাংশ সময়ে আবার নিজের বিবেককে ব্যক্তি-বিশেষের কাছে বিক্রয়ও করি। যেহেতু, আমাদের দলের নেতা মনে করেন যে, অসবর্ণ বিবাহ ভালো জিনিষ নয়, আমরা শুধু সেই জন্যই এর বিরোধিতা কর্‌ব। কিন্তু অসবর্ণ বিবাহের ফলই যে, পৃথিবীকে একবিংশবার স্বেচ্ছাচারী ক্ষত্রিয়ের অত্যাচার থেকে রক্ষাকারী পরশুরাম, একথা কানে তুল্‌তে চাই না। যেহেতু আমাদের দলের নেতা মনে করেন যে, সগোত্রে বিবাহ হ'লে কোনো দোষ হয় না, মুসলমানদের হচ্ছে, খ্রীষ্টানদের হচ্ছে,—সেই হেতু আমিও মনে কর্‌ব যে, সগোত্রে বিবাহ প্রচলিত হওয়াই উচিত, খুড়্‌তুত বোন্‌কে, জ্যেঠতুত বোন্‌কে বিয়ে করা চাইই চাই। কিন্তু এখন যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই বল্‌ছেন যে, নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহের ফলে জগতে দুর্ব্বলচেতা ও উন্মাদ-রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা-বৃদ্ধি ঘট্‌ছে, আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও সেদিকে দৃষ্টি-পাত কর্‌ব না। দলপতির প্রতি এই যে অন্ধ আনুগত্য, এর ফলেও সংস্কারপন্থী আর সংরক্ষণপন্থীদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের বিশেষ বাধা হচ্ছে। একদলের প্রচার-সভায় আর একদল যখন লাঠি-সোটা নিয়ে হামলা দেয়, তখন কি সবাই নিজ নিজ বিবেক সঙ্গে নিয়ে যায়? বিবেককে তারা দলপতির বাড়ীতে পা-পোষের তলায় লুকিয়ে রেখে তবে অন্যের সভা ভাঙ্গতে আসে।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও ইংরেজিনবীশের সহযোগ চাই

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু তোমাদের এই দুর্গত দেশের দুর্ভাগ্য দূর কত্তে হ'লে সংস্কারক ও রক্ষণশীল এই উভয় শ্রেণীর চিন্তাশীল লোকদের পূর্ণ সহযোগ চাই, উভয় শ্রেণীভুক্ত কর্ম্মী লোকদের সমবেত সেবা চাই। বিলাত-ফেরতা ইংরিজিয়ানার অন্ধ স্তাবক আর পল্লীর সঙ্কীর্ণ পরিবেশে লালিত-পালিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, উভয়েরই একত্র মিলিত হ'য়ে সমাজ-সমস্যার সমাধানে ব্রতী হ'তে হবে। সংস্কার-মুক্তি দৃষ্টি নিয়ে প্রত্যেককে প্রত্যেকটী সমস্যা পরীক্ষা কত্তে হবে। ইংরিজি-নবীশকে টেমস্ নদীর জলকল্লোল ভুল্‌তে হবে, গ্রাম্য ব্রাহ্মণকে রঘুনন্দনের স্মৃতির বচনও ভুল্‌তে হবে। পূর্ণ সত্যের প্রতি অনুরাগ এবং সত্যকে হৃদয়ে ধারণ কর্ব্বার বলিষ্ঠ সাহসিকতা নিয়ে দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থা ও তার প্রতিকারের পন্থা দুজনেরই সমযত্নে বে'র ক'রে নিতে হবে। একজন ইংরিজি পড়েন নি ব'লেই উপেক্ষার পাত্র নন, অপর জন ইংরিজি পড়েছেন ব'লেই ঘৃণার পাত্র নন।

ধর্ম্মের নামে কলহ

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ধর্ম্ম নিয়ে কলহ করার মত মূর্খতা আর কিছু নেই বাছা। ধর্ম্ম তোমাকে ধীরতা দেবে, স্থিরতা দেবে, সহিষ্ণুতা দেবে, পরদুঃখে সহানুভূতি দেবে, সর্ব্বজীবের সর্ব্ব আচরণের ভিতরে ভগবানের মহিমাকে, তাঁর কৃপাকে প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা দেবে। এই হ'ল ধর্ম্মের বিশেষত্ব। কিন্তু একবার কলহে যদি অবতীর্ণ হও, তাহ'লে দেখ্‌বে, ধৈর্য্য স্থৈর্য্য সহিষ্ণুতা নিমেষে অন্তর্হিত হবে, হৃদয়ের নির্ম্মৎসর দেবভাব উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন কর্ব্বে, নিজের জেদ রক্ষা করার প্রবৃত্তি তোমাকে অপরের মনোভাবের প্রতি, অপরের মনঃকষ্টের প্রতি, অপরের অপমান, অসম্মান, অমর্য্যাদার প্রতি উদাসীন কর্ব্বে এবং তোমার নিজের দলের লোক ছাড়া জগতের অন্য সকলের মধ্যে তুমি অবিরাম শয়তানের খেলা, শয়তানের প্রভুত্ব ও পৈশাচিক নীচতা প্রত্যক্ষ কত্তে থাকবে। এই হ'ল কলহের বৈশিষ্ট্য। কলহে যে নামে, সে হিতাহিত জ্ঞান ভুলে যায়,

ভদ্রতাজ্ঞান তার লোপ পায়, সে কি মানুষ না পশু, সেই বিচারের অবসর এবং রুচি পর্য্যন্ত হারায়। ফলে, যদিও ধর্ম্মের নামেই কলহটির উৎপত্তি হয়েছে, কিন্তু কলহকারীদিগকে অধার্ম্মিক ক'রে তবে ছাড়ে। ফুৎকারের মুখে ঘৃতের প্রদীপ টেকে কি? কলহের মুখেও সত্য, সততা, সরলতা ও হিতাহিত বিবেচনা টেকে না। জলস্রোতের মুখে পুষ্পকোরক টিকে কি? কলহের মুখেও সদাশয়, স্বচ্ছন্দ, স্বতঃস্ফূর্ত্ত দেবভাব টিকে না। বরং ঝঞ্ঝাবায়ুর মুখে দাবানলের অবস্থা যেমন, শত্রু-মিত্র সবাইকে যেমন সে দগ্ধ ক'রে মারে, ধর্ম্মের নামে কলহের অবস্থাও তেমন। সে প্রতিপক্ষকে দগ্ধ করে কিন্তু স্বপক্ষকে নিরাপদ রাখে না, শত্রুকে বিপন্ন করে কিন্তু মিত্রকেও রক্ষা করে না।

কলহের কারণ ও তাহার প্রতিকার

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আত্মানাত্ম-বিচারের অভাবই কলহের কারণ। কোন্‌টী নিত্য, আর কোন্‌টী অনিত্য এই বিষয়ে সত্য-নিরূপণের যার চেষ্টা নেই, সেই সামান্য কারণে বা অকারণে কলহে প্রমত্ত হয়। জগতে একদল লোক আছে, কলহ ছাড়া যারা ভাল থাকে না, কলহ ছাড়া যাদের আহারীয় জীর্ণ হয় না, একটা কলহ না বাঁধলে শরীরে যারা তাগদ পায় না। শান্তিময় জীবন এদের অসহ। মাতৃরক্তে আর পিতৃবীজেই এরা এমন উপাদান নিয়ে এসেছে যে, কলহ এদের স্বভাব-ধর্ম্ম, শান্তভাব এদের পরধর্ম্ম। সমাজকে কলহজনিত আপদ থেকে রক্ষা করার জন্য এসব লোককে সৈনিক বিভাগে ঢুকিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাবার ব্যবস্থা করা দরকার। স্বাধীন দেশগুলিতে দেশরক্ষা-বিভাগে এই শ্রেণীর লোকেরা আবদ্ধ থাকে ব'লেও সে সব দেশে ধর্ম্ম নিয়ে কলহ করার দৃষ্টান্ত খুব কম। জগতে আর এক দল লোক আছে, কলহ যাদের স্বভাব-ধর্ম্ম নয়, কলহ-প্রবৃত্তি নিয়েই যারা জন্মেনি, কিন্তু কতকগুলি স্বার্থবান্‌ ও বুদ্ধিমান কুলোকের প্ররোচনায় এরা হঠাৎ প্রেতগ্রস্তের মত ক্ষেপে উঠে এবং যে কাজের জন্য এক সপ্তাহ পরেই গভীর অনুশোচনায় দগ্ধ হবে, সেই কাজই দলবদ্ধ হয়ে কত্তে সুরু করে। এদের

কলহপরায়ণতা নিবারণের উপায় হচ্ছে শান্তির সময়ে এদের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার-শক্তিকে এবং নিজের মুখে ঝাল খাবার প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোল্‌বার চেষ্টা করা। যাদের আজ তোমরা ডিনামাইটের ডিপো ব'লে মনে কচ্ছ, ধারাবাহিক শিক্ষা ও প্রচারের ফলে তাদের ভিতরে শান্ত, দান্ত, ক্ষমাশীল, প্রেমময় ও সহানুভূতিপ্রবণ শত শত সৎলোকের আবির্ভাব হবে।

শ্রীভগবানে বিশ্বাস রাখ

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শ্রীভগবানে রাখো সুগভীর বিশ্বাস। অন্তরের সকল হতাশা এতেই পলায়ন কর্ব্বে। ভগবানে যার বিশ্বাস, সে কি ক'রে নিজের ভবিষ্যৎকে অবিশ্বাস কত্তে পারে? বিশ্বাস কর, ভগবান সর্ব্বক্ষণ তোমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন, সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে অনুক্ষণ তোমাকে সাহায্য কচ্ছেন। মনে ক'রো না যে এই নিত্যসহায় পরমবান্ধব তোমাকে পরিত্যাগ করেছেন বা কখনো পরিত্যাগ কত্তে পারেন। উত্থানে তাঁকে স্মরণ কর, নিদ্রাতেও তাঁকেই স্মরণ কর। সেই সর্ব্বৈকশরণ তোমার অনন্যশরণ হউন। আর কারো উপরে তোমার আস্থা রাখবার দরকার নেই, একমাত্র তাঁতেই সমগ্র আস্থা স্থাপিত কর।

কলিকাতা,
৯ই আষাঢ়, ১৩৩৬

অদ্যকার উপদেশ-প্রার্থীরা সকলেই বিবাহিত এবং তাঁহাদের সহিত তাঁহাদেরই প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি আলোচিত হইবে বলিয়া অবিবাহিত যুবকদিগকে আজ আসিতে বারণ করা হইয়াছে।

কটুভাষিণী স্ত্রী ও সহিষ্ণু স্বামী

একজন প্রশ্ন করিলেন,—কটুভাষিণী কোপন-স্বভাবা স্ত্রীকে নিয়ে কি কর্‌ব?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,— তাঁকে বুঝ্‌তে দেবে যে, তাঁর রুষ্ট ব্যবহারে তোমার মনে কোনও বিকারই আসে না। থাক্‌বে একেবারে ধরিত্রীর মতন সহিষ্ণু

হ'য়ে। সহিষ্ণু হওয়া আর বিজয়ী হওয়া এক কথা। স্ত্রীর রুষ্টিতে নিজেও চ'টে গিয়ে তাঁর কাছে হার মেনে যেও না।

সক্রেটিশ ও তুকারাম

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন,—সংসার বড় ভয়ানক জিনিষ বাবা। আপনি যা বল্‌ছেন, সেভাবে কেউ কখনো থাক্‌তে পারে না।

শ্রীশ্রীবাবা।—খুব পারে বাছা, খুব পারে। সক্রেটিশ পেরেছিলেন, তুকারাম পেরেছিলেন। সক্রেটিশের স্ত্রী জ্যান্থিপী ছিলেন অত্যন্ত কলহপরায়ণা। একদিন তিনি স্বামীকে যারপরনাই গাল-মন্দ কত্তে আরম্ভ কর্ল্লেন। জ্যান্থিপীর তূণীরে যতগুলি চোখা চোখা বাণ ছিল, সবই তিনি ছাড়্‌লেন। কিন্তু সক্রেটিশ নির্ব্বিকার। তারপরে যখন সক্রেটিশ ঘর থেকে বাইরে যাচ্ছেন, তখন জ্যান্থিপী তাড়াতাড়ি ছাদের উপরে উঠে—সক্রেটিশের মাথার উপর এক বালতি জল ঢেলে দিলেন। সক্রেটিশ তখন হেসে বল্লেন,—"এত গর্জ্জনের পরে বর্ষণ আর আশ্চর্য্য কি?" তুকারামের কাহিনী আরও চমৎকার। হাটে যাচ্ছেন, ইক্ষু বিক্রয় কত্তে, ছোট ছোট ছেলেরা ধর্‌লে, তারা আখ খাবে। তুকারাম সাধু মানুষ, ছেলেদের আব্‌দারে তাঁর প্রাণ গলে গেল, তিনি এক একজনকে এক একখানা ক'রে আখ দিলেন। সর্ব্বশেষ আখখানা রাখলেন তাঁর স্ত্রীর জন্য। পথেই সব আখ ফুরিয়ে গেল, হাটে আর যাওয়া হ'ল না, শেষ আখখানা নিয়ে তিনি ঘরে ফিরে এলেন। স্ত্রী বল্লেন,—"এত শীগ্‌গীর ফিরে এলে যে?" তুকারাম সব ঘটনা বল্লেন। আর যায় কোথা, তৎক্ষণাৎ স্ত্রী তার স্বামীর হাত থেকে ইক্ষুদণ্ডখানা কেড়ে নিয়ে, স্বামীর পিঠের উপরে তার সদ্ব্যবহার সুরু ক'রে দিলেন। প্রহারে জর্জ্জরিত হ'য়েও তুকারাম একটু সাড়াশব্দ পর্য্যন্ত কর্ল্লেন না। কিন্তু ইক্ষুর প্রহার তুকারামের পিঠে সইলেও ইক্ষুদণ্ড কিন্তু বেশীক্ষণ আর সইতে পার্‌ল না, সেখানা ভেঙ্গে দু'টুকরা হ'য়ে গেল। তখন তুকারাম হেসে বল্লেন,—"প্রিয়ে তুমি আমাকে কতই ভালবাস! আখখানা রেখেছিলাম একা তোমারই জন্যে, কিন্তু কিছুতেই তুমি ওখানাকে

একা খাবে না ব'লে বেশ দুটী টুক্‌রো ক'রে নিলে।" এর পরেও কি আর স্ত্রীর রাগ্ থাক্‌তে পারে ?

সাধারণ মানুষই তপস্যা দ্বারা অসাধারণ হয়

প্রশ্ন।—তুকারাম আর সক্রেটিশের পক্ষেই ওরকম সম্ভব, সাধারণের পক্ষে অসম্ভব।

শ্রীশ্রীবাবা।—অসম্ভব নয়, খুব সম্ভব। তুকারাম আর সক্রেটিশ সাধারণ মানুষই ছিলেন, শুধু অসামান্য তপস্যার বলে তাঁরা অসাধারণ সংযম লাভ করেছিলেন। সক্রেটিশকে দে'খে একজন জ্যোতির্বিদ বলেছিলেন,—"লোকটা কামুক, মাতাল ও মূর্খ।" সক্রেটিশের শিষ্যেরা ত' সেই কথা শুনে জ্যোতিষীকে ধ'রে মারে আর কি! সক্রেটিশ তাদের বুঝিয়ে বল্লেন,—"দেখ, জ্যোতিষী ঠিকই বলেছেন, আমার পক্ষে কামুক, মাতাল ও মূর্খ হবারই সম্ভাবনা ছিল সব চাইতে বেশী। আমি শুধু আপ্রাণ চেষ্টার বলে বেঁচে গেছি।" তোমরাও তপস্যা কর, তোমরাও ঐরূপ হ'তে পার্ব্বে। সক্রেটিশ জ্ঞানসাগরে ডুব দিয়েছিলেন, আর তুকারাম ডুব দিয়েছিলেন প্রেমসাগরে। তাই, সমুদ্রের উপরের তরঙ্গ তাদের গায়ে লাগ্‌ত না, অতল সাগরের গভীর নীচেকার স্থিরতাতেই তাঁরা দিবানিশি থাক্‌তেন। কেন তোমরা আত্ম-অবিশ্বাস কচ্ছ ? কেন তোমরা তপস্যার শক্তিতে অনাস্থাবান্ হচ্ছ ? সাধনপথে ধীরপ্রযত্নে অধ্যবসায় সহকারে কিছুদিন চ'লে দেখ, তা' হ'লেই বুঝ্‌তে পার্ব্বে, দুর্দ্দমনীয় চিত্তের আবেগকে নিমেষ-মধ্যে স্তম্ভিত করার সামর্থ্য তোমাদের প্রত্যেকেরই আছে। নিজের সামর্থ্যকে নিজে একবারটী ব্যবহার ক'রে দেখ্‌ছ না, তাই প্রতিপদে আত্ম-অবিশ্বাস কচ্ছ।

সাংসারিক অশান্তির ভিতরেও শান্তিময় পরমপ্রভুর ইঙ্গিত সংগ্রহ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আত্ম-অবিশ্বাসের মূল হচ্ছে ভগবানে অবিশ্বাস। ভগবানের মঙ্গলময় বিধানকে প্রাণ ঢেলে বিশ্বাস কর। তুমি নিজে যেচে খুঁজে এই রুষ্ট-স্বভাবা কোপপরায়ণা কলহ-প্রিয়া স্ত্রীকে বিবাহ কর নাই, ভগবানের ইচ্ছাতেই এই

মেয়েটী তোমার গৃহে এসে প্রবেশ ক'রেছে। যারা নিজেদের চ'খে দশবার ক'রে মেয়ে দে'খে তবে বিয়ে করে, এমনকি পরস্পরের সাথে পরস্পরের পরিচয় স্থাপন ক'রে দু' চার মাস কাল একে অন্যের স্বভাব, চরিত্র, রুচি, প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ ক'রে তারপরে বিয়ে করে, তারাও ঠিক্ জানে না যে, বিবাহের পরে কার প্রকৃত মূর্ত্তিটী কি ভাবে ফুটে উঠ্‌বে। সুতরাং তোমাকে মান্‌তেই হবে যে, জন্ম, মৃত্যু আর বিবাহের ব্যাপারে তোমার ইচ্ছার চেয়ে ভগবদিচ্ছাটা সুস্পষ্টতঃ প্রধান। সুতরাং বিবাহের পরে যে ঘটনাবলি ঘট্‌ছে, তার সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে ভগবদিচ্ছার অধীন হও অর্থাৎ উদ্বেগ, অশান্তি ও অস্বস্তিকর ব্যাপার যাই যখন ঘটুক, তারই মধ্য-দিয়ে ভগবানের অভিপ্রায়কে লক্ষ্য করার চেষ্টা কর। সংসারের এমন অনেক অশান্তি আছে, যার ভিতর দিয়ে শান্তিময় পরমপ্রভুর নিত্য শান্তির ইঙ্গিত্ পাওয়া যায়।

ভোগার্থী মনকে ভোগ-লিপ্সা হইতে রক্ষার উপায়

অপর একজন প্রশ্ন করিলেন,—ভোগার্থী মনকে ভোগলিপ্সা থেকে রক্ষা করার উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবানই যে ভোগের কর্ত্তা, এইটুকু মনে রাখা। জীবের ভোগ আত্মসুখার্থে, ভগবানের ভোগ জীব-সুখার্থে। তাই ভগবানের নামের দোহাই দিলে অবৈধ ভোগ-প্রার্থনা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তোমার ইন্দ্রিয়নিচয়ের অধীশ্বর তুমি নিজেকে জ্ঞান ক'রো না, তাঁকেই জানো তোমার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অধীশ্বর ও অধিষ্ঠাতা। ইন্দ্রিয় যদি সুখ চায়, সে সুখ-কামনাকে সেই অধীশ্বর বা অধিষ্ঠাতার নিকট পাঠিয়ে দিয়ে তুমি খালাস হও।

বিবাহের যোগ্য বয়স

অপর একজন প্রশ্ন করিলেন,—কত বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যে বয়সে দেহ উৎকৃষ্ট উন্নতি লাভ করেছে, সেই বয়সে। সাধারণ নিয়ম এই করা যে'তে পারে যে, চব্বিশ বছর বয়স পূর্ণ না হ'তে ছেলেরা বিয়ে কর্ব্বে না এবং ষোলো বছর পূর্ণ না হ'তে মেয়েকে বিয়ে দেওয়া হবে না।

কারণ এই দুটো বয়স এ দুজনের পক্ষে শরীরের পূর্ণ গঠনের অনুকূল। বিয়ে দু' এক বছর আগে-পরে কর্‌লে ক্ষতি হয় না, কিন্তু সকল দিক্ দিয়ে তৈরী হ'য়ে নেওয়া আগে প্রয়োজন।

সন্তান-জন্মের বয়স

প্রশ্ন।—সন্তান-সন্ততি কত বয়সে হওয়া সঙ্গত ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এ দেশের মেয়েদের পক্ষে বাইশ বছরের মধ্যেই প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন। নইলে প্রসব-দ্বারের অস্থিগুলির নমনীয়তা ক'মে যে'তে পারে এবং তাতে হয় শিশুর, নয় প্রসূতির, কিংবা দু'জনেরই জীবন বিপন্ন হ'তে পারে। যে দেশে সহরে বা গ্রামে সর্ব্বত্রই শিক্ষিতা ধাত্রীর অভাব এবং যে দেশে আধুনিকতম ব্যবস্থাসম্পন্ন প্রসূতি-আগার দু' একটি বড় সহরে ছাড়া নেই, সে দেশে পাশ্চাত্যদের অনুকরণে অনেক বয়স পর্য্যন্ত মেয়েদের নিঃসন্তান থাকা বড়ই মাতৃঘাতী রুচি। বিদূষী হ'ব ব'লে যে সব মেয়েগুলি সময়মত বিয়ে করে না, এক দিকে তারা যেমন স্বাস্থ্যহীনা হ'য়ে দেশের ভবিষ্যৎকে নষ্ট কচ্ছে, অন্য দিকে আবার প্রসব-কষ্টটা এত বেশী সময় সহ্য কত্তে বাধ্য হচ্ছে যে, অনেকের মৃত্যু তাতেও হচ্ছে। আঠার উনিশে বিয়ে হবে, একুশ বাইশে সন্তান হবে, এটা নিরাপদ ব্যবস্থা।

সন্তান-সন্ততি কম হইবার উপায়

প্রশ্ন।—সন্তান-সন্ততির সংখ্যা কম হবার উপায় কি ?

শ্রীশ্রীবাবা।—সংযমই তার উপায়। দারিদ্র্য কমাতে চাও ত' সংযমী হও। আর, সংযমী হ'তে চাও ত' ভগবানের স্মরণাপন্ন হও। সংযমের পথেই সন্তানের সংখ্যা কম্‌বে।

আগুনের কাছে ঘৃত

প্রশ্ন।—কিন্তু বিবাহিত জীবনে সংযম-সাধনা যে বড় কঠিন।

শ্রীশ্রীবাবা।—কঠিন ব'লে হাত পা ছেড়ে দিলে চল্‌বে কেন ? কঠিন হোক্,

সোজা হোক্, যাতে কল্যাণ, সেই পথেই চল্‌তে হবে। সন্তান-সংখ্যা হ্রাসের যতগুলি কৃত্রিম উপায় আবিষ্কৃত হ'য়েছে, তার একটাও মনুষ্যত্বের সম্মানবর্দ্ধক নয়। একমাত্র সংযমের দ্বারা সন্তান-সংখ্যা-হ্রাসই মনুষ্যত্ববর্দ্ধক পথ। তাই, প্রাণপণে সংযমেরই সাধনা কত্তে হবে। ভগবানের নাম কামকে সমূলে উৎপাটিত ক'রে দেয়। তখন স্বামি-পত্নী নির্ভয়ে একত্র বাস করেন, কিন্তু বিন্দুমাত্র চিত্ত-চাঞ্চল্য তাদের মধ্যে উদিত হয় না। ভগবানের নামের বলে আগুনের কাছেও ঘৃত অনায়াসে অটুট থাকে—গলে না।

নামের শক্তি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নামের যে কত শক্তি, তা' সাধন ক'রে উপলব্ধি কর। যে দেহটাকে একান্ত আকর্ষণের বস্তু জ্ঞান কচ্ছ, যে দেহটার ভিতরে স্বর্গসুখের আশা ক'রে বার বার বৃথাই আসক্ত হচ্ছ, নামের গুণে দেখবে, সেই দেহের প্রতি আকর্ষণ সেই দেহের "দেহী"র প্রতি গিয়েছে, সেই দেহ তোমাকে স্থায়ী সুখ দিতে অক্ষম হ'লেও সেই দেহের যিনি আসল মালিক, তিনি তোমার চ'খের সাম্‌নে ধরা দিচ্ছেন এবং তোমাকে নিত্য সুখের রাজ্যে টেনে নিচ্ছেন! নামের শক্তি অসীম, নামের বীর্য্য অফুরন্ত।

সন্তানকে ব্রহ্মচারী করিবার উপায়

অপর একজন প্রশ্ন করিলেন,—সন্তানকে ব্রহ্মচারী করা যায় কি কল্লে?

শ্রীশ্রীবাবা।—তার জন্য বাপমাকে সন্তানের জন্মের আগ থেকে প্রস্তুত হ'তে হয়। মা-বাপের ভিতরে সংযম-সাধনের চেষ্টা দীর্ঘকাল ধ'রে চল্‌লে, তাদের সন্তান-সন্ততি সহজেই সংযমের সামর্থ্য নিয়ে আসে। মেয়েদের যদি বিয়ে হয় ষোল পেরিয়ে সতের বছরে, আর প্রথম সন্তানটী যদি জন্মে তার একুশ বছরের সময়ে, তাহ'লে দম্পতী পুরো তিনটা বছর ধ'রে সংযত চিন্তা, সংযত বাক্য ও সংযত ব্যবহার অনুশীলন করার অবসর পেল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যাই বলুন, তোমরা নিশ্চয় জে'নো যে, এরও শুভফল সন্তানে আস্‌বেই আস্‌বে। সন্তান গর্ভস্থ হবার

পর থেকে যদি দম্পতীর মধ্যে খুব উন্নত ভাব ও উন্নত ব্যবহারের অনুশীলন হয়, তবে তার ফলও শিশুর ভিতরে কতক যাবেই যাবে। পাশ্চাত্যেরা বল্‌বেন,—ওসব কুসংস্কার, সন্তান একবার গর্ভস্থ হ'য়ে গেলে তার সম্পর্কে আর বাপ-মায়ের কিছুই করণীয় নেই। আমি বলি,—ওটা বরং পাশ্চাত্যদেরই কুসংস্কার। সন্তান গর্ভস্থ হবার পর ইতর প্রাণীরাও তাদের পুরুষদের কাছে ঘেঁস্‌তে দেয় না, এই একটা ঘটনা থেকেই স্পষ্ট বুঝবে যে, তোমার সন্তানের যথেষ্ট কুশল অকুশল তুমি তার ভ্রূণাবস্থায় ক'রে দিতে পার। তুমি যদি পশুর অধম হও, তাহ'লে তোমার আচরণের ফলে ভ্রূণও পশুর অধম হ'য়ে ভূমিষ্ঠ হবে। তুমি যদি পশুর মতনই ভ্রূণকে কোনও অবাঞ্ছনীয় উৎপীড়নে না ফেল, কিন্তু মনে মনে কামভাব পোষণ কর, তা'হলে সে পশু হ'য়ে জন্মাবে এবং বুদ্ধি-বিকাশের পরে তার পশুভাব দূর করার জন্য তোমাকে আয়োজন কত্তে হবে। আর তুমি যদি পশুদের আচরণের অনু-করণে ভ্রূণকে উৎপীড়িত কত্তে বিরত থাক এবং সঙ্গে সঙ্গে মনকে রাখ দেবতাদের মত নিয়ত ঊর্দ্ধে, তা' হ'লে এই শিশু দেবত্বের স্বভাব-সম্পদ নিয়েই ভূমিষ্ঠ হবে। তারপরে শিশুকাল থেকেই সন্তানের দিকে বাপমাকে খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখ্‌তে হয়। ছেলে মেয়ের শরীর খুব পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখ্‌বে, যেন কখনো কোন প্রকার চুল-কনা না জন্মাতে পারে। অনেক সময়ে চুলকনা থেকেই কদভ্যাসের প্রথম শিক্ষা লাভ হ'য়ে থাকে,—এমনকি শিশুকাল থেকেই। সুতরাং এই বিষয়ে খুব সাবধান থাকবে। যে সব লোক শিশুদের আদর কত্তে গিয়ে তাদের হাত পা নিয়ে খুব বেশী নাড়াচাড়া করে, তাদের কাছে শিশুকে কখ্‌খনো. দেবে না। এই সব লোক-গুলিই রোরুদ্যমান শিশুদের ঠাণ্ডা করার জন্যে অধিকাংশ সময় তার racial parts এ (জনন-দ্বারে) হাত দেয়। আয়ার হাতে কখনো কোন শিশুর ভার দেবে না, আয়াগুলিই এসব অপকাজ করে বেশী।

শিশুর প্রতিপালকদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের অর্থবোধ

প্রশ্ন।—দরিদ্রের ঘরে আর আয়া আস্‌বে কোত্থেকে ?

শ্রীশ্রীবাবা।—চাকর-বাকর আছে আর অশিক্ষিতা পুর-স্ত্রীরা আছেন ! এঁদের

অনেকেই জানেন না, ছেলেদের যে ভাবে সে ভাবে আদর করাটা কত বড় সর্ব্বনাশের ব্যাপার। তাঁরা চিরকাল যেমন দেখে আস্‌ছেন, নিজেরাও তেমনি ক'রে আস্‌ছেন। এইজন্যই তাঁদের সুশিক্ষার অভাবটাকেও দূর কত্তে হবে। ছেলেমেয়েদের যদি ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে চাও, তা' হ'লে, এসব শিশুদের যাঁরা প্রতিপালন কর্ব্বেন, তাঁদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের প্রকৃত অর্থবোধ এবং ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি গভীর সম্ভ্রমবোধ জাগিয়া তুল্‌তে হবে। সংসারটিকে ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি কত্তে হবে।

পুরবাসী সকলের রুচি একরকম করিবার উপায়

প্রশ্ন।—সংসারের প্রত্যেককে তেমন ভাবে তৈরী করা বর্ত্তমান অবস্থায় ত' সম্ভব ব'লে মনে কত্তে পাচ্ছি না। একান্নভুক্ত পরিবার আমাদের,—দশ জায়গা থেকে দশজন দশ রকমের রুচি, শিক্ষা ও অভ্যাস নিয়ে এসেছে; তাদের সবাইকে এক রকম ক'রে গ'ড়ে তোলা কি সম্ভব?

শ্রীশ্রীবাবা।—সকলের জীবন একই সঙ্গে পরিবর্ত্তিত ক'রে দেওয়া অসম্ভব হ'তে পারে, এক একজন ক'রে আস্তে আস্তে অধিকাংশেরই রুচি-পরিবর্ত্তন সম্ভব। অথবা সকলের সকল রুচি-বিভিন্নতার মধ্যেও একটী কল্যাণপ্রদ সামঞ্জস্য ক'রে নেওয়া অসম্ভব নয়। সপ্তাহে একটা দিন নির্দ্দিষ্ট ক'রে রাখ্‌বে,—সেই দিনটী জগতের সকল গুরুর সম্মানার্থে বৃহস্পতিবার হ'তে পারে, কিংবা তোমাদের গুরুদেবের জন্মবার হ'তে পারে, অথবা গৃহকর্ত্তার জন্মবার হ'তে পারে, অথবা সকলের পক্ষে সুবিধাজনক যে কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট বার হ'তে পারে, যে দিন কাউকে হাটে-বাজারে, বা অফিস্‌-আদালতে যেতে হয় না,—সেদিন বাড়ীর সকল নরনারী বালকবৃদ্ধ একত্র ব'সে সদ্‌গ্রন্থ-পাঠ শুন্‌বে। যে পড়্‌বে, সে ভক্তিভাব নিয়ে পড়্‌বে, আর যারা শুনবে, তারা যাতে শ্রদ্ধাশীল হ'য়ে শোনে, তার প্রতি লক্ষ্য দেবে। এ সময়ে ধূমপান, তাম্বুল চর্ব্বণ, নস্য নেওয়া, কোলাহল করা প্রভৃতি কদভ্যাস থেকে

বিরত থাক্‌বে। এমন সদ্‌গ্রন্থ পাঠ কর্ব্বে, যার ভিতরে কোনও সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি নেই। কিন্তু তেমন সদ্‌গ্রন্থ যদি না মিলে, তা হ'লে কোনো একটা নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বা একটা নির্দ্দিষ্ট মতের গ্রন্থ চিরকাল পড়্‌বে না; বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতের গ্রন্থ পাঠ কর্‌বে। একখানা শেষ হ'লে আর একখানা ধর্‌বে। কিন্তু গ্রন্থ-নির্ব্বাচনের সময়ে এইটুকু লক্ষ্য রাখ্‌বে যেন, সকল গ্রন্থেই ত্যাগ, নিষ্কামতা, ব্রহ্মচর্য্য, সংযম, পবিত্রতা, দৈহিক পরিচ্ছন্নতা, সদাচার প্রভৃতির সমর্থন থাকে। যে সব গ্রন্থে তা' নেই, সেগুলি ভাল লোকের রচনা হ'লেও নির্ব্বাচিত কর্ব্বে না। এই ভাবেতে যদি পাঠের নিয়ম প্রবর্ত্তিত কর্ত্তে পার, তা' হ'লে দেখ্‌বে, দুই চারি মাসের মধ্যেই বাড়ীর আবাল-বৃদ্ধ সকলের মধ্যেই কেমন এক পরিবর্ত্তন অলক্ষিতে এসে পড়েছে।

সদ্‌গ্রন্থ-পাঠ তথা উপাসনানুষ্ঠান

প্রশ্ন।—সদ্‌গ্রন্থ পাঠের দিন কি কোনও পূজা-অর্চ্চনা বা উপাসনাদির আবশ্যকতা আছে?

শ্রীশ্রীবাবা।—কর্‌লে অত্যুত্তম। ধর্ম্মভাব তাতে সহজে পুষ্ট হবে এবং গ্রন্থ-শ্রবণ-কালে সকলেরই মন ভক্তির আশ্রয়ে থাক্‌বে। নিজেদের সুবিধামত, হয় উপাসনানুষ্ঠানের পরে পাঠ, নয় পাঠানুষ্ঠানের পরে উপাসনা কর্ব্বে। পাঠ আগে ক'রে নিলে উপাসনায় মন সহজে বস্‌বে। উপাসনা আগে ক'রে নিলে পাঠের ভিতরে মন সহজে বস্‌বে। তবে, গ্রন্থখানা যদি এমন হয়, যার ভিতরে কোনও সাম্প্রদায়িক দেবতা বা অবতারাদির পূজার্চ্চনার প্রতি পাঠক বা শ্রোতাদের মনকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা আছে, তা হ'লে উপাসনার আগে তাকে পাঠ না ক'রে পাঠের আগেই উপাসনা করা কর্ত্তব্য। কারণ, উপাসনার পরে ব'সে তুমি যেই মতের বা যেই পথের কথাই শোন, উপাসনা-লব্ধ প্রজ্ঞার বলে তুমি তার সাম্প্রদায়িকতার গ্রন্থি-মোচন ক'রে অর্থগ্রহণ কর্ত্তে সমর্থ হবে। কিন্তু উপাসনার আগেই যদি তা' পাঠ কর, তা' হ'লে সেই গ্রন্থের সাম্প্রদায়িক

ভাবগুলি উপাসনাকালে তোমার মনের ভিতরে প্রভাব বিস্তার করবে, এ'তে উপাসনার চারিত্রিক নিষ্ঠা নষ্ট হবে।

শিশু-পালন সম্পর্কে কর্ত্তব্য-শিক্ষা

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—কিছুদিন গ্রন্থপাঠের দ্বারা সকলের মানসিক উন্নতি আরম্ভ হ'লে পরে সন্তান-পালন সম্বন্ধে একটা একটা ক'রে নিয়মকে সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত কত্তে চেষ্টা কর্ব্বে। শিশুকে অত্যধিক চুমো খাওয়া ভাল নয়,—এমন কি চুমো বরং একদম না খাওয়াই ভাল,—এ কথা তখন বল্‌বে। আগে বললে ত' কেউ শুনবেই না! চ'খের দৃষ্টিতে যদি স্নেহ থাকে, তবেই যথেষ্ট। স্নেহ দেখাবার জন্য বাড়াবাড়ি কোনো কাজের কথা নয়। এ কথা মেয়েরা তখন বুঝ্‌বে। শিশুদের কোলে নেওয়া সম্বন্ধেও রীতির একটু পরিবর্ত্তন কত্তে হবে। যেভাবে ছেলেমেয়েদের কোলে নেওয়া হয়, তাতে তাদের জননাঙ্গ ঘর্ষিত হয়। এতে তাদের ক্ষতি হয়। ছেলেমেয়েদের খুব বেশী বেশী কোলে কোলে রাখা বড় ভাল নয়। স্বভাবের উপরে ছেড়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। আরো কয়েকটী বিষয়ে একেবারে যক্ষের মতন সতর্ক দৃষ্টি রাখ্‌তে হবে। ছেলেমেয়ের ঘুমোবার সময়ে, যেন হাত কিছুতেই নীচের দিকে না থাকে, তা' দেখ্‌তে হবে। ঘুমন্ত অবস্থায় হাত কখনো কোমরের দিকে এলে, টেনে টেনে তা' তু'লে দিতে হবে। এমন অভ্যাস তাকে করাতে হবে যেন, গায়ে চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমুলেও সে যেন তার হাত দু'খানা চাদরের বাইরে রাখে, ভিতরে টেনে নিয়ে না যায়। একটু বয়স্ক হ'লেই তাদের এমন অভ্যাস করিয়ে নিতে হবে যেন, ঘুম ভাঙ্গলে আর এক মুহূর্ত্তও শয্যায় শুয়ে না থাকে। খেলাধূলার বয়স এলেই, দেহের বল-বর্দ্ধক নানাপ্রকারের ক্রীড়া-কৌতুকে তাকে এমনভাবে নিয়ত মত্ত রাখ্‌তে হবে, যেন তার নিজের দেহের সম্বন্ধে কোনও প্রকার কৌতূহল জাগ্‌বার আর অবসর না থাকে। খেলায় খেলায় জননাঙ্গ স্পর্শ করার যে অভ্যাস অনেক ছেলেমেয়েদেরই হ'য়ে যায়, সেইটী যাতে কিছুতেই না হ'তে

পারে, তার জন্য তীব্র সতর্কতা রাখ্‌তে হবে। বয়স্ক শিশুদের একলা ঘুমোবার অভ্যাস করাবে। শৈশব থেকেই এই ভাবে ছেলেমেয়েদের গড়্‌লে, তবে আশা করা যেতে পারে যে, তারা পূর্ণ ব্রহ্মচারী হ'তে পার্ব্বে।

মূল চিন্তা হউক—মানুষ করা

প্রশ্ন।—কিন্তু শিশুকে ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতা থেকে যে রক্ষা কত্তে হবে, সর্ব্বদা এ কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে শিশুর মা-বাপের মনের ক্ষতি হ'তে পারে না ?

শ্রীশ্রীবাবা।—খুবই হ'তে পারে। এজন্যও সাবধানতার আবশ্যকতা আছে। শিশুকে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা থেকে রক্ষা কত্তে হবে বটে, কিন্তু দিবারাত্রি ঐ এক ইন্দ্রিয়েরই বিষয়ে চিন্তা কর্ব্বে কেন ? শিশুকে যে মানুষ ক'রে তুল্‌তে হবে, এইটীই তোমাদের অহোরাত্রির চিন্তা হোক্। মানুষ করার চিন্তাটীই মূল চিন্তা,—শিশু সম্বন্ধে অপরাপর সকল চিন্তা তার শাখাপ্রশাখা। এই মূল কথাটীর উপরে জোর দিলেই সকল সমস্যার সমাধান হ'য়ে যায়। "মানুষ" কত্তে হবে। কেমন মানুষ ? না সর্ব্বপ্রকারে মানুষ, জীবনের কোন অংশে মনুষ্যত্বের দিক্ দিয়ে এক কণা খাটো নয়।

প্রত্যেক দম্পতীর কয়টী সন্তান হওয়া উচিত

অপর একজন প্রশ্ন করিলেন,—এক একটী দম্পতীর ক'টী ক'রে সন্তান হওয়া উচিত।

শ্রীশ্রীবাবা।—এ প্রশ্নের উত্তর এক কথায় হয় না। স্থলবিশেষে দশটী হ'লেও দোষ হয় না, কোথাও বা একটী হ'লেই দোষের। এই বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট কোনও সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা যায় না। তবে, এইরূপ বলা যেতে পারে যে, যতগুলি সন্তানের উপযুক্তরূপ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর তত্ত্বাবধান পিতামাতার সাধ্যাতীত হবে না, যতগুলি সন্তানের জন্ম দ্বারা পিতামাতার দৈহিক বা মানসিক অবস্থার অবনতি হয় না, ততগুলি সন্তানই প্রার্থনীয়। এর বেশী নয়।

বিবাহের পরে স্বামীর আচার-ব্যবহার

একজন প্রশ্ন করিলেন,—বিবাহের পরে স্বামীর কিভাবে চলা উচিত ?

শ্রীশ্রীবাবা।—এমন ভাবেই চলা উচিত যেন, স্ত্রী তাঁর স্বামীর সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধার ভাব পোষণ কত্তে বাধ্য হন। স্বামী তাঁর স্ত্রীকে এমন মহান একটা সংসর্গ দেবেন, যাতে স্ত্রী তাঁর নিজ স্বামীকে জগতের অপর সকল স্বামীদের অপেক্ষা ধর্ম্মবিষয়ে ও নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ মনে না ক'রে না পারেন। স্বামীর আচরণ শুধু ভালবাসা আকর্ষণের যোগ্য হ'লেই হবে না, শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণের যোগ্যও হ'তে হবে। স্বামীর বাক্য ও ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এমন একটা আত্ম-সম্ভ্রম, এমন একটা পবিত্রতা পরিস্ফুট হওয়া চাই, যেন স্ত্রী স্বামীর বুকের মাঝে আশ্রয় না চেয়ে স্বভাবতঃই চরণতলে আশ্রয় চায়। স্বামীকে এমনটী হ'তে হবে যেন স্ত্রী তাঁকে মানুষ ব'লে না ভেবে স্বর্গের জিতেন্দ্রিয় দেবতা ব'লে মনে করেন। স্বামীকে এমন চরিত্রবল দেখাতে হবে স্ত্রী যেন গঙ্গার মত মহাদেবের মাথায় আশ্রয় না চেয়ে, গৌরীর মত তাঁর পাদপদ্ম পূজা কত্তে পেলেই নিজেকে ধন্য মনে করেন।

দম্পতীর প্রকৃত ভালবাসা

প্রশ্ন।—এতে কি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা জন্মাবার বিঘ্ন হবে না ?

শ্রীশ্রীবাবা।—কাম জন্মাবার বিঘ্ন হবে, প্রেম জন্মাবার বিঘ্ন হবে না। ভালবাসা কথাটা বল্‌লে কামও বুঝায়, প্রেমও বুঝায়। শ্রদ্ধার মধ্য দিয়ে কখনও কামের উদ্ভব হয় না। যেখানে শ্রদ্ধা নেই, কাম সেখানেই নিজের বিক্রম সহজে প্রকাশ করে। শ্রদ্ধার ভিতর দিয়ে যে আত্মীয়তা জন্মে, তারই নাম প্রেম, তাই হচ্ছে প্রকৃত ভালবাসা। প্রকৃত ভালবাসা দম্পতীর মধ্যে অবিচ্ছেদ্য আকর্ষণ জন্মাবে, কিন্তু দেহের প্রতি দেহ-প্রীতি না বাড়িয়ে আত্মার প্রতি আত্মার-প্রীতি বাড়াবে, তাতেই বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য সার্থক হবে।

শিশু-মৃত্যু নিবারণের উপায়

অপর একজন প্রশ্ন করিলেন,—শিশু-মৃত্যু নিবারণের উপায় কি ?

শ্রীশ্রীবাবা।—স্বামী স্ত্রীর সংযমই এর শ্রেষ্ঠ উপায়। অধিকাংশ সন্তানই পিতা-মাতার অসংযমের দরুণ ক্ষীণায়ু হয়। দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে, দারিদ্র্য দূর করা। স্বামীর উপরে বোঝার মত না হ'য়ে আর্থিক ব্যাপারেও যদি স্ত্রীরা নানা শিল্পকার্য্যের ভিতর দিয়ে একটু উপার্জ্জনশীলা হন, তা হ'লে দারিদ্র্য-সমস্যারও সমাধান হবে। সুতরাং সংযম শিক্ষা এবং অন্নার্জ্জন শিক্ষা, এই দুইটাই হচ্ছে শিশু-মৃত্যু নিবারণের শ্রেষ্ঠ পন্থা।

অশ্বিনীকুমার দত্তের দাম্পত্য-সংযম

একজন প্রশ্ন করিলেন,—শুনেছি, বরিশালের স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত নাকি বিবাহিত হ'য়েও কখনো স্ত্রীসঙ্গ করেন নি।' এরকম কথা কি কখনো সত্য হ'তে পারে ?

শ্রীশ্রীবাবা।—খুব পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা শোন নাই ?

প্রশ্ন।—রামকৃষ্ণ ত' সাধু ছিলেন। আর অশ্বিনীবাবু ত' বিষয় নিয়েই জীবন কাটালেন।

শ্রীশ্রীবাবা।—তাতে কোনো ক্ষতি হয় নি। তিনি যখন বিষয়ের সেবা কত্তেন, তখন বিষয়-সেবাকেই ভগবানের সেবা ব'লে জান্‌তেন। ভগবানে সমর্পিতচিত্ত হ'য়ে কেউ বিষয়-সেবা কর্ল্লে তাতে বিষয়-সেবার ফল হয় না, ভগবৎ-সেবারই ফল হয়। তাই তাতে ইন্দ্রিয়ের উপরে অসীম কর্তৃত্ব জন্মে।

প্রশ্ন।—কিন্তু বাড়ীঘর, টাকাকড়ি, জমাজমি এসব ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়েও যখন অশ্বিনীবাবুকে বিব্রত হ'তে হ'ল, তখন স্ত্রীসম্বন্ধে একেবারে রামকৃষ্ণ পরমহংস হওয়ার পৃথক প্রয়োজন কি ছিল ?

শ্রীশ্রীবাবা।— দেখ, এটা তাঁর ব্যক্তিগত লাভালাভের ব্যাপার। সুতরাং এঁর জন্য তিনি যে এসে তোমাদের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বস্‌বেন, এই রকম দাবী

করা অন্যায়। হয়ত এ রকম জীবন যাপনের তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছিল। তোমরা ত' তাঁর জীবন থেকে এইটুকু শিখতে পার যে, বিবাহিত হ'য়েও এবং সাধারণ গৃহীর ন্যায় আবশ্যক-মত সংসারের সকল কাজ ক'রেও, এমন কি দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গরাজির নেতারূপে পুরোভাগে দণ্ডায়মান হ'য়েও মানুষ ধর্ম্মবলে ইন্দ্রিয়ের উপরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা কত্তে পারে। অশ্বিনীবাবু পুণ্যশ্লোক পুরুষ। সাধনের বলে যে শক্তিকে তিনি লাভ ক'রেছিলেন, তোমরাও তা' পার। দেহের উপর, ইন্দ্রিয়ের উপর, মনের উপর এইরূপ প্রভুত্ব লাভ যে সম্পূর্ণ সম্ভব, সে কথা তোমরা অশ্বিনীবাবুর জীবন থেকে শিক্ষা কর। প্রভুত্ব লাভের পরে, ইচ্ছা হয়, সন্তান-সন্ততির পিতা হয়ো।

দাম্পত্য জীবনে মত্ততা আসিলে কি কর্ত্তব্য?

একটী যুবক লাজ-লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া সকলের সমক্ষেই বলিতে লাগিলেন,—বিবাহের পূর্ব্বে আমি নানা সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ ক'রে চরিত্রের উন্নতির জন্য চেষ্টা কত্তাম। তারপরে বিবাহ করি। বিবাহের পরে অনেক দিন পর্য্যন্ত ভালভাবে চলতে পেরেছিলাম। একদিন কি কুবুদ্ধি এল, আমি স্ত্রীকে উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা না দিয়েই পশুবৎ চল্‌তে লাগলাম। সেই অবধি আমার চরিত্রে যা' পতন এসেছে, তা' বল্‌বার ভাষা পাই না। আমি দিন দিন অধঃপতনের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছি। আমার উপায় কি? স্ত্রী আমাকে রক্ষা করে না বরং আমার ধ্বংসেরই সহায়তা কচ্ছে।

শ্রীশ্রীবাবা।—স্ত্রীকে ছেড়ে একটু দূরদেশে গিয়ে কিছুদিন বাস কর এবং নিজে খুব ক'রে সাধন-ভজন ক'রে কিছু আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয় ক'রে নাও। প্রবাসে অবস্থানকালে স্ত্রীকে যে সব চিঠি লিখ্‌বে, তাতে ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া অন্য কথা রাখ্‌বে না। এইভাবে একদিকে তোমার সাধন-শক্তি বাড়্‌তে থাকুক, অপরদিকে দৈহিক ঘনিষ্ঠতার অনভ্যাস হেতু স্ত্রীর সম্বন্ধে তোমার একটা দৈহিক সঙ্কোচও সৃষ্ট হোক্। সঙ্গে সঙ্গে তোমার স্ত্রীর মনেও তোমার পত্রাদির দ্বারা

ঈশ্বরীয় ভাব জাগ্‌তে থাকুক। এই ভাবে কিছুদিন বিদেশে থাকার পর একবার দেশে যাবে এবং স্ত্রী যাতে ভগবৎ-সাধনের পন্থা পায় এমন ব্যবস্থাটুকু ক'রেই আবার বিদেশে চ'লে আস্‌বে, খুব মেলামেশা কর্‌বে না। তোমার সহধর্ম্মিণী যাতে সাধন-ভজন খুব উৎসাহের সহিত কত্তে থাকেন, এই সময়ে পত্রযোগে তাঁকে শুধু সেই উপদেশই দেবে, অন্য বাজে কথা বাদ দেবে। নিজেও সাধন-ভজন খুব কর্‌বে। তার পরের বার যখন বাড়ী যাবে, তখন দু'জনে মিলে এক-সঙ্গে ভগবৎ-কথার আলোচনা কর্ব্বে, একসঙ্গে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ কর্ব্বে, একসঙ্গে ব'সে উপাসনা ধ্যান জপ প্রভৃতি কর্ব্বে। তখন দেখ্‌বে, নৌকা ঝড়ের বেগ সাম্‌লে গিয়েছে, আর ভয় নেই।

স্ত্রীদের স্বামিভক্তি হ্রাসের কারণ

একজন প্রশ্ন করিলেন,—আজকালকার মেয়েরা আগেকার মেয়েদের মত স্বামীকে তেমন ভক্তি করে না। এর কারণ কি লেখাপড়া শিক্ষা?

শ্রীশ্রীবাবা।—না, তা' নয়। এর প্রকৃত কারণ হচ্ছে স্বামীদের অসংযম। বিবাহের দু'দিন পরেই স্ত্রী বুঝতে পারে যে, তার স্বামী তাকে যেটুকু আদর করে, সেটুকু শুধু ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিরই জন্য, স্বামীর ভালবাসার অপর কোনও বাস্তব মূল্য নেই। তখন সে স্বামীর প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ কত্তে আরম্ভ করে। সে যখন দেখ্‌তে পায় যে, স্বামীর ভোগাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির সে একটা যন্ত্র মাত্র, তার দেহের সুস্থতা বা স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি স্বামীর বিবেচ্য হয় না, দৃষ্টি শুধু নিজের পিপাসার পরিতৃপ্তিতে, সে যখন বুঝতে পারে যে, তার নারী-দেহের ভিতরে যে একটা বোধক্ষম 'মানুষ' রয়েছে, একথা স্বামী গণনায়ও আনে না, তখন সে নিজেকে অপমানিত মনে করে। এটাই হচ্ছে তার স্বামি-ভক্তি হ্রাসের কারণ। আগেকার পুরুষেরা স্ত্রীর ভিতরের মানুষটীকে তেমন মর্য্যাদা দিন আর নাই দিন, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, একাদশী প্রভৃতি কতকগুলি তিথি, রবিবার, বৃহস্পতিবার, জন্মবার প্রভৃতি কতকগুলি বার, কালীপূজা, সরস্বতী পূজা, শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী, মহাষ্টমী,

প্রভৃতি কতকগুলি পূজার দিন বিশেষভাবে মেনে চল্‌তেন। এখন তোমরা সব কুসংস্কারমুক্ত জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত নবযুগের ছোক্‌রা, তোমাদের এসব মান্‌বার বালাই নেই।

স্ত্রীশিক্ষা ও স্বামিভক্তি

প্রশ্ন।—তবে কেউ কেউ যে বলেন, স্ত্রীশিক্ষার ফলেই স্বামিভক্তি উঠে যাচ্ছে ?

শ্রীশ্রীবাবা।—তাঁরা না বু'ঝে বলেন। জ্ঞানের সঙ্গে যে ভক্তির যোগ আছে, সেই ভক্তিই প্রকৃত ভক্তি। অজ্ঞানীর ভক্তি ভক্তি নয়, ওটা আসক্তি মাত্র অথবা কুসংস্কার মাত্র। বৈদিক যুগে কত কত মহাপণ্ডিতা মহিলা জন্মেছিলেন। তাঁরা কি স্বামীকে ভক্তি কত্তেন না ? লোপামুদ্রা, সাবিত্রী, চূড়ালা, মদালসা ত' এক একটী বিদ্যার জাহাজ ছিলেন। পণ্ডিতা ছিলেন ব'লে কি তাঁদের স্বামীর প্রতি ভক্তি ছিল না ?

বিবাহিত জীবনের নীচতা হইতে আত্মরক্ষার উপায়

একজন জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিলেন,—বিবাহিত জীবনের মধ্যে যে সব নীচতা রয়েছে, তা' থেকে আত্মরক্ষা করার উপায় কি ?

শ্রীশ্রীবাবা।—বিবাহিত জীবনের আদর্শকে উচ্চে তু'লে ধরা।

সহপাপিনী বনাম সহধর্ম্মিণী

অপর একজন যুবক লজ্জা ত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন,—যখনই আমি আমার স্ত্রীকে দেখি বা তার কথা মনে করি, তখনই আমার দেহ-মন ভোগাকাঙ্ক্ষায় অধীর হ'য়ে ওঠে। এই দুরবস্থার দমন কি ক'রে করব ?

শ্রীশ্রীবাবা।—তখন ভাব্‌বে যে স্ত্রী শুধু ভোগেরই ত' সঙ্গিনী নন, তিনি তোমার ত্যাগেরও সঙ্গিনী, তিনি তোমার সহধর্ম্মিণী,—সহপাপিনী নন।

প্রশ্ন।—ঐ রকম চেষ্টা অনেক ক'রে দেখেছি। মন ওসব মানে না।

শ্রীশ্রীবাবা।—তার জন্যে তোমাকে দস্তুরমত সাধন-ভজন কত্তে হবে। বড় বড় কথা আমরা ঢের ব'লে থাকি, কিন্তু মুখে যা বলি, তার শতাংশের একাংশেরও অর্থ বুঝ্‌তে পাই না। এই জন্যেই সৎকথায় বা সচ্চিন্তায় উপযুক্ত ফল হয় না। ঠিক ঠিক অর্থ যদি বুঝতে পারি, সৎকথার কাছে অসৎচিন্তা আধ-মুহূর্ত্তও দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারে না। তাই তোমাকে ভগবৎ-সাধন কত্তে হবে। ভগবৎ-সাধনের ফলে সৎ কথার প্রকৃত মানেগুলি হৃদয়ঙ্গম হবে। তা হ'লেই, "সহধর্ম্মিণী" কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করা মাত্র পাপেচ্ছা দূর হ'য়ে যাবে। ভগবৎ-সাধনে মন লাগাও, তাতে তোমার মনন-শক্তি বাড়ুক, তারপরে শব্দটীর পূর্ণ অর্থ চিন্তা ক'রে হাজার হাজার বার "সহধর্ম্মিণী" কথাটা উচ্চারণ কত্তেই থাক। এভাবে দেখ্‌বে, শব্দের প্রকৃত অর্থবোধ এমন গভীরভাবে হবে যে, সে মর্ম্মকে স্পর্শ কত্তে সমর্থ হবে, হৃদয়-নিহিত দীর্ঘকালের বিরুদ্ধ সংস্কারের মূলে সে কুঠার হান্‌বে। আরও একটী কাজ কত্তে হবে। সেইটী হচ্ছে স্ত্রীকে উপযুক্ত শিক্ষা-দান। আক্ষরিক শিক্ষাদানের কথা বল্‌ছি না, ভাব দেওয়ার কথা বল্‌ছি। ভোগকে তার যথাযোগ্য স্থান থেকে না তাড়িয়ে দিয়েও ত্যাগের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাকে জাগাতে হবে। এমন ধারা শিক্ষা তাঁকে দিতে হবে, যেন ত্যাগের ভাব, সংযমের ভাব, ভগবৎ-প্রেমের ভাব তাঁর মধ্যে দিন দিন পরিপুষ্ট হ'তে থাকে। যখন তোমার চেষ্টার সুফল তোমার স্ত্রীর জীবনে ফল্‌তে আরম্ভ কর্‌বে, তখন দেখো তোমার সকল নীচ ভাব, নীচ বুদ্ধি তাঁকে দেখেই লজ্জা পেয়ে থম্‌কে দাঁড়াবে।

অঙ্কশাস্ত্রবিৎ সোমেশচন্দ্র বসু

প্রশ্ন।—এই উপদেশ কি আপনি অনুমানে দিচ্ছেন, না, প্রকৃতই এমন ব্যাপার কখনও ঘটেছে ?

শ্রীশ্রীবাবা।—অনুমানে নয় গো, অনুমানে নয়। দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছি। প্রসিদ্ধ

অঙ্কশাস্ত্রবিৎ সোমেশ বসুর নাম শুনেছ? তিনি আমাকে নিজ মুখে তাঁর জীবনের আশ্চর্য্য ইতিহাস বলেছেন। একদিন তিনি তাঁর স্ত্রীকে ঠাকুর ঘরে ধ্যান-নিস্পন্দ অবস্থায় দেখেই নিজের সমস্ত জীবনটাকে পরিবর্ত্তিত ক'রে নেন। স্ত্রীর ভিতরে ত্যাগ ও ভগবৎ-প্রেমের ভাব ছিল ব'লেই সোমেশবাবু একজন আদর্শ ব্রহ্মচারী গৃহী হ'তে পেরেছিলেন এবং এই ব্রহ্মচর্য্যের শক্তিতেই তিনি এত বড় গণিতজ্ঞ হ'য়েছেন যে, একশতটা অঙ্ককে একশতটা অঙ্ক দ্বারা গুণন কর্ল্লে যে ফল হয়, তা' তিনি দশ সেকেণ্ডের মধ্যে বে'র ক'রে দিতে পারেন। যে কোন অঙ্কের hundredth root (শততম ঘনমূল) তিনি দু'এক সেকেণ্ডের ভিতরে বে'র ক'রে দেন। স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গিনী বলা হয় ত? স্ত্রীর ভিতরে উন্নত আদর্শ ও উন্নত অভ্যাস প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গেলে যে তোমার উন্নতির অর্দ্ধেক ওখানেই হ'য়ে রইল!

শ্রীরামকৃষ্ণের মহদ্দৃষ্টান্তের সুফল

শ্রোতাদের মধ্যে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি এতক্ষণ কোনও প্রশ্ন করেন নাই। এখন তিনি তাঁর নিজের বক্তব্য স্বরূপে বলিলেন,—দেখুন, এই রামকৃষ্ণ পরমহংসের আবির্ভাবের পর থেকে একটা হুজুগ চলেছে যে, বিয়ে কর্ব্ব কিন্তু স্ত্রীসঙ্গ কর্ব্ব না।

শ্রীশ্রীবাবা।—ওটা আপনার বুঝবার ভুল। এ বিষয়ে হুজুগ দেশে এখনো আরম্ভ হয় নি,—হ'লে দেশের পক্ষে ভালোই হ'ত। বিয়ে ক'রেও ষোল আনা সংযমী থাক্‌তে হবে, এমন হুজুগ যদি এ দেশের ছেলেদের ভিতরে প্রকৃতই জাগ্‌ত, তা' হ'লে যুবকেরা বিবাহের আগেও সংযমেরই সাধনা কত্ত। তাতে দেশের শ্রী ফিরে যেত। আজকাল হচ্ছে কি? বিবাহ কর্ব্ব, একথা যারা ভাবে, তারা নানাভাবে অবিরাম স্ত্রী-সম্ভোগের কথাই চিন্তা করে। ফল এই হয় যে, বিবাহের আগেই রিপুর উত্তেজনায় নিজেদের কচি মাথা নিজেরা চিবিয়ে খায়। বিবাহের সম্বন্ধে এই যে নীচ ধারণা, সেইটী আজ পরিবর্ত্তিত হওয়া দরকার।

সকল জায়গায়ই যখন দুটী চারটী লোক বিবাহিত হ'য়েও ভোগসংস্পর্শহীনভাবে জীবনযাপন ক'রে দৃষ্টান্ত দেখাবেন, তখন বিবাহ সম্বন্ধে লোকের কুৎসিত ধারণা পরিবর্ত্তিত হ'তে আরম্ভ কর্ব্বে। এই রকম দৃষ্টান্ত এদেশে অনেক হ'য়ে এসেছে, কিন্তু আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি,—অতীত ইতিহাসের খোঁজ রাখি না। সদাচারী তান্ত্রিকদের ভিতরে অনেক গৃহস্থ সাধক দাম্পত্য সংস্পর্শ পরিহার ক'রে এই বাংলায় ধর্ম্মজীবন যাপন ক'রে গেছেন,—তাঁদের ইতিহাস কেউ লিখে রাখে নি। শুদ্ধ বৈষ্ণবদের ভিতরে অনেক গৃহস্থ মহাত্মা একান্তই কৃষ্ণগতপ্রাণ হ'য়ে সংসারীর বৈধ ভোগকে পর্য্যন্ত বর্জ্জন ক'রে চলেছেন,—আত্ম-প্রচার চেষ্টাহীন অকৈতব এই সব নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষদের কথা আমরা ভুলে গেছি। নাথ-যোগী-দের ভিতরে সম্যক্-ভোগসংস্পর্শমুক্ত অনেক শৈব গৃহস্থ মহাপুরুষ জন্মেছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা নিজেরাই এভাবে লাভবান্ হ'য়ে গেছেন,—সমগ্র সমাজ এসব মহদ্দৃষ্টান্তের আলোচনা ও অনুসরণের দ্বারা লাভ উঠাবার সুযোগ পায়নি। তাই ইংরেজ রাজত্বে এক পাশ্চাত্য-বিদ্যা-বিশারদ জ্ঞানী সন্ন্যাসীর গুরুরূপে সেই শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যময় আবির্ভাব হ'ল, যিনি বিবাহ ক'রেও বিবাহিত জীবনের ভোগ-সংস্পর্শের মধ্যে নিজেকে জড়ালেন না। নিজের তপস্যার মহিমায় তিনি সুপ্রতিষ্ঠিতই ছিলেন, কিন্তু বিবেকানন্দের মত মানবমিত্র মহাত্মার তিনি গুরু হও-য়াতে জগৎ তাঁর প্রদর্শিত মহনীয় দৃষ্টান্তের প্রতি সহজেই দৃষ্টি দিল। তাই আজ যুবকদলের শ্রদ্ধার দৃষ্টি শ্রীরামকৃষ্ণের চরণপ্রান্তে গিয়ে পড়েছে। কিন্তু মানুষরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ যা' ক'রে গেছেন, মানুষরূপে সাধনবলে আধুনিক যুবকরাও যে তাই কর্ত্তে পার্ব্বে, এই ভরসা, এই বিশ্বাস, এই আত্ম-শক্তিতে আস্থা এদের বুকে এলে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রদর্শিত মহদ্দৃষ্টান্তের পূর্ণ সুফল সমগ্র জাতিতে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ত। তাতে জাতি বলবান্ হ'ত, শক্তিমান হ'ত, ধৃতিশালী হ'ত। আপনি বল্ছেন,—হুজুগ চলেছে। বড়ই দুঃখের কথা, হুজুগ ত' দূরের কথা, একমাত্র স্তুতিগান ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না। মহাপুরুষদের দেবত্বমণ্ডিত চরিত্রের স্তুতিগানে নিজের ভিতরে মহত্ত্ব আসে, মহান্ হবার চেষ্টা আসে, আত্ম-অবিশ্বাস

দূরে যায়, শৌর্য্য, সাহস ও সবলতা সঞ্চারিত হয়। এই শুভফল জাতির জীবনে ফুটুক, এই অভিপ্রায়েই শ্রীভগবান্ এই দুঃস্থ দেশে এই পরম দুঃসময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের মত মহাপুরুষকে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং ছেলেদের মধ্যে হুজুগ যদি আস্‌ত, তাহ'লে ত' ভগবানের সুমঙ্গল অভিপ্রায়ই পূরণ হ'ত। আপনি তাতে আফ-শোষ করেন কেন?

বিবাহ করিয়া পবিত্র থাকার সঙ্কল্পের পরোক্ষ সুফল

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যুবকেরা যদি এই জেদ ধরে যে, বিয়ে কর্ব্বে কিন্তু স্ত্রী-সঙ্গ কর্ব্বে না, তা হ'লে প্রত্যেকেই যে সে জেদ শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা কত্তে পার্ব্বে, তা' নয়। কেউ কেউ পার্ব্বে, কেউ কেউ পার্ব্বে না। কারো কারো পক্ষে পারার প্রয়োজন নেই ব'লেও পার্ব্বে না। সবাই যে শুধু অসামর্থ্য-হেতুই ব্রতে ভঙ্গ দেবে, তা' নয়। কারো কারো আমৃত্যু ব্রত-পালনের সামর্থ্য হবে, কিন্তু জগতের কুশলে তার সন্তান প্রয়োজন ব'লে সে পেরেও পার্‌তে অনিচ্ছুক হবে। কিন্তু গোড়ায় একটা জেদ ধরার প্রথম সুফল হবে এই যে, বিয়ের আগ পর্য্যন্ত সে রিপুর উত্তে-জনা-জনক অবস্থা থেকে নিজেকে প্রাণপণে রক্ষা করার চেষ্টা কর্ব্বে। দ্বিতীয় সুফল এই হবে যে, অনেক মূর্খেরা যেমন বিয়ের রাত্রেতেই স্ত্রীর কৌমার্য্য-ভঙ্গে উদ্যত হয়, এক্ষেত্রে তা' ঘট্‌বে না, দু'চার বছর সংসর্গ-বিরতির সুযোগ পেয়ে স্ত্রী-গুলির দেহের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্ভব হবে। তৃতীয় সুফল এই হবে যে, সংযম-রক্ষণেচ্ছু স্বামী নিজ ব্রতরক্ষার সৌকর্য্য বিধানের জন্যই স্ত্রীকে উচ্চ উচ্চ চিন্তার সঙ্গে পরিচিতা ক'রে দেবার জন্য যে ধারাবাহিক চেষ্টা কর্ব্বে, তাতে তার অপূর্ণ শিক্ষার আংশিক পূর্ণতা হবে। চতুর্থ সুফল এই হবে যে, গোড়া থেকেই দেহ-সংসর্গ-মূলক ঘনিষ্ঠতা না হওয়াতে একজনের প্রতি আর একজনের ভালবাসা এত শ্রদ্ধা-বিমিশ্রিত হবে যে, পরবর্ত্তী কালে তার জীবনব্যাপী সুফল এদের উপরে বিরাজ কর্ব্বে। সর্ব্বশেষ সুফল এই হবে যে, স্ত্রী ও স্বামী সন্তান হবার পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক বছর রুচিসাম্য, প্রকৃতিসাম্য প্রভৃতির চেষ্টায় যে সকল সুমহৎ তত্ত্বের

আলোচনা কর্ব্বে, তার প্রভাব ভাবী সন্তানের মস্তিষ্কে ও শরীরে পড়্বেই পড়্বে। সুতরাং দেখ্তে পাচ্ছেন যে, ছেলেদের মধ্যে একটা হুজুগ এসে পড়্লে তার পরোক্ষ ফল খারাপ না হ'য়ে ভালোই হ'ত।

পরনারীলুব্ধের প্রতি উপদেশ

রাত্রি হইতেছে দেখিয়া শ্রীশ্রীবাবার আদেশে সকলেই অতঃপর প্রস্থান করিলেন। কিন্তু একটি যুবক বসিয়া রহিলেন। জিজ্ঞাসায় শ্রীশ্রীবাবা জানিলেন যে তাঁকে এমন উপদেশ দেওয়া প্রয়োজন, যাহা অপরের সমক্ষে দেওয়া চলে না।

এই উপদেশের সারমর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। নিম্নে তাহা সন্নিবিষ্ট হইল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—"শত বিপত্তি সত্ত্বেও তুমি নিশ্চিত উন্নতি লাভ কর্ব্বে। কিন্তু এজন্য সস্ত্রীক সাধন দরকার হবে। উভয়ের সাধনের দ্বারা উভয়কে শক্তি-লাভ কত্তে হবে। এখন তুমি নির্ভয়ে নামে নিবিষ্ট হও এবং স্ত্রীকে ধর্ম্মপথে টেনে আন্বার জন্যে প্রাণপণে যত্ন লও। একই প্রণালীতে দুজনকে চল্তে হবে। ভোগে ভগবানকে পাবার বাধা হয় না, বাধা হয় ভোগের অতৃপ্তিতে। তোমার চিত্ত ভোগ চাচ্ছে, সুতরাং ভোগে তোমার অধিকার আছে। ভোগ এখানে তোমার স্বধর্ম্ম। এখানে ভোগে তোমার পাপ নেই। কিন্তু চাই অতৃপ্তিহীন ভোগ, চাই নিরনুতাপ ভোগ। যেভাবে এতকাল ভোগ ক'রে আস্‌ছ, তাতে ভোগের তৃপ্তি পাওনি, শুধু অতৃপ্তিই পেয়েছ, দুর্ভোগেই জ্বলে পুড়ে মরেছ। চিত্ত যখন ভোগ চায়, তখন ভোগ তোমাকে ক'রে নিতে হবে,—কিন্তু এমন সুকৌশলে, যেন আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি মিলে, যেন দুর্ভোগ না হয়। সেই কৌশলটীর প্রথম ধাপ হচ্ছে একনিষ্ঠ ভোগ। তোমার সকল ভোগ-বুদ্ধিকে একটী স্থানে কেন্দ্রীকৃত কর। ঐ একটী স্থান ছাড়া অন্যত্র ভোগবুদ্ধি যেতে চাইলে মনকে ফিরিয়ে আন্বে। ভোগবাদের নিন্দা ক'রে তোমার ভোগ-জয় হবে না। সে পন্থা অন্যের জন্য, বৈরাগ্যমুখী সাধকের জন্য, তোমার জন্য নয়। তোমাকে প্রকৃত

ভোগী হবার জন্যই চেষ্টা কত্তে হবে এবং কথাটা শুন্‌তে যতই কুৎসিত হোক্ না,—তোমার সকল ভোগের কেন্দ্র হবেন, তোমার স্ত্রী, আর কেউ নন। সকল ভোগে যখন তাঁকে চাইতে পার্ব্বে, তখনই তিনি তোমার সকল ত্যাগের সঙ্গিনী হবেন। দেহের ভোগই যথেষ্ট নয়, মনের ভোগই সব কথা। মনকে ঐ একটী বিগ্রহে কেন্দ্রীকৃত কর, এইরূপেই তোমার বিলাসী মন পরনারীর প্রতি কুদৃষ্টি ত্যাগ কর্ব্বে।

"দ্বিতীয় ধাপও বল্‌ছি। তোমার চক্ষু রূপ দেখতে চায়,—রূপই চায়, অস্থি মাংস চায় না। রূপটাই তার সত্যিকার পিপাসা। কিন্তু কি ক'রে যে রূপটাকে ভোগ কত্তে হয়, তা' জান না ব'লে, আনাড়ীর মত কাজ ক'রে ফেল। রূপ-ভোগ কর্ব্বার জন্যে—দেহের ভোগের দরকার করে না, রূপের ধ্যানের দরকার করে। সুখের জন্য রক্তমাংসের সঙ্গের প্রয়োজন পড়ে না, সুখের ধ্যানের প্রয়োজন পড়ে। অথচ রূপটাকে আশ্রয় ক'রে প্রকাশিত হ'য়েছে ব'লে, দেহটাকেই রূপ ব'লে বুঝে আস্‌ছ। কিন্তু রূপের প্রকৃত স্বরূপ পাবে রূপের উৎসে গিয়ে। ভগবান সকল রূপের উৎস, তিনিই সকল আকর্ষণের মূল। চক্ষু রূপ দেখ্‌তে চায়, দেখুক। কিন্তু মনে রাখ, এরূপ ভগবানের, এ আকর্ষণ ভগবানের,—বারবনিতার রূপও ভগবানের, সতী নারীর রূপও ভগবানের, কালী-দুর্গার রূপ ও ভগবানের, বুদ্ধ-চৈতন্যের রূপও ভগবানের।

"এই যে তুমি নিয়ত স্ত্রী-সঙ্গের জন্য চঞ্চল হচ্ছ, এ তৃষ্ণাটার সবটাই কিন্তু দেহ-ভোগের তৃষ্ণা নয়, মূলতঃ এটা রূপেরই তৃষ্ণা। এর মধ্যে যেটুকু দেহ-তৃষ্ণা এসে পড়েছে, সেইটুকু তোমার নিয়ত কদাসক্তির ফল। মুখ্য তৃষ্ণাটা রূপেরই তৃষ্ণা। যে রূপটা দেহের উপরে ভেসে বেড়াচ্ছে, সেটা যে ঐ নারীর অন্তরেও আছে, শতগুণ অধিক পরিমাণে আছে, তোমার অজ্ঞাতসারে তা' তুমি জান্‌তে পাচ্ছ না ব'লেই তাঁর প্রতি তোমার এ তীব্র আকর্ষণ। তুমি চাচ্ছ তাঁর ভিতরে ও বাইরের প্রতি পরমাণুতে প্রবেশ ক'রে তাঁর অফুরন্ত রূপকে সম্যক্ সম্ভোগ কত্তে; কিন্তু প্রণালী জান না ব'লে দেহের সাথে দেহকে মিলাচ্ছ, দেহ দিয়ে

দেহের ভিতরে প্রবেশ কত্তে চেষ্টা পাচ্ছ, শুধু দুর্ভোগই বাড়াচ্ছ, তৃপ্তি আর পাচ্ছ না। তৃপ্তির একটা আভাস আস্‌ছে, কিন্তু তা' যে ক্ষণস্থায়ী! তোমার মিলন ত' আর চিরমিলন হচ্ছে না! যদি নারীর দেহটাই তার সর্ব্বস্ব হ'ত, তবে এ দৈহিক প্রণালীতে পূর্ণ তৃপ্তি হ'তে পাত্ত। কিন্তু নারীর প্রকৃত রূপ যে তাঁর আত্মাটাতেই প্রকাশ পাচ্ছে, তাঁর দেহের লাবণ্যকে পরাহত ক'রে কোটিগুণ লাবণ্য ঐ আত্মায় ঢল্ ঢল্ কচ্ছে, বাইরের জ্যোতিকে ম্লান ক'রে আত্মার জ্যোতি জ্বল্ জ্বল্ কচ্ছে। সেই আত্মাটীর সঙ্গে যোগ-সাধনেই তোমার সকল তৃষ্ণার প্রকৃত নিবৃত্তি; কারণ, আত্মায় আত্মায় মিলন হ'লে সম্যক্ সম্ভোগের আর কিছুই বাকী থাকে না, এমন কি দেহের মিলন আদৌ না হ'লেও না। প্রথম সময়ে ধর্ম্মপত্নী তোমার ভোগের বিগ্রহ মাত্র, কিন্তু একমাত্র বিগ্রহ, অদ্বিতীয় বিগ্রহ; পরন্তু এই সময়ে তিনি তোমার পরমা-তৃপ্তিদাত্রী বা আত্মানন্দ-বিধায়িনী।

"ভোগে তৃষ্ণা মেটে না, সম্ভোগে মেটে। সম্ভোগ মানে সম্যক্ ভোগ। ইক্ষু খেয়ে ছিব্‌ড়া ফেলে দিলে যদি পিঁপড়ে তাকে ধরে, তবে তার নাম ভোগ। আর, পিঁপ্‌ড়ের মত সূক্ষ্মগ্রাহীও যদি ঐ ছিব্‌ড়েতে এককণা চিনি না পায়, তবে তার নাম সম্ভোগ। ভোগ আর সম্ভোগ এক কথা নয়। যে নারী তোমার ভোগসঙ্গিনী, তাঁর প্রতি তোমার ব্যবহার যদি ভোগ ছাড়া আর কিছু না হয়, তবে জেনো, সূক্ষ্মগ্রাহী পিপীলিকা তাঁর দিকে প্রলুব্ধ হবার যোগ্য কারণ পাবে। আর, এটা যদি ভোগ না হয়ে সম্ভোগ হয়, তবে জেনো, সূক্ষ্মগ্রাহী পিপীলিকাও দেখ্‌বে কিছু নাই, সব নিশ্চিহ্ন। কারণ, সম্যক্ ভোগে ভোক্তাও চিরকৃতার্থ, ভুক্তও চিরকৃতার্থ, যেহেতু ভোগে দুই থাকে, সম্ভোগে দুই থাকে না, দুই মিলে এক হয়, অভিন্ন সত্ত্বায় পরিণত হয়, দ্বিত্ব মুছে যায়, একত্বই জাজ্বল্যমানভাবে বিরাজ করে। এটা ভোগবাদের চরম কথা, যে কথা ইয়োরোপ জানে না!

"ভোগ ক্ষণস্থায়ী, সম্ভোগ চিরস্থায়ী। ভোগ ক্রীতদাসের মত অন্ধ-তাড়নাতে বশীভূত; সম্ভোগকারী মনে রাখে, তার ভোগেচ্ছার পশ্চাতে

ভগবানের ইচ্ছা আছে, তার ভোগচেষ্টার পশ্চাতে ভগবানের চেষ্টা আছে, তার ভোগবুদ্ধির পশ্চাতে ভগবানের বুদ্ধি আছে। সম্ভোগকারী জানে, ভোগে দেহের যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির ব্যবহার হয়, মনের যে বৃত্তিগুলির অনুশীলন হয়, তার মধ্যেও ভগবান্ আছেন। সে জানে, ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়গুলি কিম্বা মন যে ভূমিতে পতিত হচ্ছে, তাতেও ভগবান্ আছেন। শিবলিঙ্গের পূজা আর কামাখ্যার মন্দিরে যোনিপীঠের পূজা কথাটার মানে এই দৃষ্টি দিয়ে বুঝ্‌তে হবে। —অবশ্য, এটা ভোগবাদের মধ্যপথের কথা।"

কলিকাতা,
১০ই আষাঢ়, ১৩৩৬

প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার কথা উঠিয়াছে। সমাগত প্রত্যেক যুবক নিজ নিজ মতামত বিনিময় করিতেছেন। যুবকদের আলোচনা মন্দীভূত হইলে শ্রীশ্রীবাবা বাঙ নিষ্পত্তি করিলেন।

গঙ্গা-গোদাবরীর দেশে প্রাদেশিকতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দেখ, এ দেশের যজ্ঞসূত্রধারী প্রত্যেক ব্যক্তি সন্ধ্যা-মন্ত্র পাঠের কালে দৈনিক তিনবার ক'রে আবাহন করে,—"ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি, নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন সন্নিধিং কুরু,—এই যে আমি আমার অজ্ঞাতপল্লীর পুকুর ঘাটের জলের কণা মাথায় ছিটিয়ে এখনি মন্ত্রপাঠ করব—'হে কূপের জল, হে নদীর জল, হে সমুদ্রের জল আমাকে পবিত্র কর—পুনাতুং মাং'—সেই জলটুকুর মধ্যে হে গঙ্গা, হে যমুনা, হে গোদাবরী, হে সরস্বতী, হে নর্ম্মদা, হে সিন্ধু, হে কাবেরী, এস তোমরা সবাই এস, এসে এরই মধ্যে সূক্ষ্ম সত্তায় বিরাজ কর।" এই ক্ষুদ্র গ্রাম্য পুকুরের মাঝে, এই ক্ষুদ্র পল্লীকূপের এক লোটা জলের মাঝে, এই অনাদৃত পল্লীর স্রোতোহীন এই খালের মাঝে, সমগ্র অন্তর দিয়ে সে আবাহন করে গঙ্গার খরস্রোত, যমুনার নীরব উজান, গোদাবরীর কল-কল্লোল। যে দেশে সন্ধ্যা-মন্ত্র পাঠ কত্তে ব'সে ভারতের সকল

স্থানের সকল নদীর পবিত্র বারি মনে মনে নিজ শিরে বর্ষণ কর্ত্তে হয়, সে দেশে প্রাদেশিকতা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার।

একাত্ম-পীঠের দেশে প্রাদেশিকতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এদেশের অতীত ঐতিহ্যও প্রাদেশিকতা সৃষ্টির বিরোধী। পতিনিন্দা শ্রবণে দক্ষ-কন্যা সতী দেহত্যাগ কর্লেন হিমালয়ের পাদ-দেশে কনখলে, শোকার্ত্ত মহেশ্বর সেই পবিত্র সতীদেহ স্কন্ধে ক'রে ভুবন মথিত ক'রে বেড়ালেন। এক এক জায়গায় সতীদেহের এক একটী অঙ্গ স্খলিত হ'য়ে পড়্ল, আর এক একটী তীর্থ সৃষ্ট হ'ল। এই তীর্থ শুধু সেই স্থানের কতকগুলি লোকের বাৎসরিক একটা মেলা জমাবার তীর্থ নয়, নিখিল ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্ববর্ণের হিন্দুর সমভাবে আদরণীয় মহাতীর্থ হ'ল। একই সতীর দেহকে অবলম্বন ক'রে ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তে কামরূপে হ'ল কামাখ্যা, চট্টলে হ'ল চন্দ্রনাথ, আবার ভারতের পশ্চিম প্রান্তে জলন্ধরে হ'ল জ্বালামুখী, দ্বারকায় হ'ল প্রভাস। কোথায় কর্ণাট দেশে জয়দুর্গা-তীর্থ, কোথায় গোদাবরী তীরে বিশ্বেশী-তীর্থ, আর কোথায় খাশিয়া পাহাড়ে জয়ন্তী-তীর্থ, আর কোথায় নেপালে মহামায়া-তীর্থ; কোথায় জনকপুরে মিথিলা-পীঠ আর কোথায় উড়িষ্যা দেশে বিরজা-ক্ষেত্র। সতীর একটা দেহ বৃন্দাবনের উমাতীর্থ থেকে বগুড়ার করতোয়া তীর্থ পর্য্যন্ত, দেওঘরের জয়দুর্গা-পীঠ থেকে ত্রিপুরার উদয়পুর পর্য্যন্ত, কাটোয়ার বহুলা-তীর্থ থেকে শ্রীহট্টের শ্রীশৈল পর্য্যন্ত সব যেন একটী সূতায় বেঁধে দিয়ে গেছে। ভারতকে যে প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে কেটে কেটে টুকুরো ক'রে পৃথক্ ক'রে দেওয়া যায় না, সতীর আত্মত্যাগের ভিতর দিয়ে চিরস্থায়ীরূপে সেই নীতি মাতৃ-সাধক ভক্তগণের মধ্যে সু-স্বীকৃত হ'য়ে গিয়েছে। এই জন্যও প্রাদেশিকতা এদেশে এক অস্বাভাবিক ব্যাপার।

প্রাদেশিকতা-বিষের দুশ্চিকিৎস্য লক্ষণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তথাপি প্রাদেশিকতা ক্রমশঃ যেন বিপজ্জনক ব্যাধির

মত এক এক প্রদেশবাসীদের ভিতরে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ কচ্ছে। হাঁড়ীর দু' একটা চাল টিপ্‌লে যেমন বুঝা যায় যে, সবগুলি চাল কতটা সিদ্ধ হ'ল, প্রদেশের নেতৃ-স্থানীয় দু'একজন বিশাল পুরুষের চরিত্র থেকেও তেমন অনেক সময় বুঝ্‌তে পারা যায় যে, এই প্রদেশবাসী সাধারণ লোকদের ভিতরে সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতার প্রকৃত মূর্ত্তি কি? সর্ব্বত্যাগী ব'লে যাঁকে ভারত জু'ড়ে পূজার অর্ঘ্য দিচ্ছ, তাঁর ভিতরে যদি দেখা যায় যে, প্রতিবেশী এক প্রদেশের প্রতি ন্যায় বিচার কর্ব্বার রুচি বা প্রবৃত্তি নেই, সত্যের একনিষ্ঠ সাধক ব'লে যাঁর নামে কলকণ্ঠে জয়োচ্চারণ কচ্ছ, তাঁর উপরে সুবিচারের প্রত্যাশায় কলহ-নিষ্পত্তির ভার দিলে যদি দেখা যায় যে, মিথ্যাকে সত্য ব'লে রায় লিখ্‌তে কুযুক্তির অভাব হয় না, প্রকৃত সত্যকে চাপা দিয়ে রেখে একটা বাজে কথাকে প্রধান ক'রে ধর্‌তে কলম কাঁপে না কিম্বা বিচারকে বিলম্বিত ক'রে কালহরণ কত্তে বিবেকে বাঁধে না, তা হ'লে বুঝবে, এই বাঁশের একটা পাবেই যে ঘূণে ধ'রেছে তা' নয়, এ বাঁশের পর্ব্বে পর্ব্বে ঘূণ, এ ঝাড়ের সবগুলি বাঁশেই ঘূণ। প্রাদেশিক স্বার্থপরতার বিষে মন যখন কোনও প্রদেশের এইরূপ অত্যধিক বিষাক্ত, তখন তার চিকিৎসা ও বিষাপসরণ সহজ-সাধ্য নয়।

ভারতের ঐতিহ্য চিরস্থায়ী

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু ভারতের প্রত্যেক নরনারী তোমার পিতা, তোমার মাতা, তোমার ভ্রাতা, তোমার ভগ্নী, তোমার পুত্র, তোমার কন্যা। বিকারের বিষে তার মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন ব'লেই কি তুমি তাকে ঘৃণা কর্ব্বে, না, পরিত্যাগ কর্ব্বে? যে-কোনো উপায়ে হোক, তার ব্যাধির উপশমার্থে তোমাকে প্রাণান্ত কত্তে হবে। প্রদেশের সীমা ত' দু'দিনের সৃষ্টি। কিন্তু ঐ প্রদেশ-বাসীদের সঙ্গে তোমাদের যে প্রাণের সম্বন্ধ, তা' ত' আজ সহস্র শতাব্দীর। একটী সামান্য রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনার ফলে প্রদেশের সীমারেখা একদিক থেকে আর একদিকে স'রে যেতে পারে, এমন কি নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে যেতে পারে। কিন্তু

ভারতের এক প্রান্তের লোকের সাথে অন্য প্রান্তের লোকের যে শতযুগবাহিত দেহ-মন-আত্মার সম্বন্ধ, তা ত' আর কর্পূরের মত উবে যাবার জিনিষ নয়। এ সম্বন্ধ জলের তিলক নয় যে, চখের পলকে মুছে যাবে। এ সম্বন্ধের সলিল হৃদয়ের পরতে পরতে গোত্র-প্রতিষ্ঠাতা ঋষিদের জমাট-বাঁধা হৃদয়-রক্ত দিয়ে স্থায়িভাবে লিখিত। রাজনৈতিক বিবর্ত্তন, রাষ্ট্রবিপ্লব, স্বার্থান্বেষীর চাতুর্য্য, জিগীষুর উদ্ধত অহমিকা নানা সময়ে প্রাদেশিক সীমারেখার নানাবিধ ভাগ্য-নির্ণয় কত্তে পারে, কিন্তু ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রচ্ছন্নভাবে পরিব্যাপ্ত যে সংস্কৃতির ঐক্যবোধ, তাকে খণ্ডিত কর্ব্বে কে? সে সাধ্য কার আছে? যদু, ভরত, পুরু প্রভৃতি নানা শাখায় বিভক্ত আর্য্য ক্ষত্রিয় যখন মগধ থেকে পুরুষপুর পর্য্যন্ত রাজত্ব প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন, সেদিন তাঁদের ভিতরে রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। কিন্তু সংস্কৃতির ঐক্য কখনো বিনাশ পায় নি। সাত্বত-বংশীয়-ভোজ-নামক রাজারা যখন দাক্ষিণাত্যে বিদর্ভ ও দণ্ডক রাজ্য স্থাপন করেন, তখন পুলিন্দ, শবর, অন্ধ্র, কলিঙ্গ প্রভৃতি অনার্য্যগণ তাঁদের প্রতিবেশী। প্রথমে এই প্রতিবেশীরা ছিলেন পর, কিন্তু সংস্কৃতির আদান-প্রদানের ভিতর দিয়ে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে চিরস্থায়ী প্রাণের যোগ স্থাপিত হয়েছিল। কোনও রাষ্ট্রনৈতিক দুর্ভাগ্য কিম্বা কোনও কৃত্রিম প্রাদেশিক সীমারেখাই সে যোগকে বিচ্ছিন্ন কত্তে সমর্থ হবে না। সম্রাট কনিষ্ক যখন সিংহাসনে আরোহণ কর্লেন, তখন তাঁর সমদর্শী শাসন-নীতির গুণে কাবুল ও কাশ্মীর থেকে সুরু ক'রে কাশী পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডে ব্রহ্মদর্শী ব্রাহ্মণ আর মৈত্রী-সিদ্ধ বৌদ্ধ এই দুইয়ের ভিতরে যে ভাবের আদান-প্রদান ঘটেছিল, তাতেই ভারতীয় ঐক্যের মূল দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হ'ল। সমুদ্রগুপ্ত যখন নেপাল, কামরূপ, সমতট *, পাঞ্জাব, রাজপুতানা এবং দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ কোশল ও কাঞ্চীর উপরে তাঁর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তখন যুদ্ধ হয়েছিল রাজায় রাজায়, কিন্তু প্রজারা একে অন্যের সংস্কৃতির সাথে আদান-প্রদান ক'রে কৃষ্টি-সমৃদ্ধ পুণ্যময় ভারত-বৃক্ষের মূলকে চতুর্দ্দিকে সুপ্রসারিত

---

* পূর্ব্ববঙ্গ

করেছিল। সেই সুপ্রসারিত-মূল মহাবৃক্ষের পতন কোনো রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনার দ্বারাই সম্ভব করা যাবে না। গুপ্তোত্তর যুগে ভবভূতি, রাজশেখর, কৃষ্ণমিশ্র, ভর্ত্তৃহরি, জয়দেব, সুবন্ধু, বাণভট্ট, দণ্ডী, কহ্লন, বিহ্লন, সন্ধ্যাকর নন্দী, শঙ্করাচার্য্য, বাগভট, চক্রপাণি, রামানুজ, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতির আবির্ভাব নিখিল ভারতকে ঐক্যমূলক সংস্কৃতির রজ্জুতে দৃঢ়-বন্ধন কর্ল্লে। সমুদ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত রাজনৈতিক অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত অশ্বমেধ কর্ল্লেন,—শঙ্করাচার্য্য। কাশ্মীর থেকে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর † পর্য্যন্ত ধর্ম্মের যে দিগ্বিজয় তিনি ক'রে গেলেন, তার প্রভাব সহস্র বন্যার জল-কল্লোলেও কখনো ভেসে যাবে না। আচার্য্য শঙ্কর আসমুদ্র হিমাচল পদব্রজে ভ্রমণ ক'রে বেদান্ত-বাণী উদ্গীরণ কত্তে কত্তে যেন আমাদের জন্য এই কথাই ব'লে গেলেন,—"হে ভারত তুমি এক, অখণ্ড, অবিভাজ্য।" এর পরে বন্যা সত্য সত্যই এল। আরবের ক্ষাত্রশক্তি মহম্মদ বিন কাসিমকে নেতা ক'রে সিন্ধুদেশ জয় কর্ল্লে। আড়াই শ' বছর পার না হ'তে জয়পালের হাত থেকে আফ্‌গানিস্থানের পূর্ব্বাংশ এবং সিন্ধুনদের পশ্চিম তীর কেড়ে নিলেন তুর্কী-বীর সুবুক্তিগিন। তাঁর পুত্র সুলতান মামুদ ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে কিঞ্চিদধিক সিকি শতাব্দী জু'ড়ে আক্রমণ আর লুণ্ঠন চালাতে লাগ্‌লেন। সুকৌশলী মামুদ একজন হিন্দুকে অন্যতম সেনাপতি ক'রে নিলেন, বহু হিন্দু যোদ্ধাকে নিজ সৈন্যদলে ভুক্ত কর্‌লেন। কিন্তু প্রধানতঃ তাঁর বাহিনী মুসলমান সৈন্যেই রচিত ছিল। হিন্দু রাজাদের ভিতরে ছিল ঐক্যের অভাব, আর মুসলমান যোদ্ধাদের ভিতরে ছিল ধারণা যে, হিন্দুদের নিহত কর্ল্লে এবং হিন্দুমন্দির ধ্বংস কর্ল্লে ইস্‌লামের গৌরব বৃদ্ধি হবে এবং বেহেস্তে যাবার পথ খুলে যাবে। ঠিক যেন সেই গীতার কথা,—"হতো বা পাপ্সসে স্বর্গম্, জিত্বা বা ভুক্ষসে মহীম্, মর্‌লে যাবে স্বর্গে, জিতলে পাবে বসুন্ধরার ভোগ্য রত্নরাজি।" প্রায় পৌনে দু'শ বছর পরে এলেন মুহজউদ্দিন মহম্মদ ঘোরী। পৃথ্বীরাজের হাত থেকে দিল্লীর ও আজমীড়ের রাজদণ্ড খসে পড়্‌ল, এক বছরের মধ্যে কনৌজের সিংহাসন জয়চন্দ্রের

---

† আসাম

হাত থেকে সরে গেল এবং কিছুদিন পরে গুজরাট, কালিঞ্জর ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে হিন্দুরাজবংশ লুপ্ত হ'ল। এলেন তুর্কী এবং আফগান সম্রাটেরা। গ্রীক, হূণ প্রভৃতি বৈদেশিক আক্রমণকারিগণ ভারতবর্ষে বাস ক'রে ক্রমশঃ ভারতের ধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলেন,—যেই ধর্ম্মের শিক্ষা ছিল, ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সবটাই তীর্থভূমি বা আধ্যাত্মিকতার লীলাক্ষেত্র, হিমালয় দেবতাত্মা, গঙ্গা পূতবারিপ্রবাহিনী, যমুনা শাশ্বত বংশীবাদনের প্রেমহিল্লোল, কাশী, মথুরা, বুদ্ধগয়া নিখিল ভুবনের তাপ-দাহ বিদূরণ-যজ্ঞের হোমবেদী। কিন্তু এবারকার নবাগতেরা এদেশের ধর্ম্ম গ্রহণ না ক'রে নিজেদের ধর্ম্ম প্রচার কত্তে চেষ্টা করলেন। যেখানে এই চেষ্টা প্রকৃত সাধক ও তপস্বী পুরুষের মানবপ্রীতি হ'তে উদ্ভূত হ'ল, সেখানে ধর্ম্মান্তর সত্ত্বেও ভারকেন্দ্র বেসামাল হ'ল না। কিন্তু প্রলোভন আর অত্যাচারকে যেখানে ধর্ম্ম-প্রচারের উপায় রূপে গ্রহণ করা হ'ল, সেখানে পূর্ব্ব এশিয়া আর পশ্চিম এশিয়ার দুই কৃষ্টিতে দ্বন্দ্ব সুরু হ'ল। আলাউদ্দীন খল্‌জী হিন্দুকে ধন-সঞ্চয়ের অধিকার থেকে বঞ্চিত কর্ল্লেন, হিন্দুদের গাড়ীতে চড়া, পাল্কীতে উঠা নিষিদ্ধ কর্ল্লেন। তাঁর রাজত্বে এমন অবস্থা হ'ল যে, সম্ভ্রান্ত হিন্দু-পরিবারের মহিলারা জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য মুসলমানের গৃহে দাসী-বৃত্তি কত্তে বাধ্য হতেন। ফিরুজ শাহ্ তুঘলুক্ ব্রাহ্মণদিগকে জিজিয়া কর দিতে বাধ্য কর্ল্লেন এবং একজন ব্রাহ্মণকে জীবন্ত অবস্থায় দগ্ধ ক'রে মার্ল্লেন। কিন্তু তুমি যদি কল্‌মা প'ড়ে মুসলমান হয়ে যাও, তবে আর-ভাবনা নেই। উচ্চ রাজকার্য্য পাওয়ার আর কোনো বাধা হবে না, যদি যোগ্যতা কিছু থাকে তবে তখন তোমার সে যোগ্যতার উপযুক্ত সমাদর হবে, তখন আর তোমাকে জিজিয়া কর দিতে হবে না, গাড়ীতে চড়্‌তে পাল্কীতে উঠতে কেউ বাধা দেবে না। ফলে দলে দলে লোক ইস্‌লাম ধর্ম্মের সার কি, অসারই বা কি, তার বিচার কর্ব্বার জন্য প্রতীক্ষা না ক'রে, কেউ মান বাঁচাবার জন্য, কেউ প্রাণ বাঁচাবার জন্য, কেউ রুটীর টুক্‌রার জন্য ভিন্ন ধর্ম্ম গ্রহণ কত্তে লাগলেন। এই ভারতেই তোমার জন্ম, তোমার পিতৃপুরুষের জন্ম, এই ভারতবর্ষই তোমার ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের হবেন চিরকালের লীলাভূমি, এই কথা

চেষ্টা ক'রে বিস্মৃত হবার জন্য কত দনুজমর্দ্দনের পুত্র জালালুদ্দিন নাম ধারণ ক'রে আরবকে কর্ল্লেন মাতৃভূমি, তার স্থিরতা নেই। শত শত রাষ্ট্রে খণ্ডিত হ'য়েও যে ভারতের আধ্যাত্মিক ঐক্য সম্পূর্ণ অটুট ছিল,—রাজায় রাজায় লড়াই চলত, দিগ্বিজয় হ'ত, অশ্বমেধ যজ্ঞ হ'ত, তবু প্রজায় প্রজায় প্রাণের যোগ বিচ্ছিন্ন হ'ত না,—এই ছিল যেই ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য, সেই ভারতে এই সুরু হ'ল আন্তরিক ঐক্যের ভাঙ্গন। কিন্তু ভারত-প্রতিভা চুপ ক'রে ব'সে থাকেনি, প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত অপরাধীর ন্যায় নিষ্ক্রিয় হ'য়ে নিজের অপমৃত্যুর বিধি-ব্যবস্থাগুলিকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেনি। ভারতের মনীষী লক্ষ্য কর্‌লেন যে, যেখানে অত্যাচার বা প্রলোভনের মধ্য দিয়ে প্রচারিত হচ্ছে না, সেখানে এই নবাগত ধর্ম্ম একটা বিষয়ে দুর্জ্জেয়। সেইটী হচ্ছে, জাতিভেদ-বর্জ্জিত সমাজ-ব্যবস্থা, যা একদা আর্য্যদেরও ছিল, কিন্তু আজ যা' সিন্ধু-প্রবাহের জল-কল্লোলে ভেসে সমুদ্রের মাঝে ডুবে গেছে। সুতরাং কমঠ-নীতি অবলম্বন ক'রে একদিকে যেমন মুসলমান-সংস্পর্শ থেকে হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজকে বাঁচাবার জন্য ভট্ট-রঘুনন্দন প্রমুখ স্মৃতি-শাস্ত্রকারেরা বহু কঠোর নিয়মের প্রবর্ত্তন কর্ল্লেন, অপর দিকে তেমন রামোপাসক স্বামী রামানন্দ উত্তর ভারতের নানা স্থানে প্রচার কর্ত্তে লাগলেন,—"রামোপাসকের জাতিভেদ নেই।" শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হ'য়ে বাংলা ও উড়িষ্যায় প্রচার কর্ল্লেন,—"বৈষ্ণবে যে জাতিবুদ্ধি করে, সে ভগবৎকৃপা লাভের অযোগ্য।" কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও বৃন্দাবন দাস প্রভৃতির রচনা থেকে সুস্পষ্ট এই ধারণাই জন্মে। নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণের সন্তান হ'য়েও সুবর্ণবণিক উদ্ধারণ দত্তের হস্তে পক্কান্ন গ্রহণ কর্ল্লেন, চৈতন্যদেব মুসলমানের ছেলেকে এনে শিষ্য ক'রে ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাস ঠাকুরে পরিণত কর্ল্লেন, অদ্বৈতাচার্য্য পিতৃশ্রাদ্ধের পাত্র এই হরিদাসকেই অর্পণ কর্ল্লেন। এখনকার অনেক বৈষ্ণব জাতিভেদের গোঁড়া সমর্থক হ'লেও এসব দেখে মনে হয় যে, প্রেমভক্তি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জাতিভেদেরও জড় মারতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু রামানন্দ বা চৈতন্য প্রধানতঃ ত্যাগীর সমাজ গড়েছিলেন, গৃহীর সমাজ নয়। নিত্যানন্দ বা

শ্রীবাসাচার্য্য যে গৃহী বৈষ্ণব, সেটা তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজের সাধারণ নিয়মের যেন একটা ব্যতিক্রম। শ্রীরূপ সংসারত্যাগী, সনাতন সংসারত্যাগী, স্বরূপ দামোদর সংসার ত্যাগী, দাস রঘুনাথ সংসারত্যাগী, নরোত্তম দাস সংসার-ত্যাগী। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম যেন শ্রীকৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে সর্ব্বস্বত্যাগী একদল সন্ন্যাসীরই ধর্ম্ম,—মাত্র মতবাদেই তফাৎ, নইলে এক একজন বৈষ্ণব ঠাকুর যেন এক একজন হস্তামলক, সুরেশ্বর, পদ্মপাদ বা তোটকাচার্য্য। সুতরাং জাতিভেদ-বুদ্ধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রেও তার স্থায়ী ফল আর কি হ'ল? কিন্তু মহারাষ্ট্রের একনাথ স্বামী গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালনেরই অধিকতর পক্ষপাতী ছিলেন। গৃহীদের মধ্যে থেকেই জাতিভেদ দূর ক'রে দেওয়ার জন্য তিনি ব্রতী হ'লেন। ধর্ম্মের আমোঘ আকর্ষণে দলে দলে অস্পৃশ্য জাতি তাঁর চরণ-সমীপে এসে উপনীত হ'ল, তিনি তাঁদের জাতিভেদবুদ্ধি দূর কর্লেন, কিন্তু গৃহস্থই থাকৃতে দিলেন। পাঞ্জাবে এক ক্ষত্রিয় বণিকের গৃহে আবির্ভূত হ'লেন গুরু নানক। গৃহস্থাশ্রমের প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম ক'রে তিনি পুত্র-কলত্রাদি সহ অনাসক্ত সংসারীর জীবন যাপন কর্ত্তে লাগলেন এবং ধর্ম্মের বাহ্য আড়ম্বর পরিহার ক'রে কায়মনোবাক্যে ঈশ্বর-সাধনা কর্ত্তে সকলকে উপদেশ দিতে লাগলেন। তাঁর গঠিত সমাজ হ'ল গৃহীর সমাজ। হিন্দু নেই, মুসলমান নেই, যে-কেউ তাঁর শরণাপন্ন হয়, সে-ই ধর্ম্মের গুণে এক হ'য়ে যায়, ভেদাভেদ-বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়, ইরাণের মুসলমান, তুরাণের মুসলমান সব পশ্চিমাভিমুখী দৃষ্টি ত্যাগ ক'রে এই ভারতের-মাটির সন্তান হয়। মুসলমান জোলার ঘরে আবির্ভূত হ'লেন কবীর সাহেব। তাঁর গুরু রামানন্দ জাতিভেদ না মান্লেও উপদেশ দিতেন শুধু হিন্দুদের, কিন্তু ইনি হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে সকলকে শিষ্য কর্লেন। ধর্ম্মের বাহ্যিক নিয়মাবলী তিনি মান্লেন না,—"রামে আর রহিমে পার্থক্য নেই, ভাষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ মাত্র",—এই কথা ব'লে তিনি মহামিলনের ভূমি এই ভারতবর্ষে শুধু জাতিতে ঐক্য নয়, ধর্ম্মে ধর্ম্মে ঐক্য ও সম্ভ্রমের বুদ্ধি জাগরিত কর্লেন। ভারতের নিজস্ব অখণ্ডতার বোধের মাঝখানে যে একটা বিরোধের ভাব সৃষ্ট হ'তে যাচ্ছিল, তা' দেখতে না দেখতে

থেমে গেল। সকলের মনে এই বোধ ক্রমশঃ ফিরে আস্‌তে লাগল যে, যার ধর্ম্ম যাই হোক্ না কেন, ভারতবাসী প্রত্যেক জাতি প্রত্যেক জাতির আপনজন, কেউ কারো পর নয়, শত্রু নয়। সামান্য জায়গীরদারের পুত্র শেরশাহ ভারতের সম্রাটত্ব লাভ ক'রেও বুদ্ধি-বিভ্রংশে আক্রান্ত হলেন না, তিনি ইস্‌লাম-ধর্ম্মে পূর্ণ বিশ্বাসী হ'য়েও হিন্দুদের প্রতি প্রত্যাশাতীত সদ্‌ব্যবহার কত্তে লাগলেন। নিজে নিরক্ষর হ'য়েও বাদ্‌শাহ আকবর সর্ব্বধর্ম্মের ভিতরে সামঞ্জস্য খুঁজে বের কর্‌বার চেষ্টা কর্‌লেন এবং সকল ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি সমব্যবহার প্রদর্শন কর্ল্লেন। হিন্দু, মুসলমান, জৈন, পার্শী ও খ্রীষ্টান পণ্ডিতদের সাথে সমবেত হ'য়ে আক্‌বর শাহ্ "ইবাদৎ খানা"তে ধর্ম্মালোচনা কত্তে লাগ্‌লেন। হিন্দুদের উপর থেকে তীর্থ-যাত্রার কর উঠে গেল, জিজিয়া কর উঠে গেল,—সকলে অনুভব কত্তে পার্ল্ল, যে ধর্ম্মের হোক্, যে যে জাতির হোক, ভারতবর্ষের একটী মানুষ ভারতবর্ষের অপর মানুষের পর নয়, শত্রু নয়, আপন জন। আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর বাদ্‌শা জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলের পক্ষে সমান সুবিচারের পথ ক'রে দিলেন এবং হিন্দুদের প্রাণে ব্যথা লাগে দেখে রাজ্য থেকে গো-হত্যা তু'লে দিলেন। আর একবার সকলের মনে জাগ্‌ল যে, না, মুসলমানেরা হিন্দুদের পর নয়, শত্রু নয়। তুর্কী আর আফগান যুগে যে শত্রুতার তিক্ততা জন্মেছিল, মোগলযুগের মধ্যভাগে তা' যেন দূর হ'য়ে গেল। ভারতের নিজস্ব প্রেমময় স্বভাব অতীতকে ভুলে যাবার সহায়তা স্বভাবতঃই করেছিল। সাজাহান হিন্দুদের বহু প্রাচীন হিন্দু-মন্দির সমূহের ধ্বংস সাধন ক'রে নূতন মন্দির নির্ম্মাণ বন্ধ ক'রে দিলেন বটে, আওরঙ্গজেব হিন্দুর দেবমন্দির ধ্বংশ ক'রে পুনরায় জিজিয়া কর বসালেন বটে, এবং এতে হিন্দুদের মনে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টিও হ'ল, কিন্তু হিন্দুকে সার্ব্বজনীন ভাবে মুসলমান-বিদ্বেষী কত্তে পারে নি। মথুরায় জাঠগণ সশস্ত্র বিদ্রোহ কর্ল্লেন, আলোয়ার রাজ্যে নিরীহ হিন্দু-সম্প্রদায় সৎনামীরা বিদ্রোহ কর্ল্লেন, মেবার ও মারোয়ারের রাজপুতরা বিদ্রোহ কর্ল্লেন, ছত্রপতি শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাগণ বিদ্রোহ কর্ল্লেন

এবং শিবাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে বুন্দেলারাজ ছত্রসালও বিদ্রোহ কর্লেন। এ সব বিদ্রোহ অত্যাচারীর অত্যাচারের প্রতিবাদ, ধর্ম্মান্ধ গোঁড়ামির প্রতিবাদ,—মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি, হিন্দুসম্প্রদায়ের সার্ব্বজনিক বিদ্বেষ নয়। হিন্দুর প্রতি সাজাহান আর আওরঙ্গজেব যে অন্যায় ক'রেছিলেন, অন্য দেশ হ'লে তার ফলে একজন বা একদল মুসলমানের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সকল মুসলমানকেই কত্তে হ'ত। কিন্তু ভারতের ঐতিহ্য অন্য সব দেশ থেকে আলাদা। অত্যাচারী ও লাঞ্ছনাকারীর স্বজাতীয়কে ভাই ব'লে ভাব্বার শিক্ষা এদেশের বৈশিষ্ট্য। তুমি আমার উপরে অত্যাচার কত্তে পার, কিন্তু তোমার মাকে আমি আমারই মা ভাব্ব, তোমার কন্যাকে আমি আমারই কন্যা ভাব্ব। এই শিক্ষা ভারতের কবি, ভারতের দার্শনিক, ভারতের শাস্ত্রকার চিরকাল এদেশবাসীকে দিয়ে এসেছেন। সতীর কাহিনী সেই শিক্ষারই একটী Crystalised form. এই শিক্ষা ভারতবাসী তার মাতৃস্তন্য থেকে পেয়েছে। ভারতে কুরুক্ষেত্রে আছে কিন্তু কারবালা নেই। তারই জন্য দেখা গেল যে, বিজয়ী বীর শিবাজী আদর্শ হিন্দু হ'য়েও কখনো মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি অবমাননা বা বিদ্বেষ প্রদর্শন করেন নি। এই সম্বন্ধে মুসলমান লেখকেরাও তাঁর প্রশংসা না ক'রে পারেন নি। কোরাণের পুথি তাঁর হস্তগত হ'লে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি তা' ছিন্নভিন্ন করেন নি, কোনো মুসলমান অনুচরকে তা' দান করেছেন। হিন্দু বা মুসলমান কোনো জাতীয় স্ত্রীলোকের উপরেই তাঁর রাজত্বে কেউ অত্যাচার কত্তে পারে নি,—এরূপ অত্যাচার হ'লে নির্ব্বিচারে তার জন্য ব্যবস্থা হ'ত প্রাণদণ্ডের। মুল্লা আহম্মদের সুন্দরী পুত্র-বধূ বন্দিনী হলেন, শিবাজী তাঁকে মাতৃ-সম্বোধন ক'রে বস্ত্রালঙ্কারাদি সহ তাঁর শ্বশুরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্যবিপর্য্যয় দুদিনের, কিন্তু শিবাজী প্রমাণ ক'রে দিলেন যে, ভারতের সর্ব্বজনে প্রেম, ভারতের ঐতিহ্য চিরস্থায়ী। আলাউদ্দিন আর ফিরুজশাহ্ কত অত্যাচার কত্তে জানেন? সাজাহান আর আওরঙ্গজেব আর কত মন্দির ভাঙ্গতে পারেন? কিন্তু তাতে ভারত-সাধনার মূর্ত্ত বিগ্রহ শিবাজীর শিবত্ব নষ্ট হয় না। যেই মুসলমান সম্রাটদের

অধিকাংশের অত্যাচারে হিন্দুজাতি ত্রাহি-ত্রাহি রবে চীৎকার করেছে, যেই মুসলমান আমীর, ওমরাহ, নবাব, মন্সবদার ও কাজীরা হিন্দুর মান, মর্য্যাদা, সম্ভ্রম ও ইজ্জৎ অকাতরে নষ্ট ক'রেছে, তাদেরও মায়েরা শিবাজীর মা, তাদেরও ভগ্নীরা শিবাজীর ভগ্নী, তাদেরও কন্যারা শিবাজীর কন্যা, তাদেরও পুত্রবধূরা শিবাজীর পুত্রবধূ। ফলে, ক্ষাত্রশক্তির অভ্যুদয় হিন্দুকে প্রতিশোধ-পরায়ণ কত্তে পারে নি, প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ কর্ব্বার অমঙ্গলজনক প্ররোচনা দিতে পারে নি,—অতীতকে বিস্মৃত হ'য়ে বর্ত্তমানকে সুবিচার ও সদাচারের মধ্য দিয়ে সম্মানিত কত্তেই প্রেরণা দিয়েছে। এই যে অতীতের দুঃখ ভুলে যাওয়ার ক্ষমতা, তারই ফলে হিন্দু ক্ষাত্রশক্তির নবজাগরণ ছোট-বড়-নির্ব্বিশেষে সকল অহিন্দুকে পীড়ন করার নীতিতে কখনো পর্য্যবসিত হ'তে পারে নি। গুরু গোবিন্দ দলে দলে মুসলমানকে শিখ ধর্ম্মে দীক্ষিত ক'রে নিয়েছেন, কিন্তু একটী প্রাণীর উপরেও জোর-জবরদস্তি করেন নি, একজনও প্রাণের ভয়ে বা উৎপীড়ন হ'তে বাঁচবার উদ্দেশ্যে শিখ হয় নি। আওরঙ্গজেবের চ'খের সম্মুখে ছত্রসাল একটী স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপনে সমর্থ হয়েছিলেন কিন্তু একটী মুসলমান প্রজাকেও তিনি উৎপীড়িত করেন নি। মারোবাড়ের রাঠোরেরা কিম্বা মেবারের রাণা রাজসিংহ দিল্লীর বাদশাহের বিরুদ্ধে বীর-বিক্রমে যুদ্ধ ক'রেছিলেন, কিন্তু তার জন্য কোনও পথচারী নিরীহ-পথিক মুসলমানকে হত্যা ক'রে অসি কলঙ্কিত করেন নি। এই উদারতার reciproeal সুফল ফলল গিয়ে হায়দার আলির জীবনে। সামান্য অশ্বারোহী সৈনিক থেকে তিনি মহীশূরে স্বাধীন ও পরাক্রান্ত এক রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হলেন, কিন্তু তাঁর রাজ্যে হিন্দু-মুসলমানে পক্ষপাতিত্ব-দোষ এল না। তাঁর বীরপুত্র টিপু সুলতান হিন্দুর মন্দির ধ্বংশ করার পরিবর্ত্তে বরং মন্দির সংস্কারের জন্য অর্থদান কত্তেন। অর্থাৎ হ'ল কি ? না, যে দেশের লোক সহস্র সহস্র মন্দিরের ধ্বংস-কার্য্য চ'খের উপর দেখেও মসজিদ ধ্বংশ করার প্রবৃত্তিকে মনের কোণে ঠাঁই দেয় নি, সেই দেশে গোঁড়া মুসলমান স্বাভাবিক প্রেমের কাছে নিজের ধর্ম্মান্ধতাকে ডালি দিলেন। প্রতিহিংসার নয়, প্রতিপ্রেমের জয় হ'ল।

প্রাদেশিকতার বিষ দমন অসম্ভব নহে

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যে দেশের ইতিহাসের এই হচ্ছে শিক্ষা, সেই দেশে দু'দিন যাবৎ জন্ম নিয়েছে যে প্রাদেশিকতার বিষ, তাকে দূর করা কেন অসম্ভব হবে? দেখা যাচ্ছে যে, গোখ্‌রো সাপের বিষও দমিত হয়, তবে অন্য সাপের বিষকে কেন দমন করা যাবে না? যাবে। তবে, চাই সুচিকিৎসক, চাই চিকিৎসার যোগ্য ঔষধ এবং চাই চিকিৎসায় অপরিসীম ধৈর্য্যবল।

প্রাদেশিকতার চিকিৎসা ও চিকিৎসক

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু সেই সুচিকিৎসক কে? যিনি প্রত্যেক প্রদেশ-বাসীর প্রতি সমান মমত্ব-বোধ-সম্পন্ন। সেই চিকিৎসার মহৌষধ কি? স্বার্থ-বুদ্ধিহীন নিষ্কাম সেবা। বর্ত্তমান ভারতের নব-চেতনা-সম্পাদনে বাংলার রাম-মোহন, বাংলার বিবেকানন্দ, বাংলার রবীন্দ্রনাথের দান তুলনা-রহিত। অথবা আরো স্পষ্ট ভাষায় বল্‌তে গেলে বল্‌তে হবে যে, আধুনিক ভারতে সেবা-ধর্ম্মের মন্ত্রগুরু ত্যাগিরাজ বিবেকানন্দ। তিনিই সেবার-পন্থা প্রবর্ত্তক এবং পন্থা-প্রদর্শক। এই কারণেই বাঙ্গালীর ভিতর থেকেই এরূপ সেবকের দল আগে আবির্ভূত হোন্, এ দাবী স্বাভাবিক। কিন্তু কত বাঙ্গালী ত' কত প্রদেশে গেলেন, অকপট সেবাযজ্ঞে প্রাণাহুতি দিলেন ক'জন? কাশ্মীর থেকে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত বহু করদ ও মিত্র রাজ্যে বাঙ্গালী মনীষী মন্ত্রী, দেওয়ান, আইন-সচিব, ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার হ'য়ে গিয়েছেন সত্য এবং প্রায় প্রত্যেকে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয়ও দিতে পেরেছেন, কিন্তু তিনি যে সেবা-ধর্ম্মের মন্ত্রগুরু বিবেকানন্দেরই জ্ঞাতি-ভ্রাতা, তার পরিচয় কোথায় কি ভাবে রেখেছেন? সদিয়া থেকে কোয়েটা, শ্রীনগর থেকে কলম্বো, এমন স্থান নেই যেখানে খুব সম্মানিত স্থান অধিকার ক'রে দু' একজন বঙ্গ-সন্তান নেই! কিন্তু স্বকীয় যোগ্যতায় মহীশূর বা নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার কিম্বা এলাহাবাদ বা মাদ্রাজের হাইকোর্টের জজ, অথবা

কোথাও ব্যারিষ্টার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হ'তে পারাটাই এ ক্ষেত্রে বড় কথা নয়। জজ বা ব্যারিষ্টাররূপে হয়ত ভিন্ন প্রদেশে গিয়ে কোনো মান্য পদ অধিকার কত্তে না-ই পেরেছি, হয়ত সামান্য একটা বিড়ি-পাতার দোকান কিম্বা রসগোল্লার দোকান ক'রেই দিন গুজরান্ কচ্ছি, তবু আমি আমার সেবা-ধর্ম্মের ব্যাকুল আগ্রহ দিয়ে সহরের প্রত্যেকটা রাস্তার উপরে আমার অস্তিত্বের চিহ্নকে রেখে যেতে পারি। বিবেকানন্দ বাংলার সন্তান ব'লেই ভিন্ন-প্রদেশ-বাসী প্রত্যেক বাঙ্গালীর কাছে এই দাবী করার রয়েছে। কোথাও হয়ত কোনো বাঙ্গালী একক ভাবে এ দাবীর সম্মান রাখার চেষ্টা ক'রেছেন, কিন্তু ব্যাপক ভাবে এ আদর্শ সমগ্র প্রবাসী বাঙ্গালী-সমাজের মধ্যে সমাদর পায় নি। এবং পায়নি ব'লেই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিকতা-ব্যাধি আত্ম-প্রকাশ করার সুযোগও পেয়েছে। বাংলা থেকে ভিন্ন প্রদেশে গিয়ে তুমি হয়ত একটা আর্ট-কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছ। সেই প্রদেশের লোক তোমার শুধু মটর-কারের ধূলি আর ধুয়াই রাস্তায় চল্‌বার সময়ে পেল, তুমি মাসের মাইনে মাস-কাবারে গুন্‌লে আর হয় ব্যাঙ্কে জমালে, নয় অপব্যয়ে উড়ালে। এতে তোমার প্রতি সেই প্রদেশবাসীর অবিমিশ্র ঈর্ষ্যা ছাড়া আর কি জন্মাতে পারে? কিন্তু ভুল যা করার করেছ, এখন তার সংশোধন কত্তে হবে। প্রবাসে গিয়ে যে সব বাঙ্গালী দুমুঠো খাবার সংস্থান ক'রে নিয়ে এখন আর তাস পিটান বা বিলিয়ার্ড খেলা ছাড়া অন্য কোনো বাইরের বিষয়ে মনোনিবেশ কত্তে রাজি নন, অথবা নিতান্ত ধরাধরি কর্ল্লে কখনো কখনো বড় জোর একটা সাহিত্য-সম্মেলন পর্য্যন্ত ক'রেই হাঁপিয়ে পড়েন, সে সব বাঙ্গালীদের আশা তোমরা ছেড়ে দাও। তাঁদের কুণ্ঠা ও আলস্যে বঙ্গমাতার যে লজ্জা, তাকে অপনোদিত কর্ব্বার জন্যে শক্ত মেরুদণ্ড আর অকৃত্রিম ত্যাগবুদ্ধি নিয়ে তোমাদেরই সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়্‌তে হবে। হিমালয়ের পাদদেশ থেকে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত, গান্ধার থেকে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত সেবাসিদ্ধ করযুগ ভ'রে বাংলার প্রেমমাখা হৃদয়-খানাকে নিয়ে তোমাদের সর্ব্বত্র পৌছুতে হবে। সেবা তুমি বেলুচিস্থানে কোয়েট্টাকেই দাও, আর মাদ্রাজের কোয়েম্বাটোরকেই দাও, আর উড়িষ্যার কটককেই

দাও, মনে জ্ঞানে জান্‌তে হবে প্রত্যেকটী প্রাণী তোমার বঙ্গমাতারই সন্তান, এরা প্রত্যেকে তোমারই মাতা, তোমারই পিতা, তোমারই ভগ্নী, তোমারই ভ্রাতা, তোমারই কন্যা, তোমারই পুত্র। আচারের বিভিন্নতা আর ভাষার বিভিন্নতা যেন তোমার বিচারে বিভিন্নতা না আনে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, জলপ্লাবন, সাইক্লোন, ভূমিকম্প প্রভৃতি আকস্মিক উৎপাতেই শুধু নয়, অশিক্ষা, অজ্ঞানতা কুসংস্কার অস্বাস্থ্য প্রভৃতি নিত্যকারের উৎপাত প্রশমন-কল্পেও বিবেকানন্দের লক্ষ লক্ষ ভ্রাতা-ভগ্নীর ঝাঁপ দিয়ে পড়া উচিত, পড়া প্রয়োজন। এতে বাংলার সম্মান রক্ষা পাবে এবং সকল প্রদেশ থেকে প্রাদেশিকতাও যাবে। বাংলার বিপদে বিহার চুপ ক'রে থাকৃতে পারে কিন্তু বিহারের বিপদে তোমরা চুপ ক'রে থেকো না। প্রাদেশিকতার বিষকে নষ্ট করার উপায় হল এই।

জনসেবার অধিকারও একচেটিয়া নহে

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অবশ্য, মনে ক'রো না যে, জন-সেবায় বাঙ্গালীরই একচেটে অধিকার কিম্বা প্রাদেশিকতার বিষ নির্ম্মূল করার জন্য যদি বাঙ্গালী অগ্রসর না হয়, তাহলে অন্য প্রদেশবাসীরা চুপ মেরে ব'সে থাকৃবেন। তোমরা না পার, অন্যেরা তা' করৃবেন। রাম ডাক্তার যদি রোগীর রোগ না সারায়, তবে শ্যাম ডাক্তার আস্‌বে। No body is indispensable in the country's **cause,** দেশের কাজ ওকে না হ'লে হবে না, তাকে না হ'লে হবে না, এসব ধারণা নিতান্ত গ্রাম্য। ভেদবুদ্ধি-বিরহিত হ'য়ে তোমরা যদি সর্ব্বসমাজের সেবায় না অগ্রসর হও, অন্য কেউ এসে তা' কর্ব্বেন। চিরস্থায়ী গৌরব, অক্ষয় যশ থেকে যাবে তাঁদেরই,—আর তোমরা শুধু স্বামী বিবেকান্দের পবিত্র নাম ভূর্জ্জপত্রে লিপিবদ্ধ ক'রে সোনার মাদুলীতে ভ'রে ত্রি-সন্ধ্যায় তিনবার ক'রে সেই মাদুলী ভিজান এক এক গণ্ডূষ জল পান কর্ব্বে, আর আত্মশ্লাঘা ক'রে বেড়াবে,—"আমাদের বিবেকানন্দের মত জীব-সেবক ত্রিভুবনে আর কখনো হয় নি, আর কখনো হবেও না।" ব্যস, এই পর্য্যন্তই।

পুপুন্‌কী আশ্রম
১২ই আষাঢ়, ১৩৩৬

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা বেলা এগারটায় পুপুন্‌কী আশ্রমে পৌছিয়াছেন। এবারকার বর্ষার প্রথম পশলা বৃষ্টি-পাত মটর-বাসে থাকিতেই হইয়া গিয়াছে।

বিশ্রাম সেই শেষ দিন

শ্রীশ্রীবাবা আশ্রমে পৌছিতেই দেখিলেন যে প্রচুর বৃষ্টি হইবার ফলে কঠিন মৃত্তিকা বড়ই কোমল হইয়াছে। একখানা কোদাল লইয়া শ্রীশ্রীবাবা মাটি কোবাইতে স্বরু করিলেন।

একজন ব্রহ্মচারী বলিলেন,—কোদাল ছাড়ুন, বিশ্রাম করুন, স্নান করুন।

শ্রীশ্রীবাবা কোদাল ছাড়িলেন। কিন্তু বলিলেন,—বাছারে, বিশ্রাম জীবনে একদিন,—Rest after death,—সেই চিরবিশ্রামের দিন, স্নান ও জীবনে একদিন সেই মহাস্নানের দিন।

হুজুগ নিষ্প্রয়োজন

স্নানাহারাদি সারিয়া শ্রীশ্রীবাবা বিশ্রাম করিতেছেন। এবারকার কয়দিনের পূর্ব্ব-বঙ্গ ভ্রমণের বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দেখ্, একটা হুজুগ নিয়ে যদি উপস্থিত হওয়া যায়, তাহ'লে লক্ষ লক্ষ লোককে সবলে আকৃষ্ট ক'রে নিয়ে আসবার মত পুঞ্জীভূত উপাদান পূর্ব্ববঙ্গের যুবকদের মধ্যে সঞ্চিত রয়েছে। কোনো কোনো পথাবলম্বীরা সে সুযোগের সদ্ব্যবহারও কচ্ছেন। কিন্তু আমাদের পন্থা তা' নয়। হুজুগ দিয়ে আমরা একটী প্রাণীকেও আকৃষ্ট কর্ব্ব না।

আর কেহ তোর মধুর বীণা
শুনল কিনা,
সেই দিকে তুই মন দিবি না।

আপন ভাবে বিভোর হ'য়ে
তোর গাথা তুই যা না গেয়ে,
প্রাণের পুরে গোপন সুরে
ভাব্না বিনা।
যাদের দেহের পরাণ আছে,
আপ্নি ছুটে আস্বে কাছে
প্রাণের ঝোঁকে আস্বে বুকে
সব অচিনা।

কৌশল ক'রে প্রলুব্ধ করার প্রয়োজন কি ?

আমার যারা আপন তারা
ক'দিন দূরে থাকৃতে পারে ?
চাই কি না চাই, প্রাণের টানে
আস্বে বুকে বারে বারে।
কার লাগি মোর কাঁদে হৃদয়,
মুখ ফুটে তা' বলতে কি হয় ?
আমার সাথে এক বেদনায়
ভাস্বে সবাই অশ্রুধারে।
এক ছাঁচে সব গঠন ক'রে,
রাখ্ল ঠাকুর দূরান্তরে,
কাজের সময় আস্লে দেখিস্
কেউ সুদূরে রইতে নারে।

কর্ম্মীর চক্ষু

সন্ধ্যার পরেও শ্রীশ্রীবাবা কোদাল চালাইতেছেন। এমন সময়ে জোলহাডি হইতে শ্রীযুক্ত হরিহর মিশ্র মহাশয় আসিলেন। তখন অন্ধকার হইয়াছে।

হরিবাবু বলিলেন,—এখন বাতি জ্বালুন, নইলে দেখতে পাবেন কেন ?

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—বাতি বরং জ্বাল্‌লামই, ক্ষতি কি ? কিন্তু উৎসাহই কর্ম্মীর বাতি, আর আগ্রহই তার চক্ষু।

সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্ম

রাত্রিতে অপর এক প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কর্ম্মফল লাভের আকাঙ্ক্ষাই কর্ম্মের বীর্য্য। নিষ্কাম কর্ম্মের দোহাই দিলেই শুধু চলবে না, কর্ম্মফল লাভের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাটাকেও তার ন্যায্য সম্মান দিতে হবে। কেউ যদি কোথাও ফললাভের আকাঙ্ক্ষাতেই সৎকাজ করেন, নাসিকা কুঞ্চিত ক'রে তাঁকে ঘৃণা করো না। তবে একথা সত্য জেনো, যে, কর্ম্মের এই বীর্য্যকে যে ধারণ ক'রে রাখতে পারে, ফললাভের আকাঙ্ক্ষাকে যে দমন ক'রে চলতে পারে, জগতে সে অসাধ্য সাধন করে, —হিমাচল সে উলটে দিতে পারে, সপ্তসমুদ্র সে শুকিয়ে দিতে পারে, ঝঞ্ঝার বিক্রমকে সে স্তব্ধ ক'রে দিতে পারে, বজ্রপাতকে সে করতলে ধারণ কত্তে পারে।

টোলের ছাত্রদের স্বদেশ-ব্রত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা

পুপুন্‌কী আশ্রম,
১২ই আষাঢ়, ১৩৩৬

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মেড্ডা চতুষ্পাঠীর ছাত্রেরা সমগ্র আসাম ও বাঙ্গলার টোলের ছাত্রদের লইয়া এক সম্মিলনীর অধিবেশন করিতেছেন। শ্রীশ্রীবাবাকে উক্ত সম্মিলনীতে যোগ দিবার জন্য ভূয়োভূয় নিমন্ত্রণ প্রেরিত হইতেছে। কিন্তু আশ্রমের কার্য্য-গুরুত্ব-হেতু যাইতে পারিবেন না বলিয়া শ্রীশ্রীবাবা জনৈক ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক সম্মিলনীর সাফল্য কামনা করিয়া এক পত্র লিখাইলেন এবং বলিলেন,—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত শ্রেণীর প্রভাব হিন্দু-সমাজের উপর এমন গভীর ভাবে প্রোথিতমূল যে, এঁদের অস্তিত্বকে উপেক্ষা ক'রে শুধু সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারের ধার-করা সভ্যতার বলে ভারতের জাতীয় কুশল সম্ভব হবে না, বরঞ্চ

সমাজ-সংস্কারের নামে আমরা সমাজ-সংহারই কর্ব্ব। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অসামান্য সাধনা ও মনীষা-প্রসূত অমূল্য শাস্ত্রনিচয়কে বর্জ্জন ক'রে এবং সেই সকল শাস্ত্রের সেবক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতবর্গকে উপেক্ষা ক'রে জাতি গড়ার চেষ্টা কৃষ্ণার্জ্জুনহীন কুরুক্ষেত্র নাটকের অভিনয়ের মতনই হবে। সংখ্যায় শতকরা যারা চৌরানব্বই জন, সেই অশিক্ষিত শ্রেণীর উপরে এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকের উপরে দেবপূজক পুরোহিত, ভাগবত-পাঠক কথক ঠাকুর, জনন-মরণাশৌচাদির ব্যবস্থাদাতা স্মৃতির পণ্ডিত, রোগের চিকিৎসক আয়ুর্ব্বেদীয় কবিরাজ এবং কোষ্ঠী-বিচারক গণৎকার, এঁদের প্রভাব অলক্ষিত কিন্তু অপরিমিত। সপ্তাহের ছয় দিন যে নাস্তিক, শনিবার দিন সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সে পুরোহিত-ঠাকুরের জন্য ব্যাকুল নয়নে প্রতীক্ষা করে। সব সময়ে যে যুক্তিবাদী, কথক-ঠাকুর বেদীতে ব'সে ধ্রুব-প্রহ্লাদের কাহিনী বল্‌তে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে সে হৃদয়ের কোমল পরত-গুলিতে বেদনা অনুভব করে। সব সময়ে যে বেদান্তবাদী, জন্মমৃত্যুর কালে সে শতনিন্দিত রঘুনন্দনের চেলাদের কাছেই দৌড়ে যায়। সব সময়ে যে পাশ্চাত্য-পন্থী, দীর্ঘকালব্যাপী কঠিন ব্যাধিতে পড়্‌লে সে আয়ুর্ব্বেদেরই শরণাপন্ন হয়। আর সব সময়ে যে পুরুষকারবাদী, পুত্রকন্যার বিবাহের সময়ে দৈববিধান জান্‌বার জন্যে একশবার গিয়ে সে গ্রহাচার্য্যের দুয়ারে ধন্না দেয়। এই ব্রাহ্মণপণ্ডিতরা জন্মলাভ কচ্ছেন টোলে। সুতরাং টোলের ছাত্রদের এইরূপ সম্মেলনের দ্বারা যদি তাদের ভিতরে স্বদেশ-প্রেম জাগ্রত হয়, তারা যদি এর ফলে স্বদেশ-সেবার ব্রত গ্রহণ করে, তা' হ'লে অদূর ভবিষ্যতে সমাজের পুরোহিত, কুলগুরু, কথক, কবিরাজ, স্মার্ত্ত ও জ্যোতিষীদের দ্বারা জাতির সেই অংশের মধ্যে নবজাগরণ সঞ্চারিত হবে, আজ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রীয় নেতারা বা সহরবাসী সমাজ হিতৈষীরা যাদের কল্পনা শক্তিকে স্পর্শমাত্রও কত্তে পারেন নি।

পুপুন্‌কী আশ্রম,
১৩ই আষাঢ়, ১৩৩৬

ভারতীয় সাধনার স্বরূপ

অদ্য কলিকাতার "ভারতীয়-সাধনা-মূলক-শিক্ষা-প্রচার-সমিতির" প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা ভারতীয় সাধনার স্বরূপ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে যে সারগর্ভ বিবৃতি লিখিলেন, নিম্নে আমরা তাহার অনুলিপি দিলাম। যথা,—

"জীবনের প্রত্যেকটী পাদ-বিক্ষেপে ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া চলিবার চেষ্টা ভারতীয় সাধনার প্রথম বৈশিষ্ট্য। এই সাধনার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য,— ভগবানকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিবার পন্থা-নির্ণয় সম্বন্ধে যেখানে যিনি যে সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহারই প্রতি সম্পূর্ণ সশ্রদ্ধ সহিষ্ণুতা রক্ষা করিয়া নিজের স্বাধীন রুচি, বিচার ও অনুভূতির সহায়তায় নিজের পন্থা বাহির করিবার অধিকার। এই দুইটী বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি করিয়া ভারতীয় সাধনা বা সংস্কৃতির বিশাল প্রাসাদ গড়িয়া উঠিয়াছে।"

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অভিক্ষা

উক্ত সমিতির অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"উক্ত দুই বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া এক্ষণে এমন শিক্ষায়তনই প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক, যাহাতে সর্ব্বপ্রকার ভিক্ষাবৃত্তির উচ্ছেদ সাধিত হইবে। ভিক্ষাবৃত্তি বলিতে এখানে দৈহিক, মানসিক, আর্থিক, নৈতিক ও রাষ্ট্রিক প্রভৃতি সর্ব্ববিধ পরমুখাপেক্ষিতার কথাই বলা হইতেছে। অবশ্য, এইরূপ শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইলে অপরাপর আয়োজনের দিকে অধিক লক্ষ্য না রাখিয়া কর্ম্মী বা আচার্য্যদিগকেই সর্ব্বাগ্রে সম্পূর্ণরূপে স্বাবলম্বন-সিদ্ধ হইতে হইবে।"

আদর্শ শিক্ষা-প্রণালী

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"প্রণালী হওয়া উচিত এমন, যাহাতে বিদ্যার্থীর সহজাত শক্তিগুলির প্রস্ফুটনই

সর্ব্বাগ্রে হয়। এজন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে ছাত্র-সংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধি দমন করিয়া চলিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইতে হইবে এবং যেখানে বহু শিক্ষার্থীর মেলন-সম্ভাবনা সেখানে একটী প্রতিষ্ঠানকে ভাঙ্গিয়া কার্য্য-সৌকার্য্যার্থ একাধিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে হইবে।"

শিক্ষায়তনের গঠন-বিধি বা Constitution

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—"শিক্ষালয়ের গঠন-বিধি স্থান ও কাল ভেদে বিভিন্ন প্রকারেরই হইবে। কোথাও ব্যক্তিতন্ত্রমূলক, কোথাও গণতন্ত্রমূলক, কোথাও উভয় তন্ত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনপূর্ব্বক শিক্ষালয় গঠিত হইবে। যেখানে শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠাতা একটী মাত্র ব্যক্তি এবং তাঁহার জীবনে ভারতীয় সভ্যতার বিশিষ্ট দ্যোতি তপঃ-সাধনের মধ্য দিয়া প্রস্ফুটিত হইয়াছে, সেখানে গঠন-বিধি প্রথম সময়ে ব্যক্তিতন্ত্র-মূলক হওয়াই স্বাভাবিক। যেখানে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিবে, সেখানে গণতন্ত্রমূলক ভাবেই গড়িয়া উঠিবে। শিক্ষালয় যেখানে যে ভাবেই গড়িয়া উঠুক, তাহাতে কিছু যায় আসে না, যদি ভারতীয় সাধনার পূর্ব্বোল্লিখিত মৌলিক বৈশিষ্ট্যদ্বয়ের অপচয় না ঘটে।"

বিভিন্ন শিক্ষায়তনের মধ্যে ঐক্য সংস্থাপনের উপায়

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"চতুর্দ্দিকে যখন স্বাধীনভাবে পাশ্চাত্যের অনুচিকীর্ষা-বর্জ্জিত বিগত-মোহ খাঁটি প্রতিষ্ঠান কতকগুলি উদ্ভূত হইয়া উঠিবে, তখন চুম্বকাকৃষ্ট লৌহখণ্ডসমূহের ন্যায় উহারা পরস্পর স্বতঃই যুক্ত হইয়া যাইবে। ইহাই যথার্থ ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূলসূত্র। বর্ত্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কর্ম্মি-বিনিময়ের দ্বারা পরস্পরের কার্য্য-পরিচালন-চেষ্টা দ্বারা অনেক অ-খাঁটি প্রতিষ্ঠান খাঁটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে এবং এই বিনিময়ই অধিকাংশের মধ্যে স্বাভাবিক ঐক্য সংস্থাপনে অগ্রদূতের কার্য্য করিবে।"

পুপুন্‌কী আশ্রম,
৮ই শ্রাবণ, ১৩৩৬

ইতিমধ্যে আশ্রমের কতকগুলি দুরন্ত দুর্দ্দিন গিয়াছে। খাদ্যাভাবের কথা ত' বলাই বাহুল্য, কারণ বর্ত্তমানে দৈনিক দুই বেলা আহার্য্যের খরচ জন-পিছে মোট সাড়ে পাঁচ পয়সা করিয়া পড়িতেছে। তদুপরি মাঠের কাজ করিতে করিতে শ্রীশ্রীবাবা একদিন প্রবল জ্বর অনুভব করিতে লাগিলেন। জ্বরবোধ সত্ত্বেও প্রায় চারি পাঁচ ঘণ্টা কাজ করিবার পরে শয্যাশ্রয় লইতে হইল। শ্রীশ্রীবাবা কিছুদিন জ্বরে ভুগিয়া সুস্থ হইয়া উঠিতে না উঠিতেই অক্লান্ত-কর্ম্মা শ্রীযুক্ত বরদা টাইফয়েডে পড়িয়াছেন। বারংবার প্রাণ-সংশয় অবস্থা উপস্থিত হইতেছে। একদিকে কদন্ন ভোজন, অর্দ্ধাশন, গৃহমধ্যে বৃষ্টিপাত, অপর দিকে সারাদিন এবং অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত মাঠের কাজ, তদুপরি মৃত্যুন্মুখ রুগ্নের পরিচর্য্যা। রুগ্নেরই কি কোনও সেবা সম্ভব? একটা কাগজী লেবু সংগ্রহের জন্য বাষট্টি মাইল মটরে চড়িয়া পুরুলিয়া যাইতে হইতেছে, তবে রোগী এক চামচ বালির জল পথ্য করিতে পাইতেছেন।

ভাব স্থায়ী করিবার উপায়

রুগ্ন-শয্যাপার্শ্বে বসিয়া শ্রীশ্রীবাবা দেখিলেন, রোগী ঘুমাইতেছেন। তখন শ্রীশ্রীবাবা মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত অজয়গড়-প্রবাসী জনৈক ভক্তের নিকট পত্র লিখিতে বসিলেন। শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"স্নেহের—

"* * * দুঃখ-কষ্ট মনুষ্য-জীবনে অবশ্যম্ভাবী এবং অচিরস্থায়ী। কিন্তু তার ভিতরেও চিরমঙ্গলবিধাতার স্নেহ-দৃষ্টিকে আমরা যদি সাময়িক ভাবেও অনুভব করিতে সমর্থ হই, তবে জানিও, সেই অল্পকালব্যাপী অনুভূতিটুকুরও প্রভাব সমগ্র জীবনের উপরে আস্তে আস্তে, অলক্ষ্যে, লোকদৃষ্টির অগোচরে, আমাদের মনো-বুদ্ধির অজ্ঞাতসারে বিস্তারিত হইতে থাকে এবং তাহাই পরিশেষে পূর্ণ কল্যাণকে জাগ্রত ও আত্মস্থতাকে প্রবুদ্ধ করে।

"ভাব স্থায়ী হইতেছে না বলিয়া দুঃখ করিবার প্রয়োজন নাই। স্থায়ীই হউক, আর অস্থায়ীই হউক, এ জগতে ভাবের কখনও মৃত্যু নাই। যে ভাব তোমার মধ্যে আজ অস্থায়ীরূপে অবস্থান করিল, জানিও, সে তার সেই অস্থায়িত্বের মধ্যেই নিজ স্থায়িত্বের বীজকে অতি সঙ্গোপনে বপন করিয়া গেল। সেই বীজ অনুকূল আকাশ, অনুকূল বাতাস, অনুকূল বর্ষণ, অনুকূল কর্ষণ ও অনুকূল ভৌম উত্তাপের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে। 'সাধন' এই সকল আনুকূল্যকে সৃষ্ট, পুষ্ট এবং সংহত করে বলিয়া 'সাধনই' ভাবকে চিরস্থায়ী করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়।

নামের প্রথমাস্বাদ

"সাধনে যে মন বসে না ইহাই সাধনের প্রথম লক্ষণ। বাঘের যেমন শিকারের উপরে লম্ফ দিয়া পড়ার প্রথম লক্ষণ হইতেছে লাঙ্গুল আন্দোলিত করিতে করিতে একবার দক্ষিণে আর একবার বামে সঞ্চালন। নামে যে স্বাদ পাও না, ইহাই নামের প্রথমাস্বাদ। ফল খাইতে গেলে খোসার তিক্ততাটা আগে লাগে। এইজন্য বিন্দুমাত্র চিন্তিত হইও না।

মিথ্যাচার কাহাকে বলে ?

"যেহেতু মনে মনে কাম-বাসনা রহিয়াছে, সেই হেতুই বাহিরের সংযম যে কপটাচার হইবে, এমত নহে। ভিতরে কামাদি ভোগ-বাসনা থাকা স্বত্ত্বেও ঠিক্ তাহাদিগকে দমন করিবার জন্যই যে বাহিরের সংযম, তাহা কপটাচার বা মিথ্যাচার নহে। বাহিরে সংযম অবলম্বন করিলাম লোক দেখাইবার জন্য, আর ভিতরে লালসার কোলাহল প্রচণ্ড ভাবেই চলিতে দিলাম, এইরূপ সংযমকেই কপটতা বলে। ভিতরে সংযম-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনও হীন উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইয়া যখন বাহিরে সংযমী হই, তখনই আমি কপটী। সুবিধার অভাবে চুরি করিলাম না, শারীরিক বলের অভাব হেতু ডাকাতি করিলাম না, ফাঁসী যাইবার আশঙ্কা হেতু নরহত্যা করিলাম না, অথচ মনে মনে চুরি

ডাকাতি ও নরহত্যার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলাম, ইহারই নাম মিথ্যাচার। মনকে ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সমূহ হইতে টানিয়া আনিবার জন্যই যখন আমি বাহিরের ইন্দ্রিয়-সমূহকে কর্ম্ম-বিরত করি, তখন যদি আমি সকল সময়ে মনকে পূর্ণ সংযমে প্রতিষ্ঠিত নাও রাখিতে পারি, তথাপি বলিতে হইবে যে, আমি যাহা করিতেছি, তাহা ভণ্ডামি নহে, তাহা সংযমেরই সাধনা। সাধনাবস্থায় উত্থান ও পতন এই উভয় বিরোধী অবস্থার সহিতই প্রতিনিয়ত দেখা সাক্ষাৎ হইবে, সিদ্ধাবস্থায় তাহা হয় না। যতক্ষণ তুমি সংযমের সাধক, ততক্ষণ বাহিরের সংযম রক্ষা করিলেও মাঝে মাঝে মনের সংযম হইতে স্খলিত হইলেও হইতে পার। ইহা স্বাভাবিক। ইহা ভণ্ডামী নহে। যখন তুমি সিদ্ধ, তখন আর মন স্খলিত হইবে না।

"গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে 'মিথ্যাচার' কথাটা অনেকেরই বুদ্ধিভ্রম ঘটাইয়াছে। অনেকেই কথাটার প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিয়া বাহিরের সংযম-মাত্রকেই অনাবশ্যক মনে করিয়াছে। 'যে ব্যক্তি হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলকে সংযত অর্থাৎ কর্ম্মবিরত করিয়া মনে মনে (লালসা সহকারে) ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহ ধ্যান করে, সেই বিমূঢ়-আত্মা ব্যক্তি মিথাচার বলিয়া উক্ত হয়।' ইহাই গীতার বাণী। গীতার শ্লোক এই নহে যে,—'যে ব্যক্তি মনে মনে বিষয় স্মরণ সত্ত্বেও (মানসিক অসংযমকে দূরীভূত করিবার মহদুদ্দেশ্যে) বাহিরের সংযমকে অবলম্বন করে, সে মিথ্যাচার।' বাহিরে কর্ম্ম-ত্যাগের ভড়ং করিয়া যাহারা মনে মনে আসক্তি সহকারে বিষয়ে বিচরণ করে, মনকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই বাহিরের কর্ম্মত্যাগ করে না, গীতার এই শ্লোক দ্বারা সেই সকল ব্যক্তিকেই নিন্দা করা হইতেছে। সংযমী সাজিবার জন্য হয়ত চক্ষুতে কালো রুমাল শক্ত করিয়া বাঁধিলাম, কর্ণকুহরে তুলা ঢুকাইলাম, আর মোম গালিয়া দিলাম, দুই অঙ্গুলীতে সজোরে নাক টিপিয়া ধরিলাম, জিহ্বাটাকে উল্টাইয়া খেচরী-মুদ্রাযোগে কপাল-কুহরে প্রবেশিত করিলাম, আর সর্ব্বাঙ্গে ধূনীর ভস্ম মাখিয়া স্পর্শ-শক্তির আপদ-বালাই ঘুচাইলাম, কিন্তু অপর দিকে করিলাম কি ? না, মনকে যাবতীয় ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়সমূহে সুখানুভবপূর্ব্বক রমণ করিতে দিলাম, বিবেকের ক্ষুরধার

সূচীসূক্ষ্ম দণ্ডকে একটীবারও দংশন করিতে না দিয়া মনকে সুখ-সহকারে ইন্দ্রিয়ের বিষয়নিচয়ে বিচরণ করিতে উৎসাহ দিতে লাগিলাম। ইহাই মিথ্যাচার। মন যে প্রতিনিয়ত ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাইতেছে, তাহা নিবারণের জন্য যখন চক্ষু বুজি, কর্ণ নিরুদ্ধ করি বা অপরাপর উপায়ে বাহিরের সংযম রক্ষা করি, তখন আমি মিথ্যাচারী হই না, বরঞ্চ তখন আমি হই ব্রতধারী। চক্ষু বুজিবার জন্যই যখন চক্ষু বুজি, অথচ, মনের দ্বারা লালসা-সহকারে ধ্যান করিতে থাকি স্বর্গের বিদ্যুদুজ্জ্বলকান্তি অপ্সরীদের, সাধু সাজিবার জন্যই যখন কর্ণ নিরুদ্ধ করি অথচ মনের দ্বারা লালসা-সহকারে ধ্যান করিতে থাকি গন্ধর্ব্বলোকের কিন্নরীগণের লীলা-মাধুরী-চঞ্চল বিলাস-ব্যাকুল শৃঙ্গার-সঙ্গীতের, নাক যখন টিপিয়া ধরি প্রাণায়ামী যোগী খ্যাতি লাভের জন্য, আর মনকে লালসা সহকারে ঠেলিয়া পাঠাই কোন্ কল্পনা-লোকের এক পদ্ম-গন্ধা রাজকন্যার বক্ষোবস্ত্র-বিলম্বিত পীনপয়োধরস্পর্শী পারিজাত-গুচ্ছের পরাগ-নিচয়ে, জিহ্বায় যখন লাগাম কষি মৌনী বাবা বলিয়া বিখ্যাত হইবার জন্য, আর, লালসা সহকারে মনকে পাঠাইয়া দেই রসনা-সুখেরই এক উচ্ছৃঙ্খল ভোগ-নিকেতনে, স্পর্শেন্দ্রিয় ত্বক্‌কে যখন স্পর্শযোগ্য দেহ বা বস্তুর সান্নিধ্য হইতে সযত্নে দূরে দূরে সরাইয়া রাখিলাম শুধু শুচিতার প্রশংসা পাইবার জন্য, অথচ, মনকে তখন লালসা-সহকারে বারংবার প্রেরণ করিতে লাগিলাম অপর একটা কাম-কেন্দ্র শরীরকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিতে বা চুম্বন-পীড়িত করিতে, তখনই আমি মিথ্যাচারী। কারণ, লোককেই আমি দেখাইলাম যে, আমি একটা বেজায় মহাত্মা, একবারে জিতেন্দ্রিয় সিদ্ধ মহাপুরুষ, অথচ প্রকৃত মহাত্মা হইবার জন্য আমার আন্তরিক চেষ্টা নাই এক বিন্দুও। সম্মুখে আসিয়া আলুলায়িত-কুন্তলা রূপসীরাণী পবন-বিভ্রষ্ট-বসনে বসিয়া থাকিলেও কৌতূহলবশে একবার চক্ষুটী খুলি না, লক্ষ্ণৌএর কমকণ্ঠী বাইজীরা আসিয়া কাণের কিনারে গান ধরিলে শুনিবার জন্য ব্যাকুল হই না, বসোরা হইতে সাজি ভরিয়া গোলাপ ফুল আনিয়া ধরিলেও নাকের টিপুনি একটুকু ছাড়ি না, বাগবাজারের রসগোল্লা মুখের কাছে ধরিলেও জিহ্বাটাকে একবারের তরে আলজিহ্বার কুঠরী হইতে নামাইয়া আনি

না, কুসুমকোমলা পেলবাঙ্গী ষোড়শী গিয়া ক্রোড়ের উপর বসিলেও একবার তাহাকে আলিঙ্গনে বেড়িয়া ধরি না। বাপ্‌রে বাপ্‌! কি ভয়ঙ্কর সংযম! অথচ, মনে মনে ইহাদের প্রত্যেকটীকে সহস্রবার প্রার্থনা করিতেছি—অনুতাপ-লেশ-মাত্রহীন বিলোল লালসায়। এইরূপ সংযমকেই গীতা মিথ্যাচার বলিয়াছেন।

লালসা-বিদূরণের উপায় স্বভাবের বিশুদ্ধি-সাধন

"—সান্ত জিনিষের শেষ আছেই, সান্ত ভোগ চিরস্থায়ী হইয়া থাকে না, এমন সময় আসিবে, ভোগ করিতে করিতে এসব আর ভাল লাগিবে না, ভগবানের দিকে আপনিই টান পড়িবে,'—এইরূপ যুক্তির উপরে নির্ভর করিয়া ভোগের পথে নিশ্চিন্ত মনে চলিতে যাওয়া বিপজ্জনক। একবার মনকে বিষয়সমূহে ছড়াইয়া দিলে তাহাকে গুটাইয়া আনা কঠিন, অনেক সময়ে ভয়ঙ্কর। তবে, জোর করিয়া ভোগ-বাসনাকে দাবাইয়া রাখিতে গেলে তাহার প্রতিক্রিয়া আছেই। কিছুদিন কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের পর একেবারে লাগাম খুলিয়া যায়, অতৃপ্ত বাসনা কড়ায়-গণ্ডায় আপনার সুদ ও মূল আদায় করিয়া লয়। এই উভয় কারণে ভোগের স্রোতেও যেমন গা ভাসান চলে না, জোর করিয়া ইন্দ্রিয়-নিগ্রহও তেমন চলে না। চলে যাহা, তাহা ইহাদের মধ্যবর্ত্তী। তাহা হইতেছে, নিজের স্বভাবকে অনুসরণ করিবার সাথে সাথে স্বভাবকে বিশুদ্ধ করিবার চেষ্টা করা। 'প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ?'

"স্বভাবকে বিশুদ্ধ করিবার একমাত্র উপায় ভগবৎ সাধনা। * * *

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ—"

পুরুলিয়া

৯ই শ্রাবণ, ১৩৩৬

দল ও বল

শ্রীযুক্ত বরদার জন্য কাগজী লেবু ক্রয় করিতে অদ্য শ্রীশ্রীবাবা স্বয়ং পুরুলিয়া

আসিয়াছেন। স্থানীয় বিদ্যালয়ের দুই চারিটি ছাত্র শ্রীশ্রীবাবার পাদপদ্মে যোগদীক্ষায় দীক্ষিত। শ্রীশ্রীবাবার আগমন সংবাদে একজন আসিয়া গুরু-পাদপদ্ম দর্শন করিলেন। আগত ভক্তটী একটু দলবৃদ্ধিতে উৎসাহী, অর্থাৎ আরও বহু লোক যাহাতে শ্রীশ্রীবাবার শ্রীচরণাশ্রয় গ্রহণ করে, তদ্বিষয়ে আগ্রহান্বিত ও যত্নবান্। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দলবৃদ্ধিতে যার মন থাকে, সে বল হারায়। বলবৃদ্ধিতে যার মন থাকে, তার দল হ'য়ে যায় আপনি। সংখ্যার দিকে যার বেশী মন, উৎকর্ষ তার ক'মে যায়। উৎকর্ষ যার বেশী হয়, সংখ্যা তার আপনি বাড়ে। বল যদি থাকে, তবে দল না বাড়্‌লেই বা ক্ষতি কি? উৎকর্ষ যদি বাড়ে, তবে সংখ্যা কম থাক্‌লেই বা অসুবিধা কি? লোকে যত বড় কাজ করে, সব করে চরিত্রের শক্তিতে, সাধনের বলে। দশ হাজার লম্পট মিলে যা কত্তে পারে না, একটা জিতেন্দ্রিয় পুরুষ তা' পারে। দশ হাজার মিথ্যাবাদী মিলে যা পারে না, একটা সত্যাশ্রয়ী পুরুষ তা' পারে। দশ হাজার স্বার্থপর লোক মিলে যা কত্তে পারে না, একটা পরার্থপর নিঃস্বার্থচেতা পুরুষ তা' কত্তে পারে। তোমরা বাবা দলের দিকে মন দিও না, বলের দিকে মন দাও, সঙ্গোপনে সাধন কর, সুতীব্র তপস্যার বলে লোকচক্ষুর অগোচরে বলীয়ান্ হও, ভগবানের পায়ে নিজেদিগকে অতি সন্তর্পণে অন্যের অজ্ঞাতসারে সঁপে দাও, আর, সেই সর্ব্ব-শক্তিমানের পদপ্রান্ত হ'তে শক্তির জাহ্নবী-প্রবাহ উৎসারিত ক'রে সেই স্রোতো-জলে অবগাহন ক'রে শক্তিমান্ হও, তেজীয়ান্ হও। বড় কাজ কত্তে হয় ত' তোমরা একাই এক একটা বিরাট বিরাট কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ক'রে যেতে পার্ব্বে।

একতার মানে

ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—তবে আর লোকে একতার মহিমা কীর্ত্তন করে কেন?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—একতা বল্‌তে বুঝবে, শক্তিশালীর একতা বা শক্তি-লাভেচ্ছুর একতা। একতা বল্‌তে বুঝবে, নিঃস্বার্থচেতার একতা বা নিঃস্বার্থতার সাধন-

কারীর একতা। একতা বল্‌তে বুঝ্‌বে, জিতেন্দ্রিয় পুরুষের একতা বা জিতেন্দ্রিয়ত্ব লাভেচ্ছু উদ্বুদ্ধ-চেতা পুরুষদের একতা। ভাবের দিক দিয়ে যারা এক, তাদেরই একতা প্রার্থনীয়, তাদেরই একতা সম্ভব। অপরের একতা যেমনই অপ্রার্থনীয়, তেমনই অভাবনীয়।

বৃথা দীক্ষা

তৎপর শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—আজকাল তোমাদের ভিতরে দীক্ষা নেবার একটা বাতিক উঠেছে। এটাকে একটা হুজুগ-বিশেষও বলা যেতে পারে। ছেলেরা ক্ষেপে আসে দীক্ষা নিতে আর চেলা হ'তে। কিন্তু বাছা, দীক্ষা নেওয়া কি সোজা কথা, না, দীক্ষা দেওয়াই সোজা কথা? ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ দর্শন করার জন্য প্রাণে ব্যাকুলতা জাগল না, অথচ দীক্ষা নিলাম,—এতে যে অনেক সময় ভণ্ডামির ব্যাপার হয় হে!

ভগবানের নামে সকলেরই অধিকার আছে

শিষ্য শ্রীশ্রীবাবার মুখে এক সময়ে কাম-কাঞ্চন-ত্যাগী জিতেন্দ্রিয় এক মহা-পুরুষের গল্প শুনিয়াছিলেন। যথা,—

"এক যুবতী বারবণিতা তিনটী সঙ্গী সমভিব্যাহারে কোনও এক মেলায় আমোদ-প্রমোদ করিবার জন্য গমন করে। কিন্তু তাহার সঙ্গীরা সকলে একই দিনের মধ্যে উৎকট কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা যায়। বারবণিতা প্রাণ-ভয়ে ভীতা হইয়া মেলাস্থল পরিত্যাগ করিয়া স্বগৃহাভিমুখে রওনা হইল। গৃহ হইতে কতিপয় মাইল দূরবর্ত্তী রেল ষ্টেশনে যখন সে আসিয়া পৌঁছিল, তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে। একে একে সকল যাত্রীরা রেলগাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া যার যার গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল, সঙ্গীহীনা নারী একাকিনী ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে ভয়ে জড়সড় হইয়া বসিয়া রহিল। চতুর্দ্দিকে খোলা মাঠ, জনমানব নাই। ট্রেণও চলিয়া গিয়াছে। একাকিনী এক রূপসী যুবতীকে দেখিতে পাইয়া ষ্টেশনের কর্ম্মচারীরা এক একবার আসিয়া রমণীকে নানাভাবে খাতির জানাইয়া আত্মীয়তা পাতাইতে চেষ্টা করিতেছিল এবং ধীরে ধীরে একটা একটা করিয়া ষ্টেশনের সমস্ত

আলো নিভাইয়া দিতেছিল। ইহাতে তাহার বরং ভয়ই বৃদ্ধি পাইতেছিল। অনেকে মনে করে যে, যাহারা বেশ্যাবৃত্তি করিয়া খায়, তাহাদের বুঝি সম্ভ্রম-জ্ঞান নাই। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। নিজ বৃত্তির অনুরোধে যখন সে নরকের পঙ্ক অঙ্গে মাখে, তখন সে যতই লজ্জাহীনা পাপীয়সী হউক না কেন, কিন্তু বেশ্যার মধ্যেও ত' সর্ব্বভূতের যিনি জননী,সেই আদ্যাশক্তি মহামায়া স্নেহরূপে, লজ্জারূপে, বুদ্ধিরূপে, হৃদয়বত্তা রূপে, বিবেকরূপে, সু-রুচি রূপে এবং সু-নীতিরূপে, বিরাজ করিতেছেন! তাই, অন্য সময়ে তার ভিতরে কুলবতী নারীদের মতই স্বাভাবিক পবিত্রতা-বুদ্ধি, সম্ভ্রম-বুদ্ধি ও সতীত্ব-বুদ্ধি অল্পবিস্তর জাগরূক থাকেই। এদিকে, ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী এক ট্রেণে এক পরিব্রাজক মহাপুরুষ সেই ষ্টেশনে অবতরণ করিয়াছিলেন কিন্তু আকাশের ঘনঘটাচ্ছাদিত দুর্য্যোগসূচক অবস্থা দর্শনে রজনী-যোগে পথ-পর্য্যটন অনুচিত ভাবিয়া কম্বল মুড়ি দিয়া ষ্টেশনের এক অন্ধকার কোণে নিদ্রা যাইতেছিলেন। নিস্তব্ধ নিশীথে রেল-কর্ম্মচারীদের ঘন ঘন পাদুকার শব্দে এবং মাঝে মাঝে ভয়ার্ত্তা নারীর কণ্ঠের করুণতায় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিমেষের মধ্যেই তিনি ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইতে পারিলেন এবং রমণীর নিকটে আসিয়া দেখিলেন, একজন রেল-কর্ম্মচারী একটী প্রকোষ্ঠের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া কি বলিতেছে এবং রমণী দৃঢ়কণ্ঠে শুধু 'না' 'না' বলিতেছে।

"মহাপুরুষ বলিলেন,—মা তুমি ভয় পাইয়াছ? ভয় কি মা! এই ত, আমি আছি তোমার সন্তান, তোমার জন্য কি করা প্রয়োজন, আদেশ কর; আমি তার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দান করিতে প্রস্তুত রহিলাম।

"রেল-কর্ম্মচারিটী অপ্রত্যাশিত মনুষ্য-সমাগমে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া স্থান-ত্যাগ করতঃ অফিস-ঘরে প্রবেশ করিয়া অপর একজন কর্ম্মচারীর সহিত কিয়ৎ-কাল কি পরামর্শ করিল। তৎপরে ফিরিয়া আসিয়া মহাপুরুষকে রুক্ষ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—এই, তোম্ কৌন্ হায়?"

"মহাপুরুষ বলিলেন,—হাম্ সাধু হায়, মুসাফির হায়, নারী-জাতিকা রক্‌ষ্‌ক (রক্ষক) হায়।

"রেল-কর্ম্মচারী বলিল,—এখানে তুই কি চাস্ ?

"মহাপুরুষ বলিলেন,—কিছু চাই না বাবা, শুধু রাত্রিটা এখানে থাকিব।

"রেল-কর্ম্মচারী বলিলেন,—নিশ্চয়ই তুই চোর, আজকাল ষ্টেশনে বড় চুরি হইতেছে, এসব তোদেরই কাজ, তোদের যন্ত্রণায় যাত্রীরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। ভাগ্ শালা এখনি, নহিলে পুলিশে দিব।

"মহাপুরুষ বলিলেন,—চোরই হই, আর ডাকু-ই হই, আজ রাত্রিতে আর কোথাও যাইতেছি না। পুলিশেই দাও, আর জেলেই দাও, কাল ফজির্ হইবার পূর্ব্বে বান্দা তোমাদের আশ্রয় ছাড়িবে না। ডাং মার আর লাথি মার, বান্দা তোমাদের গোড় ধরিয়া পড়িয়া থাকিবে, কিছুতেই মাঈজীকে একাকিনী ফেলিয়া যাইবে না।

"তখন রেল-কর্ম্মচারী সেই রমণীকে বুঝাইতে আরম্ভ করিল,—নিশ্চয়ই এই লোকটা সাধু-বেশী চোর, ইহার উপর ভরসা করিয়া যেন শেষে রমণী নাস্তানাবুদ না হয়। ইহার সঙ্গে গেলে যে বিপদ ঘটিবে না, তা' কে জানে ?

"মহাপুরুষ বলিলেন,—আমার সঙ্গে তোমাকে আসিতে হইবে না মা, তুমি ষ্টেশনের যে কোনও স্থানে ইচ্ছা নিশ্চিন্তে অবস্থান কর, আমি সমস্ত রাত্রি ষ্টেশনে টহল দিয়া বেড়াইব, আর ভজন গাহিব। যতক্ষণ না সূর্য্যোদয় হইতেছে, নিশ্চিত জানিও, তোমার সন্তান প্রাণ গেলেও তোমাকে পরিত্যাগ করিবে না।

"রেল-কর্ম্মচারী অগত্যা প্রস্থান করিলেন।

"মহাপুরুষ টহল দিয়া বেড়াইতেছেন আর গুন্ গুন্ করিয়া ভজন গাহিতেছেন, এমন সময়ে রমণী ডাকিল,—বাবা!

"মহাপুরুষ কাছে আসিলেন বলিলেন,—কি মা ?

"রমণী বলিল,—আমার বড়ই ভয় করিতেছে। আপনি কাছে আসিয়া কোথাও বসুন।

"মহাপুরুষ বলিলেন,—ভয় কিসের! আমি ত, কাছে-কাছেই আছি মা।

"রমণী তখন নিজের পতিতা-জীবনের পরিচয়টুকু গোপন রাখিয়া বাকী সকল

ঘটনাটুকু বিবৃত করিয়া বলিল,—কলেরায় মৃত তিন তিনটা লোকের প্রেতাত্মা যেন আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর এক একবার মনে হইতেছে ষ্টেশনের বাবুরা বুঝি এই আসিল সদলবলে আক্রমণ করিতে।

"মহাপুরুষ বলিলেন,—ও সব তোমার মনের ভ্রম ছাড়া আর কিছু নয় মা। তুমি বসিয়া বসিয়া ভগবানের নাম করিতে থাক। ভগবানের নাম পরমাঅভয়-দাতা। নাম কর মা, ভয় দূরে যাইবে।

"রমণী স্বল্পকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিল,—কিন্তু আমার যে বাবা ভগবানের নাম করিবারও অধিকার নাই।

"মহাপুরুষ বলিলেন,—সে কি কথা মা! ভগবানের নাম যে সর্ব্বজীবের সম্বল। তাঁর নামে যে সকলের সমান অধিকার। এ অমৃতে দেবাসুর, দৈত্য-দানবের বিচার নাই।

"রমণীর কণ্ঠ আরও আর্দ্র হইল। সে বলিল,—বাবা, বাবা, যদি জানিতেন, আমি কে, তাহা হইলে আমার সহিত বাক্যালাপ করারও আপনার প্রবৃত্তি হইত না, আমার মূর্ত্তি দর্শনকে পাপজনক মনে করিয়া ঘৃণায় দূরে সরিয়া যাইতেন। আমি অতি ঘৃণিতা নারী,—অতি—

"মহাপুরুষ বলিলেন,—তোমার সম্ভ্রমজ্ঞান ও কথাবার্ত্তার রকম সকমে তোমাকে আমি অতি পবিত্র-স্বভাবা শিক্ষিতা মহিলা বলিয়াই মনে করিয়াছি। কিন্তু তুমি যদি তাহা নাও হইয়া থাক, তাহাতেও কিছু যায় আসে না। তুমি ভাল হও, মন্দ হও, সর্ব্বাবস্থায়ই আমার মা। আমার চক্ষে জগজ্জননী মহা-শক্তিতে আর তোমাতে ভেদ নাই। তুমি যেই হও, আর যা-ই হও. পুনরায় বলি, ভগবানের নামে তোমারও পরিপূর্ণ অধিকার, শাশ্বত অধিকার, অবিনাশী অধিকার।

"রমণী কতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ভগবানের নাম করিতে চেষ্টা পাইল। তৎপরে বলিল,—সাত বৎসর বয়সে যখন বিধবা হই, তখন কুলগুরু এক মন্ত্র দিয়া গিয়াছিলেন। এখন তাহা ভুলিয়া গিয়াছি, কিছুতেই স্মরণে আসিতেছে না।

"মহাপুরুষ তখন স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন,—তার জন্য ভাবনা কেন মা? আমি তোমাকে ভগবানের নাম শুনাইব।

"তৎপর মহাপুরুষ সেই অজ্ঞাতকুলশীলাকে দীক্ষা দান করিয়া বলিলেন,—আজ হইতে মা জগৎ-সংসারে নির্ভয় হও, এই মহানামে নির্ভর কর। জীবনের সকল জটিল বন্ধন এই নামের মধ্য দিয়াই খুলিয়া যাইবে। যে দুঃখকর জীবন বহন করিয়া বেড়াইতেছ, নামের মধ্য দিয়া সেই জীবনের গতি আপনা আপনি ফিরিয়া যাইবে, কোনও চেষ্টা, যত্ন বা পুরুষকারের প্রয়োজন হইবে না, শুধু নাম করিয়া যাও।

"রমণী জিজ্ঞাসা করিল,—বাবা, আপনার সঙ্গে আবার কবে দেখা হইবে?

"মহাপুরুষ বলিলেন,—ইহাই আমার সহিত তোমার প্রথম এবং শেষ দেখা।

"কিছুক্ষণ পরে শেষ রাত্রির ট্রেণে স্থানান্তরে গমনেচ্ছু যাত্রীরা আগমন করাতে ষ্টেশন জন-কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল। মহাপুরুষ যখন লক্ষ্য করিলেন, রমণীর নিতান্ত পরিচিত কতিপয় ব্যক্তি আসিয়া তাহার মুখে তাহার নিঃসঙ্গতার বিষয় অবগত হইয়া তাহাকে নিজেরাই গিয়া গৃহে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য সম্মত হইল, তখন মহাপুরুষ সকলের অগোচরে ষ্টেশন ছাড়িয়া প্রয়াণ করিলেন।"

শিষ্য এই কাহিনীর উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—আপনার কথিত এই ঘটনার মূল কথাই ত' হ'ল এই যে, ভগবানের নামে সকলেরই অধিকার আছে। তবে ছাত্রসম্প্রদায় দোষ করেছে কি?

হুজুগে গৃহীত দীক্ষার কুফল

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দোষ কিছু ক'রে নি। সদ্গুরুর কৃপা তাদেরও পাওয়া প্রয়োজন। কারণ, সাধন-দীক্ষা উন্নত জীবনের দৃঢ়তম ভিত্তি গ'ড়ে দেয়। কিন্তু কারো দীক্ষা যদি অনুকূল ঘটনার ফল না হ'য়ে বা প্রাণের আবেগের ফল না হ'য়ে হয় গিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের জোগাড়-যন্ত্রের ফল, তা' হ'লে দীক্ষার মূল্য ও প্রভাব অনেকটা ক'মে যায়, শিষ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, গুরুশ্রদ্ধা হ'ল দীক্ষার প্রাণেরও

প্রাণ। হুজুগে গৃহীত যে দীক্ষা, তাতে অনেক সময় সত্যিকার শ্রদ্ধাটা বিকশিত হ'তে পায় না। ফলে, শিষ্যের ভিতর গুরুর পর গুরু চেখে বেড়াবার সম্ভাবনা থাকে। এতে নামে নিষ্ঠা কমে।

সদ্‌গুরুর শক্তি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অবশ্য সদ্‌গুরুর অমোঘ শক্তিকে আমি অস্বীকার কচ্ছি না। সদ্‌গুরুর বাক্যে, তাঁর প্রদত্ত মন্ত্রে এক অত্যাশ্চর্য্য শক্তি লুকিয়ে থাকে, যার অংশমাত্রই দীক্ষাকালে কেউ কেউ টের পায়, কেউ কেউ বা দীক্ষা-কালে আদৌ টেরই পায় না। কিন্তু সেই প্রচ্ছন্ন শক্তির বিস্ময়কর প্রভাব সাধনে-অবিশ্বাসী শিষ্যকে তার ইচ্ছার অগোচরে ঠেলে টেনে নিয়ে আসে সাধননিষ্ঠার দিকে, গুরুদ্রোহী শিষ্যকে তার অজ্ঞাতসারে গুরুপাদপদ্মে নির্ভরশীল ক'রে তোলে। সদ্‌গুরুর দীক্ষা সুপাত্রে পড়ুক, অপাত্রে পড়ুক, পবিত্র আধারে পড়ুক, অপবিত্র আধারে পড়ুক, শ্রদ্ধাবান্ শিষ্যে পড়ুক, হুজুগাকৃষ্ট শিষ্যে পড়ুক, এই অব্যর্থ শক্তি সর্ব্বত্র তার নিজের কাজ ক'রে যাবেই যাবে। সদ্‌গুরু যদি ইট, কাঠ, গাছ, পাথরের কাণেও মহামন্ত্র ঢেলে দেন, এক দিনে হোক্, দশ দিনে হোক্, সেই ইট, কাঠ, গাছ, পাথরকেও প্রাণবন্ত হ'তে হবে, গুরুবলে বলীয়ান্ হ'য়ে সেও জগতে অসাধ্য-সাধন ক'রে যাবে। কিন্তু সদ্‌গুরু যতই শক্তিশালী হোন্, তাঁর শিষ্য-সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য শিষ্যদের কোনও propaganda (প্রচার-কার্য্য) চালানো প্রয়োজনীয়ও নয়, উচিতও নয়।

শিষ্য কখন গুরুকে প্রচারে অধিকারী

শিষ্য তখন গুরুপাদপদ্মে লুন্ঠিত হইয়া পড়িলেন। কহিলেন,—প্রভো, তুমি যদি অধম জেনে নিজে থেকে ডেকে এ অকৃতী সন্তানকে পাদপদ্মে আশ্রয় দিতে, তা হ'লে আজ আমি কোথায় প'ড়ে থাক্‌তুম। পাপের পঙ্কে ডুবে মর্‌ছিলাম, তোমার মুখের একটী বাক্য আমাকে সে ঘোর নরক থেকে টেনে

তুলেছে। তবু বলতে হবে যে, যুবক-সমাজকে তোমার পানে টেনে আনা নিষ্প্রয়োজন এবং অপরাধ ?

রোরুদ্যমান শিশুকে শ্রীশ্রীবাবা সাদরে বুকে তুলিয়া লইলেন। তারপরে বলিলেন,—নারে, সব সময়ে অপরাধ নয়। যখন তুই জান্‌বি, তুই যথার্থ সত্যের সন্ধান পেয়েছিস্, আর সেই সত্যের সেবায় যখন তোর এক কণা ফাঁকি থাক্‌বে না, সাধন-নিষ্ঠায় এক তিল শিথিলতা থাক্‌বে না, তখন তুই যা ইচ্ছা তাই কর্, তুই নিরপরাধ ও নির্দ্দোষ। কিন্তু সাধন-নিষ্ঠায় যার এক চুল কম্‌তি আছে, সে যদি কিছু কত্তে যায়, তবেই তা' ভণ্ডামি হবে।

দেশ-সেবার অধিকার

ইতিমধ্যে অপরাপর যুবকেরা সমাগত হইলে, শ্রীশ্রীবাবা সকলের কুশল-প্রশ্নাদি করিয়া তৎপর বলিলেন,— দেশ-সেবার অধিকার এক বিরাট অধিকার, এক গুরুতর অধিকার। এ অধিকার যে-সে লোকে পায় না। মৃত্যুকে যারা ভয় কর্ব্বে না, দুঃখকে যারা গ্রাহ্য কর্ব্বে না, লাঞ্ছনাকে যারা তুচ্ছ কর্ব্বে, নিন্দা-বিদ্রূপ-গঞ্জনাকে যারা হেসে উড়িয়ে দেবে, এ অধিকার তাদের জন্য। প্রহারে যে কাঁদবে না, বারংবার ব্যর্থতায় যে হতাশ হবে না, অপমানে যার বুক ভাঙ্গবে না, আমৃত্যু স্বজন-বিচ্ছেদে যার বৈরাগ্য ও আত্মবিশ্বাস টল্‌বে না, দেশ-সেবার সেই শ্রেষ্ঠ অধিকারী। সভাস্থলে চেঁচামেচিকে যে আবশ্যকের অতিরিক্ত সম্মান দেয় না, আপন হাতকেই যে বলে জগন্নাথ, বাহুবলকেই যে জানে দৈববল, সাহসের দ্বারা যে ভীরুতাকে জয় করেছে, ত্যাগের দ্বারা যে লোভকে জয় করেছে, সংযমের দ্বারা যে কামুকতাকে জয় করেছে, সত্যের দ্বারা যে মিথ্যাচারকে জয় করেছে, দেশ-সেবার সেই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ অধিকারী। ভগবানের করুণ মূর্ত্তি যে সাক্ষাৎ দর্শন করেছে কোটি কোটি স্বদেশীয় নরনারীর ক্ষুধাক্লিষ্ট মলিন বদন-মণ্ডলে, ভগবানের রূপের বিভা যে প্রত্যক্ষ করেছে দেশের নদনদীতে, দেশের তরুলতায়, দেশের পুষ্পে-পর্ণে, দেশের মাঠে-ঘাটে, দেশের বনে-পাহাড়ে, দেশের আকাশে-বাতাসে, দেশের শীতে-গ্রীষ্মে, বর্ষায়-বসন্তে, সেই দেশ-সেবার শ্রেষ্ঠ অধিকারী।

দেশ-সেবায় বিপদ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু দেশ-সেবায় এক বিপদ আছে। সে হচ্ছে, কর্ত্তৃত্ব-লোভ। দেশের সেবা কর্ত্তে কর্ত্তে যখন জনমান্য এসে পড়ে, যা প্রত্যেক অকৃত্রিম কর্ম্মীর পক্ষেই স্বাভাবিক, তখন কর্ম্মীর ভিতরে কর্ত্তৃত্ব-লোভও আসে। এই কর্ত্তৃত্ব-লোভ তাকে ভুলিয়ে দিতে চায় যে, নিজের কণ্ঠে জয়মাল্য পরিয়ে দেওয়াই তার জীবনব্রত নয়, তার একমাত্র সাধনা হচ্ছে দেশলক্ষ্মীর কণ্ঠে জয়-মাল্য পরিয়ে দেওয়া। কর্ত্তৃত্ব-লোভ তখন দেশ-সাধকের সাধন-মন্ত্র ভুলিয়ে দেয়, নেতৃত্বের নেশা তখন তার কুশাগ্রনিন্দী অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিকেও ভোঁতা ক'রে দেয়, তার দূরদৃষ্টির অত্যুজ্জ্বল প্রভাকে মলিন ক'রে দেয়, তার কাচবৎ স্বচ্ছ হৃদয়বৃত্তিকে আবিল ক'রে দেয়, তার আকাশের মত উদার চিত্তকে ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষের হলাহলবর্ষী কৃষ্ণমেঘজালে আচ্ছন্ন ক'রে দেয়। কর্ত্তৃত্বের লোভ তাকে তখন এমনই অন্ধ করে যে, যে গৃহ-যুদ্ধ জাতীয়তার সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্ধর্ষ শত্রু, তাকেই সে পরমবন্ধু ব'লে ডেকে এনে আলিঙ্গন দেয়। অপমৃত্যুকে সে পরমায়ু ব'লে সম্বর্দ্ধনা করে। এই ভাবে নিজেরও সে সর্ব্বনাশ করে, দেশেরও সে সর্ব্বনাশ করে।

কর্ত্তৃত্ব-লিপ্সা দমনের উপায়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এরূপ সঙ্কট-স্থলে দেশ-সেবার কর্ত্তব্য হচ্ছে বহির্ম্মুখ কর্ম্মপন্থা সাময়িক ভাবে ত্যাগ ক'রে ভগবৎ-সাধনার যোগে অন্তর্ম্মুখ হওয়ার চেষ্টা করা। কোন একজন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির কর্ত্তৃত্বের অভাবে জাতি কখনও জাহান্নমে যায় না, কিন্তু কোনও প্রভাবশালী দেশকর্ম্মী যদি নিজ কর্ত্তৃত্বের নেশায় মত্ত হ'য়ে নীচ পন্থার আশ্রয় নেয়, হীন ষড়যন্ত্রের পথে পদসঞ্চার করে, তাতে জাতির জন্য ঘোরতর দুর্গতির সৃষ্টি হয়। আজ সমগ্র ভারতময় দেশ-সাধনার ডাক পড়েছে, এ সময় প্রত্যেক দেশকর্ম্মী যদি ভগবৎ-সাধনাকে অন্তরঙ্গ বন্ধু ব'লে গ্রহণ করে, দুঃখ-দুর্গম কণ্টকময় বন্ধুর পথের সাথী ব'লে সাদরে যদি ভগবৎ-সাধনাকে বুকের

পাঁজরে বেঁধে নেয়, তা' হ'লে ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস কর্ত্তৃত্ব-লিপ্সা-জনিত অসংখ্য ভ্রাতৃবিরোধের কলঙ্কময় কাহিনীর লজ্জা থেকে রক্ষা পাবে।

পুপুন্‌কী আশ্রম,
১১ই শ্রাবণ, ১৩৩৬

দেশের লোকের আসল রূপ

অদ্য পুরুলিয়া হইতে একত্রিশ মাইল পথ পদব্রজে পর্য্যটন করিয়া কয়েকটী স্কুলের ছাত্র পুপুন্‌কী আশ্রম দেখিতে আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবা প্রথমেই তাঁহাদের ব্যথাক্লিষ্ট পদদ্বয়ের পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করিলেন। তৎপরে ছেলেদের পথের নানাবিধ সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বলিলেন,—বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য দেশের যৌবন-আন্দোলন এসে ভারতের তীরেও তরঙ্গোৎক্ষেপণ কচ্ছে। তারই হয়ত ফলে তোমরা সব পর্য্যটন কত্তে বেরিয়েছ। কিন্তু বাছা, পায়ে হেটে পৃথিবী-পর্য্যটন আমাদের দেশে আজ কয় লক্ষ বৎসর ধ'রে যে চলে এসেছে, তা' নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। আমি নিজ চক্ষে এমন মহাত্মা দেখেছি, যিনি সমগ্র ভারতের প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য তীর্থ-স্থান পায়ে হেঁটে দ্বাদশবার দর্শন করেছেন। এই সব পরিব্রাজকেরা প্রাণের যে বিপুল ভক্তি-ব্যাকুলতা, যে গভীর ভগবৎ-প্রেম নিয়ে বেরুতেন, তা' যেন বাছা তোমাদেরও থাকে। যদি বল, ধর্ম্ম কর্ব্বার জন্য ত' আর পর্য্যটনে বেরুই নি, বেরিয়েছি, দেশকে দেখ্‌বার জন্যে, দেশকে চিন্‌বার জন্যে, তা' হ'লেও বলি, প্রাণভরা প্রেম চাই লক্ষ্মী, দেশকে ভগবান্ ব'লে জ্ঞান করা চাই, দেশের নরনারীকে ভগবানের বিভূতি ব'লে বিশ্বাস করা চাই। তীর্থ-পর্য্যটনে বেরিয়ে ভক্তেরা ভগবানের কত বিগ্রহ দর্শন করে, কিন্তু তারা কি বাছা অম্‌নি শুধু পুতুলটার পানে তাকিয়েই থাকে? তারা ঐ বিগ্রহের পানে দৃষ্টি দিয়ে একমনে এক ধ্যানে শ্রীভগবানের মহানাম জপ কত্তে থাকে, তাতেই তারা বিগ্রহের আসল রূপটী দেখ্‌তে পায়। দেশের লোকেরও আসল রূপ যদি দেখ্‌তে চাও, তা হ'লে নরনারী যাকে দেখবে তারই দিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে জপ্‌তে থাক,—"বন্দে

মাতরম্।" জপ্‌তে জপ্‌তে তোমার অন্তর্দ্দৃষ্টি খুলে যাবে, তখনই তুমি তোমার দেশকে ঠিক্ ঠিক্ দেখ্‌তে পাবে, ঠিক্ ঠিক্ চিন্‌তে পার্ব্বে।

প্রকৃত ধর্ম্ম

তারপর ধর্ম্মের কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণ এই যে, তার সেবা ক'রে মানুষ অভীঃ হবে, নিঃসংশয় হবে, নিরালস্য হবে। ধর্ম্মের লক্ষণ এই যে, তাতে মানুষ বিপদকে অগ্রাহ্য কর্ত্তে শিখ্‌বে, মৃত্যুকে হাসিমুখে বরণ কর্ত্তে পার্‌বে। ধর্ম্মের লক্ষণ এই যে, এতে মানুষের ত্যাগের শক্তি, আত্মদানের শক্তি, উৎসর্গের শক্তি বাড়্‌বে, আর নীচসুখাসক্তি, ভোগাসক্তি, স্বার্থান্ধতা কম্‌বে। যে ধর্ম্ম আচরণের ফলে আমরা ভীরু হ'ব, কাপুরুষ হ'ব, নপুংসক হ'ব, তা' কখনো প্রকৃত ধর্ম্ম নয়। যে ধর্ম্ম আচরণ ক'রে আমরা কপট হ'ব, স্বার্থপর হ'ব, মনে মুখে দুই হ'ব, সে ধর্ম্ম প্রকৃত ধর্ম্ম নয়। যে ধর্ম্ম আচরণ ক'রে দেশের চাইতে নিজের স্বার্থকে বড় ক'রে দেখতে যাব, যার ফলে ত্যাগের ক্ষমতা আমাদের সঙ্কুচিত হ'বে, ভোগের লুব্ধতা আমাদের বর্দ্ধিত হবে, তার নাম ধর্ম্ম নয়। যে ধর্ম্ম আমাদের জাতীয় ঐক্য-সাধনার বিরোধী, পর-শ্রীকাতরতার প্রশ্রয়কারী, খলতার বর্দ্ধনকারী, তা' কখনো ধর্ম্ম নামে অভিহিত হ'তে পারে না। যে ধর্ম্ম ভণ্ডামির আশ্রয় নিয়ে তবে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে, যে ধর্ম্ম সত্যের সংশ্রবে এসে মলিন ও নিষ্প্রভ হ'য়ে পড়ে, যে ধর্ম্মজ্ঞানের চাইতে অজ্ঞানকে বেশী কদর দেয়, তা' কখনও ধর্ম্ম হ'তে পারে না।

পুপুন্‌কী আশ্রম,
১২ই শ্রাবণ, ১৩৩৬

পুপুন্‌কী আশ্রম ও বৃহত্তর বাঙ্গলা

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা ত্রিপুরা-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখককে লিখিলেন,—

"কি কঠোর পরিশ্রম এবং কত বড় কৃচ্ছ্রতার মধ্য দিয়া যে এই আশ্রমের

প্রতিষ্ঠা-কার্য্য অগ্রসর হইতেছে, তাহা বর্ণনা করিবার ভাষারই অভাব। তোমরা যদি সম্মুখে থাকিতে, তাহা হইলে স্বচক্ষে দেখিয়া কিছু কিছু বুঝিতে পারিতে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস দারুণ অন্নকষ্ট সহিয়া যদি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে, তবে আরও একটু বুঝিতে। কিন্তু সকল ক্লেশের ভাগ লইয়া, সকল শ্রমের অংশ গ্রহণ করিয়া তারপরে যদি কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক কোনও ব্যাধিতে পড়িয়া সময়মত বালির জল ও দু-ফোঁটা ঔষধ না পাইবার অসহায়তার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করিতে পার, তাহা হইলে এখানকার অবস্থার সত্য সত্য উপলব্ধি মহাকবি-সুলভ কল্পনা-শক্তির বলেও করা সম্ভব হইবে না। একজন কর্ম্মী একটা বৎসর কি যে অমানুষ শ্রম করিয়া আজ হৃৎপিণ্ডের দুরারোগ্য রোগে প্রতিনিয়ত মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করিতেছে, শূন্য উদরে খাটিতে খাটিতে অপর একজন আজ কত যে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, উঠিতে বসিতে চলিতে ফিরিতেও যে সে অপারগ, তৃতীয় একজন যে আজ কুড়ি বাইশ দিন ধরিয়া টাইফয়েডের সঙ্গে জীবন-মরণের কি লড়াই চালাইতেছে, এ সকলের চিত্র আমি পত্র দ্বারা কি আঁকিব? দারুণ গ্রীষ্মে জলের অভাবে কতদিন আমরা শুষ্ক কণ্ঠে বাক্‌শক্তিরহিত পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছি, তাহা এখানে আসিয়া একবার নিদাঘ দ্বিপ্রহরের প্রতপ্ত রৌদ্রে প্রায়ার্দ্ধ মাইল দূরবর্ত্তী ক্ষীণ নির্ঝরের ধার পর্য্যন্ত হাঁটিয়া না গেলে শুধু পত্র পড়িয়া কি বুঝিবে? জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন নির্ঝর শুকাইয়া গিয়াছে, বরদা গিয়া হাত-খানিক পাথর কাটিয়াও যখন এক বিন্দু জল বাহির করিতে পারে নাই, গাতি মারিতে মারিতে যখন তাহার হাতে অগণিত ফোস্কা পড়িয়া গিয়াছে, সেই ফোস্কাগুলি ফাটিয়া যখন দরবিগলিত ধারে রক্ত ঝরিয়া পড়িয়াছে, অথচ তখন পর্য্যন্ত ঝর্‌ণার কঠিন নির্ম্মম বক্ষ হইতে এক কণা স্নেহরস বহির্গত হয় নাই, তখন শ্রান্ত, ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত বরদার চ'খের জল পার্শ্ববর্ত্তী বালুকা-বিস্তারের উপরে কেমন করিয়া বৃথাই পতিত হইয়া বাষ্প হইয়া শুকাইয়া গিয়াছে, তাহা যাহারা স্বচক্ষে দেখে নাই, তাহারা পত্র পড়িয়া আর কতটুকু উপলব্ধি করিবে? জীর্ণ কুটীরখানার উপর হইতে, নীচ হইতে, পার্শ্ব হইতে যখন সমভাবে জলধারা বর্ষিয়াছে, আর

পাঁচটী সহকর্ম্মীসহ আমি সমগ্র রাত্রি ভিজা বিছানায় বসিয়া সারাদিনের কর্ম্মশ্রান্ত বিশ্রামলোলুপ অলস দেহকে তন্দ্রায় ঢুলিয়া ঢুলিয়া বিশ্রাম দিয়াছি, অন্ধকার রজনীতে যখন খরিশ (গোখুরা) সাপের দল মূষিকের লোভে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমগ্র রজনীব্যাপী বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়াছে, অথচ দিয়াশলাই ভিজিয়া গিয়াছে বলিয়া অন্ধকার গৃহ হইতে বহির্নিক্রান্ত হইবার চেষ্টাটুকু পর্য্যন্ত কেহ করিতে পারে নাই, বরদার শিয়রে, যখন গভীর নিশীথে এক কাল-সর্প দংশনোদ্যত হইয়া সৌভাগ্যক্রমে মানুষটাকে দংশন না করিয়া তাহার শিয়রের বালিশটাকে দংশন করিয়াই ক্রোধাগ্নির পরিনির্ব্বাণ ঘটাইয়াছে, তখন যাহারা প্রত্যক্ষদর্শী হয় নাই, তাহারা এই স্বেচ্ছাবৃত কষ্ট এবং বিপদের পরিমাণ বুঝিতে কিছুতেই সমর্থ হইবে না। পায়ে একটা বিরাট ক্ষতের স্ফীতি ও তীব্র যন্ত্রণা লইয়া তারাপদ আজ কয়দিন ধরিয়া রাত্রি এগারটা বারোটা পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে মাঠের কাজ হারিকেন লণ্ঠন জ্বালিয়া করিতেছে, কল্য রাত্রির আহারই করিয়াছি একটা বাজিবার পরে। এই সকল বিষয় কত আর বর্ণনা করিব ?

"বলিতে পার, এত কষ্ট সহিবার দরকার কি ? তাহার উত্তর এই যে, ধনীর পকেট হইতে টাকা বাহির করিবার বিদ্যা নহে, অভিক্ষাই পরপদানত ভারতের কর্ম্ম-সিদ্ধির সাধন-মন্ত্র, এবং অভিক্ষার এই আদর্শের প্রতিষ্ঠা গেরুয়া-বিলাসীর কর্ম্ম নয়। দ্বিতীয় কথা এই যে, বাঙ্গলার বাহিরে যদি সত্যিকার কোনও বৃহত্তর বাঙ্গলা সৃষ্টি করিতে হয়, তবে তাহার জন্য যে সকল কর্ম্মীর প্রয়োজন, তাহারা এইরূপ কঠোর কর্ম্ম-সংগ্রামের মধ্য দিয়াই আত্ম-গঠন করিবেন। ভোগী বাঙ্গালীরা গিয়া বড় বড় নকড়ী-চাকুরী লইয়া বাঙ্গলার বাহিরে বৃহত্তর বাঙ্গলা গড়িবেন, এ সকল নিতান্ত মূল্যহীন চিন্তা। বজ্রের মত কঠোর সংযম ও সহিষ্ণুতার শক্তি লইয়া যাঁহারা সেবা ও ত্যাগের সম্ভার সাজাইয়া পূজারীর বেশে দিগ্‌বিদিকে ছড়াইয়া পড়িবেন, তাঁহারাই বৃহত্তর বাঙ্গলা এবং মহত্তর বাঙ্গলাকে গড়িবেন। দিল্লীতে যাইয়া একদল বাবু-বাঙ্গালী বিশ্ব-কবির কোনও বিখ্যাত নাটক অভিনয় করিলেই বৃহত্তর বাঙ্গলা সৃষ্ট হয় না, লাহোরে বসিয়া একদল কল্পনা-কুশল বাঙ্গালী

সাহিত্যিক-সভার অনুষ্ঠান করিলেই বৃহত্তর বাঙ্গলা সৃষ্ট হয় না, লক্ষ্ণৌতে মিলিয়া একদল কবি-বাঙ্গালী হরেক রকম রাগ-রাগিণীতে সঙ্গীতের মজলিশ উচ্ছ্বসিত করিলেই বৃহত্তর বাঙ্গলা সৃষ্টি হয় না। বৃহত্তর বাঙ্গলার সৃষ্টি সম্পর্কে এই সকলের গৌণ প্রয়োজন আছে, কিন্তু মুখ্য প্রয়োজন যাহার, তাহা হইতেছে ত্যাগ-সমর্থ, সেবা-সমর্থ, স্বার্থবুদ্ধিহীন, সম্প্রদায়-বুদ্ধি-বর্জ্জিত, দধীচির পদাঙ্কানুসারী, মৃত্যুতুচ্ছকারী কর্ম্মীদের। এই সকল কর্ম্মী কুসুম-শয়নে বা বিলাস-ভবনে প্রস্তুত হয় না।

"বুঝিতেছি, কর্ম্মীরা মৃতপ্রায়; বুঝিতেছি, আমিও মৃতবৎ কর্ম্ম-সামর্থ্যহীন হইয়া পড়িতেছি। কিন্তু অভিক্ষার আদর্শ এক অতি ভয়ঙ্কর আদর্শ। আমার নিজের অথবা আমার কোনও কর্ম্মীর মৃত্যুকে আমি অভিক্ষার কুরুক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া কোনও মূল্যদান করিতে প্রস্তুত নহি। এরূপ ক্ষেত্রে মৃত্যুই শ্লাঘ্য, আত্মরক্ষার চেষ্টা কাপুরুষতা। দূর হইতে তোমরা আমাকে অথবা আমার কর্ম্মকে সদুপদেশ দিতে বিরত হইলেই আমি সুবিধাজনক মনে করি। পার যদি, আমার সঙ্গে আসিয়া অনশন, অর্দ্ধাশনের সঙ্গে সঙ্গে কোদাল মার গাতি চালাইতে চালাইতে এখানেই মরিয়া যাও, নতুবা চুপ্ করিয়া থাক। মাসেক পূর্ব্বে যখন একবার আমি পুরুলিয়া গিয়াছিলাম, তখন সেখানকার হোম্‌রা চোম্‌রা উকিলের দল বারংবার আমাকে বলিতে লাগিলেন,—'স্বামীজী, আপনি যাহা করিতেছেন, তাহা অদ্ভুত, তাহা অভাবনীয়, আপনিই দেশের যথার্থ সেবা করিতেছেন।' উত্তরে আমি কোনও প্রকার বিনয় প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করি নাই। আমি স্পষ্টভাবে বলিয়াছিলাম,—'আমি যখন দেখিতে পাই যে, আমার কার্য্য দেখিয়া লোকে ধন্য ধন্য করিতেছে, কিন্তু আমার শ্রমের ভাগ লইতে আমার কষ্টের লঘুতা সাধন করিতে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া কোনও প্রকার ত্যাগ-স্বীকারে প্রস্তুত হইতেছে না, তখন আমি সিদ্ধান্ত করি, লোকগুলি চাটুকার এবং ভণ্ড।'

"সর্ব্বশেষে ধনীদের কথা বলি। ভগবান্ যাঁহাদিগকে ধনী করিয়াছেন কিম্বা ভুজবলে যাঁহারা অগাধ ধন-সম্পদ অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত আমার মাত্র একটী সম্বন্ধ থাকিতে পারে। সেইটি এই যে, স্বয়ং-প্রেরিত হইয়া তাঁহারা

অভিক্ষুর হাতে সহযোগ-হস্ত মিলাইতে আসিবেন। অভিক্ষু যাইয়া ধনীদের অনুকম্পা আকর্ষণের জন্য তাঁহাদের দুয়ারে দাঁড়াইয়া আত্ম-প্রশস্তির জয়-ঢক্কা নিনাদিত করিবেন, ইহা অভিক্ষার আদর্শের অনুপ্রাণনা নহে।"

পত্রখানা শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন সত্য, কিন্তু যাঁহার উদ্দেশ্যে লিখিলেন, পত্র পাঠে তাঁহার মনে কষ্ট হইবে মনে করিয়া আর ডাকে দিলেন না।

কলিকাতা,

২১শে শ্রাবণ, ১৩৩৬

অলৌকিক ব্যাপার ও মহাপুরুষত্ব

দিন কয়েক হয় পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবা কলিকাতা আসিয়াছেন। অদ্য বৈকাল বেলা কতিপয় যুবক সাধু-দর্শনে সমাগত হইলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আমি যে এসেছি, টের পেলি কি ক'রে রে?

একজন যুবক বলিলেন,—কেন, ভবানীপুরে না একজন আছেন, আপনি ভবানীপুর কোথাও গেলে গায়ের গন্ধে আপনাকে যিনি খুঁজে বের করেন,—কোন্ বাড়ীতে আপনি আছেন, তার ঠিকানা দিতে হয় না?

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—তোরাও সেই রকম নাকি?

যুবক বলিল,—কতকটা সেই রকমই বৈকি?

একটী যুবক আজই প্রথম শ্রীশ্রীবাবার নিকটে আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন—আচ্ছা বাবা, আপনার গায়ে কি কোনো বিশেষ গন্ধ সত্যি সত্যিই আছে নাকি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শুঁকেই দেখ্ না!

যুবক শ্রীশ্রীবাবার শরীরের ঘ্রাণ লইয়া বলিল,—কই, আপনার শরীরের গন্ধও ত' আমাদেরই মত।

অপর একটী যুবক বলিলেন,—আপনার শরীরের গন্ধ যদি আমাদের শরীরের মতনই হ'ল, তা হ'লে ত' দেখছি, এসব আপনার বুজরুকী।

শ্রীশ্রীবাবা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—বোকা ছেলে, আমার বুজরুকী হ'তে

যাবে কেন? বুজরুকী হচ্ছে তার, যে গন্ধ পায়, এবং গন্ধ দিয়ে খুঁজে বে'র করে। পুপুন্‌কীর মাঠে আমি হয়ত কোদাল চালাচ্ছি, আর হঠাৎ কাশীতে বা হরিদ্বারে ব'সে যদি কেউ তার রুদ্ধ গৃহের মাঝখানে আমাকে দেখতে পায়, তবে বুঝতে হবে যে, ওটার ভিতরে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই, কৃতিত্ব তাঁর, যিনি দেখ্‌তে পান।

প্রথম যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচ্ছা বাবা, সত্যি সত্যি এ রকম ঘটনা কখনো ঘটে?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কেন ঘটবে না? অজস্র ঘট্‌ছে, অহরহ ঘট্‌ছে। একটু সাধন-ভজন কর, তোমরাও এ রকম কত বুজরুকী দেখবে। অবশ্য, এইটী মনে রেখো, অলৌকিক-দর্শনই মহাপুরুষের লক্ষণ নয়।

অব্যভিচারিণী ভক্তিই দিব্য-দর্শনাদির কারণ

নবাগত যুবকটী জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচ্ছা বাবা, এ সব দর্শনের কারণ কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অব্যভিচারিণী ভক্তি এবং অনন্যপ্রযত্ন সাধন-নিষ্ঠা। যে যার কথা ধ্যান করে, সে তাকে শত যোজন দূর থেকেও দেখ্‌তে পায়, তার বাণী শুন্‌তে পায়, তার চরণ-স্পর্শ কত্তে পায়, তার অঙ্গ-সৌরভ লাভ করে। ভগবান্‌কে যে ভালবেসেছে, সে ভগবানকেই দেখ্‌তে পায়, মানুষকে যে ভালবেসেছে, সে মানুষটাকেই দেখ্‌তে পায়, আর পুঁই-মাচা আর কুমড়া-ঝাঁকাকে যে ভালবেসেছে, সে পুঁই-মাচা আর কুমড়া-ঝাঁকাই দেখ্‌তে পায়।

পর-চিত্ত-জ্ঞান

নবাগত যুবকটী জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচ্ছা বাবা, Thought Reading (পরচিত্ত জ্ঞান)ও কি এই ভালবাসারই ফল?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভালবাসা প্রিয়জনের মনের কথা জানিয়ে দেয় সত্য, কিন্তু অন্য উপায়ে প্রিয়াপ্রিয় সকল লোকেরই মনের কথা জানা যায়, সেখানে ভাল-

বাসার প্রয়োজন হয় না। প্রেমের ফলে যে স্বাভাবিক পর-চিত্ত-জ্ঞান, তাতে প্রেম বাড়ে বৈ কমে না। যেমন, ছাত্র তার মাষ্টার-মশাইকে বড্ডই ভালবাসে, মাষ্টার-মশায়ের পিপাসা পেয়েছে কিন্তু এতই কার্য্যব্যস্ত তিনি যে, ছাত্রকে পানীয় আন্‌তে বল্‌বার তাঁর ফুরসুৎ নেই। ছাত্র ব'সে ব'সে অঙ্ক কষ্‌ছিল, হঠাৎ সে মনে মনে মাষ্টার মশাইর পিপাসার কথা জান্‌তে পার্‌ল। অমনি সে অঙ্ক ফেলে রেখে বল্লে,—মাষ্টার মশাই, একটু বাইরে থেকে আসি? মাষ্টার তখন খাতার সমুদ্রে ডুবে আছেন, ঘাড় নেড়ে জানালেন,—আচ্ছা। কিছুক্ষণ পরেই ছাত্র এক-হাতে এক গ্লাস জল, অপর হাতে এক গ্লাস সরবৎ নিয়ে এসে বল্লে,—এই নিন্। মাষ্টার ত' অবাক্! ছাত্রের এই যে প্রেমজ পরচিত্ত-জ্ঞান, তাতে প্রেমই বেড়েছে। কিন্তু অন্য উপায়ে যে পরচিত্ত-জ্ঞান, তাতে অনেক সময় যোগবিঘ্ন ঘটে, অনেকের পতনও হয়। অতিথি আহারে ব'সেছেন, গৃহস্বামী নিকটেই উপস্থিত। তাঁর রক্তবর্ণ অস্বাভাবিক চক্ষু দেখে অতিথি জিজ্ঞেস কর্ল্লেন,—আপনাকে এ রকম দেখাচ্ছে কেন? গৃহস্বামী বল্লেন,—একটা বিভীষিকা দেখেছি। বল্‌তেই অতিথির ভিতরে পরচিত্ত-জ্ঞান আবির্ভূত হ'ল, তিনি স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলেন, গৃহস্বামীর ছেলেটাকে অতিথি সাধু বনাবার জন্য চুরী ক'রে নিয়ে যাবার আশঙ্কা ক'রে গৃহস্বামী তাঁকে হত্যা ক'রে ফেল্‌বার সঙ্কল্প ক'রেছেন। অতিথি বল্‌লেন,—কেমন, একটা সদ্য-পরিচিত লোকের ছিন্ন মুণ্ড দেখতে পেয়েছেন ত'? গৃহস্বামী বুঝ্‌লেন যে, ধরা প'ড়ে গেছেন। তখন নানা কথা ব'লে বিভীষিকা দর্শনের কথাটা চাপা দিলেন এবং নিজের মন্দ সঙ্কল্পও ত্যাগ কল্লেন। কিন্তু তখন অতিথির অবস্থাটা কেমন? অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত ঘাতকের গুপ্ত ষড়যন্ত্রের চিন্তায় তাঁর চিত্ত অস্থির রইল এবং অনেক রাত্রির পর চিত্ত স্থির ক'রে তিনি নিদ্রাগত হ'লেন। এ সব স্থলে পরচিত্ত-জ্ঞান যোগবিঘ্ন।

একটী যুবক বলিলেন,—তা' কি ক'রে বলি? সে দিন যদি অতিথি গৃহস্বামীর মনের কথা না জান্‌তে পারতেন, তা হ'লে হয়ত সেই রাত্রিতেই তাকে ইহলীলা সাঙ্গ কত্তে হ'ত।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—না রে না। যার যখন মৃত্যু হবার, তার ঠিক্ তখনি হবে। জোর ক'রে কেউ কাউকে মারতে পারে না। কাঁচা যোগী মৃত্যু-ভয়কে জয় কত্তে পারেন নি, তাই এ স্থলে পরচিত্ত-জ্ঞান তাঁর মানসিক শান্তিকে বিপর্য্যস্ত ক'রে যোগভঙ্গ ঘটালে। আর একটী ঘটনার কথা শুন্‌লেই সব স্পষ্ট বুঝতে পার্ব্বি। হাওড়া শিবপুরে মিছরিলাল চাটুয্যে ব'লে একটী ছেলে ছিল, খুব ভাল ছেলে, খুব উচ্চ স্তরের যোগীদের থাকের ছেলে। অনেক বড় বড় সাধুদের সে সঙ্গ ক'রেছিল, অনেকের কাছ থেকে অনেক সদুপদেশ পেয়েছিল এবং ধীর, স্থির, শান্ত ভাবে আস্তে আস্তে এগিয়েও যাচ্ছিল খুব। এক থিয়োসফিষ্ট বন্ধুর সঙ্গ ক'রে ক'রে একবার তার বিষম ঝোঁক চেপে গেল Thought Reading শেখ্‌বার জন্য। থিয়োসফিষ্টদের ধর্ম্ম জ্ঞান এবং প্রেমের ধর্ম্ম। কিন্তু থিয়োসফিষ্ট-সাহিত্য যারা ভাসা-ভাসা ভাবে পড়ে, বিভূতির দিকে তাদের জানি কেমন একটা ঝোঁক চেপে যায়। মিছরিলালের মাথায় সেই পোকা ঢুক্‌ল। এক মহাত্মাকে সে খুব বিশ্বাস কর্ত্ত এবং গোপনে গোপনে তাঁর কাছে যাতায়াতও কত্ত। তাঁকে এসে সে ধর্‌ল,—মশায়, পরচিত্ত-জ্ঞান শিখাতে হবে। মহাত্মা যত বলেন,—না, মিছরিলাল আরো তত বাঘের মত চেপে ধরে। তখন মহাত্মা মিছরিলালের গালে খুব ক'ষে দুই ঘা চড় মেরে ঘাড়ে ধ'রে আশ্রম থেকে বের ক'রে দিলেন। রাগের ঝোঁকে মিছরিলাল মহাত্মাকে ভণ্ডযোগী ব'লে মনে মনে গাল দিতে দিতে যাই রাস্তায় পা দিয়েছে, অম্‌নি টের পেল, তার পরিচিত্ত-জ্ঞানের ক্ষমতা এসে গেছে। রাস্তা দিয়ে এক ধাঙ্গর যাচ্ছিল ঝাঁটা ঘাড়ে ক'রে, তাকে দেখা-মাত্রই মিছরীলাল জান্‌তে পাল্ল যে, রাস্তা ঝাঁটাতে ঝাঁটাতে সে একটী টাকা কুড়িয়ে পেয়েছে এবং টাকাটি দিয়ে মদ খাবে এবং স্ফূর্ত্তি কর্ব্বে ব'লেই সে আনন্দ-সহকারে শুঁড়ীর দোকানের দিকে যাচ্ছে। ট্রামে চেপে বস্‌তেই সে দেখ্‌ল, তার সাম্‌নে একজন ডাক্তার ব'সে আছে, আর সে ভাব্‌ছে, তিন মাস পর্য্যন্ত চিকিৎসা ক'রে একটী ভদ্রঘরের কুলবধূর সঙ্গে সে যতটা খাতির সৃষ্টি করেছে, তারপরে আর কতটুকু অগ্রসর হ'লে সে বউটীকে কুলের বার কত্তে পারে। ডাক্তারের পাশেই

একটী মাড়োয়ারী বণিক বসেছিল। তার পানে তাকাতেই মিছরিলাল টের পেল মাড়োয়ারী ভাব্‌ছে, সকল পাওনাদারকে ফাঁকী দিয়ে কি উপায়ে সে সট্‌কে পড়্‌তে পারে। তার পাশেই একটী কলেজের ছাত্র ব'সেছিল, তার মুখ পানে তাকাতেই মিছরিলাল দেখতে পেল, যুবকটী একটী কুমারী মেয়ের রূপ তন্ময় হ'য়ে ধ্যান কচ্ছে আর মুহুর্মুহু প্রাণেশ্বরী, হৃদয়েশ্বরী, প্রেয়সী, প্রিয়তমে প্রভৃতি ব'লে সম্বোধন কচ্ছে। এই রকম যার পানে সে তাকায়, তারই মনের কথাগুলি তার কাছে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। নূতন বিদ্যালাভ ক'রে প্রথম দু-তিন দিন মিছরিলালের বেশ আনন্দের মধ্য দিয়েই গেল। কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখে, নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক যার চরিত্র, সেই মিছরিলালের মন অতি কদর্য্য ও অকথনীয় পাপে লিপ্ত হ'তে চাচ্ছে। এমন সব কু-কার্য্যে তার রুচি আস্‌ছে, নিতান্ত জঘন্য নারকীও যার বিষয়ে চিন্তা কত্তে পারে না। মনকে যতই সে দমন কত্তে চায়, মন ততই অবাধ্য হ'য়ে ওঠে। কারণ, যে-কোন লোকের মুখপানেই সে তাকাচ্ছে, অমনি তার মনের সকল কথা যেন চোখের সাম্‌নে ছবির মত হ'য়ে ফুটে উঠ্‌ছে। আর, সকলের মনেই মিছরিলাল দেখ্‌তে পাচ্ছে কি? না অধিকাংশস্থলেই কাম-চিন্তা। কেউ পরের মেয়েকে বে'র করে এনেছে, কেউ অগম্যা গমন কচ্ছে, কেউ ভ্রূণ-হত্যার ফিকিরে আছে. কেউ বেশ্যার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। এক বৈষ্ণব বাবাজী মিছরিলালকে একটী তুলসীর মালা আর জপের আধারী দিয়েছিলেন, ছুটে গেল মিছরি তাঁর কাছে। গিয়ে দেখে হরি—হরি, তিনি এমন সব কদর্য্য পাপের চিন্তা কচ্ছেন যে, তাঁর কাছে ব'সে থাকাই অসম্ভব। ছুটে গেল মিছরি এক দেব-মন্দিরে। পুরোহিতের মুখপানে তাকাতেই মিছরির অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল, দেবতার আরতি দেখ্‌তে যে সব নব-যুবতীরা সন্ধ্যার সময়ে মন্দিরে আসে, তাদেরই একজনের উপরে বলাৎকারের উপায় চিন্তা তিনি কচ্ছেন। সেখান থেকে বেরিয়ে গেল মিছরি আর এক নাম-জাদা সাধুর আশ্রমে, সাধু তখন শাস্ত্র-পাঠ ক'রে শিষ্য ও সমাগত ভক্তদের নিকট ব্যাখ্যা কচ্ছিলেন। কিন্তু মিছরি তার মুখের পানে তাকাতেই দেখতে পেল, মনে মনে তিনিও এমন একটী অবৈধ বিষয়ের চিন্তা কচ্ছেন, যা সাধু ত' দূরের কথা,

সাধারণ গৃহীর পক্ষেও নিতান্ত অধর্ম্ম। গেল মিছরিলাল এক বন্ধুর গৃহে, বন্ধু বল্লে এইখানেই খেয়ে যা। মিছরিলাল খেতে ব'সেছে, বন্ধুর মা খাবার পরিবেশন কচ্ছেন, হঠাৎ তাঁর দিকে মিছরির দৃষ্টি পড়তেই মিছরি দেখতে পেল, তিনি সপত্নী-পুত্রকে বিষ খাইয়ে মারবার উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছেন। মিছরিলাল অস্থির হ'য়ে উঠল। কি এক বিদ্যা এসে ভূতের মত কাঁধে চেপেছে, এখন এ ভূত কাঁধ থেকে না নাম্‌লে ত' আর প্রাণ বাঁচে না। সাধন-ভজন চুলোর দোরে গিয়েছে দিবারাত্রি কেবল পরের চিন্তা, কেবল পাপ-চিন্তা শেষটায় মিছরিলাল সেই মহাত্মার কাছে এসে হাজির হ'ল যাঁর চড় খেয়ে তার এই দুর্দ্দশা হ'য়েছে। মহাত্মা বল্লেন,—কেন বাবা, আগেই ত' নিষেধ করেছিলাম !

নীরব-সাধক মিছরিলাল

ইহার পরে স্বভাবতই কথাবার্ত্তা ৺মিছরিলালের সাধন-জীবন সম্বন্ধে চলিতে লাগিল। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মিছরিলাল ছিল সুতীব্র সাধক, কিন্তু নীরব-সাধক। অহর্নিশ সে ভগবানের নামে লেগে থাক্‌ত, কিন্তু সে যে যোগদীক্ষায় দীক্ষিত, এ কথা তার মৃত্যুকালের পূর্ব্বে তার বাপমাও জান্‌তে পারেন নি। মৃত্যুকালে অবিরত সে ভগবৎ-পাদপদ্ম স্মরণ করেছে এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ভগবানের পাদপদ্মেই লয় করেছে। তার জীবনে হুজুগের স্থান ছিল না, অতি গোপনে, অতি সন্তর্পণে কাজ ক'রে ক'রে এমন এক উন্নত জীবন সে গ'ড়ে তুলে-ছিল, যা অনেক বড় বড় সাধকদেরও লোভের সামগ্রী। নামে মন মজলে যে ভোগ-বাসনা ক্ষয় পায়, কাম-ক্রোধ দূরে যায়, মিছরিলালের জীবন ছিল তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দুন্দুভি-নিনাদে সংযমের মহিমা যদি প্রচার ক'রে যাও, তবু তাতে ইন্দ্রিয় জয় হবে না। কিন্তু জীবনকে যদি অন্তর্যোগের পথে পরিচালনা কর, সাধনের মহিমায় ইন্দ্রিয়-সংযম আপনি প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যাবে। মিছরিলালের জীবন ছিল তারই একটী নীরব উদাহরণ। পর-চিত্ত-জ্ঞান এক প্রকারের পরচর্চ্চা। এ থেকে সে যখন নিজেকে সরিয়ে নিল, তখনই তার সুরু হ'ল প্রকৃত সাধন-জীবন।

কলিকাতা

২২শে শ্রাবণ, ১৩৩৬

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমতের কথা আলোচিত হইতেছিল। এক একজন এক একটী মতের সমর্থন করিতেছিলেন।

উদারতা ও গোঁড়ামি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমতের ও ধর্ম্মপথের বিষয় শ্রদ্ধা সহকারে আলোচনা করা হিতকর। কিন্তু যেরূপ আলোচনার ফলে নিজের গৃহীত সাধন-ধর্ম্মে নিষ্ঠা হ্রাস পেতে পারে, সেরূপ আলোচনা সঙ্গত নয়। ধর্ম্ম-বিষয়ে উদারতা যেমন প্রশংনীয়, আবার আত্মনাশকর উদারতা তেমনি নিন্দনীয়। ধর্ম্ম-বিষয়ে সঙ্কীর্ণতা যেমনই নিন্দনীয়, আবার সাধন-নিষ্ঠাবর্দ্ধক দৃঢ়তা তেমনি প্রশংসনীয়। ধর্ম্মান্ধতা ধর্ম্মের প্রকৃত মর্য্যাদাকে হ্রাস করে, সর্ব্বমঙ্গলনিলয় ভূতনাথকে ধুতূরা খাইয়ে আচ্ছন্ন ক'রে দিয়ে তার অনুচর উচ্ছৃঙ্খল ভূতগুলির একাধিপত্য বিস্তার করে। আবার অনুচিত উদারতা চোরের কাছে সিন্ধুকের তালা-চাবি গচ্ছিত রাখে, লম্পটের কাছে কুলনারীর তত্ত্বাবধান ছেড়ে দেয়, মিথ্যাবাদী মিথ্যাচারী মিথ্যাসক্ত ধূর্ত্তের নিকটে সত্য, ধর্ম্ম ও সরলতাকে সমর্পণ করে। দুটোরই ফল সমান, অর্থাৎ সর্ব্বনাশ। নিজের পথ ছাড়া অন্য পথে সত্য নেই, এরূপ ধারণা যারা করে, তারা বুদ্ধিহীন বর্ব্বর। আবার, সকল পথেই যখন সত্য আছে, তখন আমার নিজের পথে নিষ্ঠা সহকারে লেগে থাকার আর কি প্রয়োজন আছে, এরূপ ধারণা যারা করে, তার চক্ষুষ্মান হ'য়েও অন্ধ। বর্ব্বরেরা বিনা প্রয়োজনে রাস্তার থাম, লোকের বাড়ীর দেওয়াল ও পথচারী গরু-মহিষের সাথে লড়াই বাধায় এবং নিজ সাধন-পথেই অনর্থ সৃষ্টি করে। আর, চক্ষুষ্মান্ অন্ধেরা আকাশের দিকে তাকিয়ে পথ চলে ব'লে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্তে, রাস্তার নগণ্য ড্রেইনে হোঁচট খেয়ে প'ড়ে মরে। সুতরাং অতিরিক্ত গোঁড়ামীও ভাল নয়, অতিরিক্ত উদারতাও ভাল নয়।

কলিকাতা
২৩শে শ্রাবণ, ১৩৩৬

জিজ্ঞাসুদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইতেছে। সকল প্রশ্ন শ্রীশ্রীবাবার নিকট লিখিতভাবে রক্ষিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীবাবা একটীর পর একটী করিয়া শ্লিপ তুলিয়া পড়িতেছেন আর জবাব দিতেছেন। কে কোন্ প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহা এক প্রশ্নকর্ত্তা ব্যতীত অপরে জানিতে পারিতেছেন না, কিন্তু উত্তরগুলি সকলেই শুনিতেছেন।

ভগবান্ কি সাকার না নিরাকার ?

একটী প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবান্ সাকারও বটেন, নিরাকারও বটেন, সাকার-নিরাকারের অতীত অব্যক্তকারও বটেন। যিনি আকার ধারণ কত্তে পারেন, তাঁকে বলে সাকার। যিনি আকার ধারণ করেন না, তাঁকে বলে নিরাকার। যিনি আকার ধারণ ক'রেও সাকার নন, আকার ধারণ না ক'রেও নিরাকার নন, তিনি অব্যক্তাকার। ভগবানকে সাকার ব'লে সীমাবদ্ধ করা যায় না, তাঁকে নিরাকার ব'লেও সীমাবদ্ধ করা যায় না। সাকার হওয়া বা নিরাকার হওয়া সবই তাঁর ইচ্ছাধীন। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের কারো ইচ্ছাধীন নন। তিনি ইচ্ছা করলেই সাকার হ'তে পারেন, ইচ্ছা করলেই নিরাকার হ'তে পারেন, ইচ্ছা কল্লে ই এমন অনির্ব্বচনীয় অবস্থায় থাক্‌তে পারেন, যাকে সাকারে অবস্থিতিও বলা চলে না, নিরাকারে অবস্থিতিও বলা চলে না। যিনি অসীম, তিনি সকল বিষয়েই অসীম। অধিকাংশ শাস্ত্র বলেন, তিনি নিরাকার। কিন্তু তাই ব'লে তিনি সাকার হ'তে পারেন না, এ কথা শাস্ত্র বলেন না। বহু বহু সাধকেরা বলেন, তিনি সাকার, কিন্তু তাই ব'লে তিনি নিরাকার হ'তে পারেন না, এ কথা সাধকেরা বলেন না। বল্‌বেনই বা কি ক'রে ? তাঁর যে লীলার অন্ত নেই, তাঁর যে মহিমার পারাপার নেই, সীমা-সংখ্যা-রহিত তাঁর বৈচিত্র্য। এজন্যই তিনি সাকার না নিরাকার, তা' নিয়ে তর্ক করা উচিত নয়।

স্বকীয় সত্যে সুস্থির হও

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তবে, এ প্রশ্ন কত্তে পার যে, তুমি কি ভাবে তাঁর ভজনা কর্ব্বে, কি ভাবে তাঁর অর্চ্চনা কর্ব্বে, কি ভাবে তাঁর সেবা কর্ব্বে, কি ভাবে তাঁতে মনকে ডুবাবে ? তোমার জন্য পন্থা কি হবে, মাত্র সেইটীই তোমার প্রশ্ন হ'তে পারে। এ প্রশ্নের জবাবও সোজা। তোমার চিত্ত-সংস্কার যেমন, তোমার ভজনের প্রণালী হ'বে তেমন, তোমার সাধনার পদ্ধতি হবে তেমন। জগতে যত যত সাধন-প্রণালী আছে তার একটী থেকে আর একটী পৃথক্, একথা সত্য। কিন্তু সবগুলিরই প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে এক। সেইটী হচ্ছে, একটী মাত্র ক্ষুদ্র সত্যের কাছে সম্যক্ আত্মসমর্পণ ক'রে তার ভিতর দিয়ে নিখিল সত্যের সাক্ষাৎ-কার, এক একটী প্রারম্ভিক সত্যের নিকটে আত্মাহুতি দিয়ে একেবারে চরম সত্যের মাঝে ডুবে যাওয়া। এই ক্ষুদ্র সত্য, এই প্রারম্ভিক সত্য এক এক জনের কাছে এক এক রকম। যে যেমন প্রতিবেশে প্রতিপালিত হ'য়েছে, যে নিজের মধ্যে যেমন বংশ-সংস্কারকে বিকশিত ক'রেছে, তার এই প্রারম্ভিক সত্য তেমন। তোমরা এইরূপ প্রতিবেশের ভিতর দিয়ে পালিত ও পোষিত হ'য়ে এসেছ, যাতে তোমাদের নিকটে ভগবানের একটী সসীম বিগ্রহই প্রারম্ভিক সত্য। অপর একজন এরূপ প্রতিবেশের ভিতর দিয়ে পালিত ও পোষিত হ'য়ে এসেছে, যাতে কোনও সসীম বিগ্রহ তার পক্ষে ধ্যেয় নয়, কিন্তু একটী নির্দ্দিষ্ট তীর্থস্থান ও একজন নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মস্থাপয়িতার মধ্য দিয়ে নিরাকার ব্রহ্মই তার প্রারম্ভিক সত্য। বিভিন্ন জনের জন্ম, শিক্ষা ও প্রতিপালনের বিভিন্নতা প্রারম্ভিক সত্যকে বিভিন্ন ক'রেছে। এ জায়গায় নানাপন্থীর নানাত্ব দেখা যায় বটে। কিন্তু ঐ একটী প্রারম্ভিক সত্যে সুস্থির হবার চেষ্টার ফলে আস্তে আস্তে তোমার কাছে সাধনের উন্নততম পর্য্যায় আপনি খুলে যাবে। তখন তুমি দেখতে পাবে যে জগতের কারো মতই ভুল নয়, কারো পথই মিথ্যা নয়, পরন্তু সকল পথই ক্রমশঃ জীবকে পূর্ণ সত্যের দিকে টেনে নিচ্ছে। চাই শুধু অব্যভিচারিণী নিষ্ঠা, চাই শুধু একান্ত মনে, একান্ত প্রাণে, একলক্ষ্যে, সমযত্নে, দ্বিধাহীন চেষ্টায়, সংশয়-বিরহিত আগ্রহে, অবিরাম, অবিশ্রাম,

অহর্নিশ অগ্রসর হ'য়ে যাওয়া। নিজ সত্যে সুস্থির হও, দেখবে বিশ্ব-সত্য তোমাতে সুস্থির হয়েছেন। নিজ সত্যে সুস্থির হও, দেখবে, বিশ্ব-সত্যে তুমি সুস্থির হ'য়েছ।

সাকার উপাসনা শ্রেষ্ঠ না নিরাকার উপাসনা শ্রেষ্ঠ ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সুতরাং এ প্রশ্নও মোটেই ওঠে না যে, সাকারভাবে ভগবানের উপাসনা শ্রেষ্ঠ, না নিরাকার ভাবে ভগবানের উপাসনা শ্রেষ্ঠ। তোমাদের মধ্যে যার চিত্ত-সংস্কার যে রকম, তার পক্ষে সেই রকম উপাসনা শ্রেষ্ঠ। নিরাকার-তত্ত্বই পরম সত্য, দর্শন-বিচারের দিক থেকে এই কথা স্বীকার ক'রে নিয়েও যে একজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সাকারভাবেই উপাসনা করেন, তার কারণ হচ্ছে এই যে,তাঁর যুক্তি তাঁর বংশ-সংস্কারকে পরাস্ত কত্তে পারে নি। আবার একজন হাল-চাষী কলিমুদ্দিন লেখাপড়া না জেনেও যে নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, মহম্মদকে ভগবানের একমাত্র প্রেরিত পুরুষ ব'লে স্বীকার ক'রেও তাঁকে ভগবানের অবতার বা অংশ-সম্ভূত ব'লে মানেন না, মহম্মদের দোহাই দিয়েই ভগবানকে এক বা অদ্বিতীয় ব'লে ঘোষণা করেন, অথচ মহম্মদের মূর্ত্তির ধ্যান করেন না, এটাও তার বংশ-সংস্কারের স্বাভাবিক সুফল। যার বংশ-সংস্কার যেমন, সে তার অনুকূল ভাবেই ভগবৎ-সাধন কর্ব্বে, এটাই স্বাভাবিক। যা যার পক্ষে স্বাভাবিক, তাই তার পক্ষে শ্রেষ্ঠ। আমার পন্থাই একমাত্র সত্য, অন্যপন্থাবলম্বীরা নরকের জীব,—এইরূপ ধারণা না রেখে প্রত্যেকে নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী ভগবৎ-সাধন কর্ব্বে, এটাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। যে যেই ভাবে উপাসনা করছে, সে অনন্যমনা হ'য়ে সেই ভাবেই নিজ পথে চলুক। তার ফলে সাকারোপাসক একদা স্পষ্ট দেখ্‌তে পাবে যে, যাঁকে আকার-বিশিষ্ট মনে ক'রে হাতে খড়ি দেওয়া হয়েছিল, তিনি সকল আকারের অতীতে বিরাজিত। তার ফলে নিরাকারোপাসকও একদা স্পষ্ট দেখ্‌তে পাবে যে, যাঁকে আকার ধারণে অক্ষম ব'লে একদা মনে করা হ'য়েছিল, তাঁরও রূপ আছে, বিচিত্র অপরূপ মূর্ত্তি তাঁর আছে; সেই সূক্ষ্মরূপ নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থূলের ভিতরে অপরূপ সত্তায়

নিরবধি বিরাজ কচ্ছে। এই অবস্থায় এলে সাকার-নিরাকারের কলহ মিটে যায়, সকল দ্বন্দ্ব থেমে যায়, পরিপূর্ণ শান্তিই তখন সাধকের একমাত্র প্রাপ্তি হয়।

উপাসনার প্রাণবস্তু ও বহিরাচার

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তথাপি এ দৃশ্য অহরহ দেখা যায় যে, একজন জীবন ভ'রে সাকার ভাবে ভগবানের উপাসনা ক'রে গেলেন, কিন্তু সেই বিশ্বমূর্ত্তি বিশ্ববিভু যে নিরাকারও বটেন, তার বিন্দুমাত্রও উপলব্ধিতে এল না। এরূপ দৃশ্যও অহরহ দেখা যায় যে, একজন জীবন ভ'রে নিরাকারভাবে ভগবানের উপাসনা ক'রে গেলেন, কিন্তু বিশ্বপালক পরমেশ্বর যে বিশ্বের সর্ব্ববস্তুতে নিজেকেই ছড়িয়ে রেখেছেন, এ তত্ত্ব আস্বাদনে এল না। এর প্রধান কারণ, Spiritকে উপেক্ষা ক'রে উপাসনার formকে প্রাণপণে মূল্য দেওয়া। বাহ্য আড়ম্বর বা আচারটুকুকেই যারা উপাসনার প্রাণবস্তু ব'লে জ্ঞান করে, তারা নিজেদের গোঁড়ামি দিয়ে সকল দিকের সকল সত্যের আগমন-পথকে কাঁটা দিয়ে রুদ্ধ কর্ত্তে চায়। যে পথেই করি, উপাসনা করার সময়ে আমি কোন্ তত্ত্বকে আস্বাদন কচ্ছি, তার প্রতি আমার লক্ষ্য নেই, আমার লক্ষ্য হচ্ছে শুধু উপাসনার form ঠিক্ হ'ল কিনা, তার দিকে। মধুপর্কের বাটীটি একটু কাছে বসান হ'ল না দূরে সরিয়ে রাখা হল, নবপত্রিকার বেলপাতাটী কচুপাতাটীর উপরে রইল না নীচে পড়্ল, এ সব দুশ্চিন্তায় যার প্রাণ শেষ, তার পক্ষে দেবী দশভূজার পূজার ফলে উন্নত-তর কোনও অনুভূতির আশা বিড়ম্বনা। পশ্চিম-মুখ হ'য়ে নমাজ পড়বার সময়ে হঠাৎ ভুল ক'রে মুখখানা একটু কোণাকুণি হ'য়ে গিয়েছিল কি না, অথবা ব্রহ্মো-পাসনার স্তোত্র পাঠ কত্তে গিয়ে হঠাৎ পৌত্তলিকদের কোনো দেবতার কথা মনে পড়ে গিয়ে উপাসনার অঙ্গচ্যুতি হয়ে পড়েছিল কি না, অথবা উপাসনার সময়ে ভজনালয়ের নিকট দিয়ে যে ব্যাণ্ড-বাদ্য বাজ্‌তে বাজতে চলে গেল, সেটা কি গোরা সৈনিকদের কুচকাওয়াজের বাজানা, না কি প্রতিবেশী পৌত্তলিকদের প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা, এ সব চিন্তায় সর্ব্বদা যার মন থাক্‌বে উদ্বিগ্ন, তার কাছেও উন্নততর অনুভূতি সমূহের আগমন খুব সহজ কথা নয়। উপাসনা কত্তে এসেছি ত' এস ভগবানের পাদপদ্মে একেবারে ডুবে যাই, আমার সকল ত্রুটী সকল

বিচ্যুতি বিস্মৃত হ'য়ে জগতের সকল লোকের সকল ভ্রম-প্রমাদের বিষয় একেবারে উপেক্ষা ক'রে নিজের পরমারাধ্য পরমপ্রভুর চরণে একেবারে বিকিয়ে যাই,—এই বোধ নিয়ে উপাসনায় বস্‌লে তবে ত' তাঁর অপার করুণা আমার অন্তরে প্রেম-প্রবাহ-রূপে অবতীর্ণ হবে! আপো-মার্জ্জনের সময়ে পৈতেটী একটু প্যাঁচ খেয়ে গিয়ে বুড়ো আঙ্গুলের ভিতরে ঢুক্‌ল, না কি সোজাই ঢুক্‌ল, অঘমর্ষণের সময়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের গোড়া কি কাণের গোড়ায় ছুঁ'ল না কি চোয়ালের গোড়ায় লাগ্‌ল্‌, এই সব দুশ্চিন্তা নিয়ে যাকে গায়ত্র্যুপাসনা কত্তে হবে, তার পক্ষে উচ্চানুভূতির আশা অল্প। সুতরাং তুমি সাকারোপাসকই হও আর নিরাকারোসকই হও, উপাসনার প্রাণবস্তুকে লক্ষ্য ক'রে চল, বহিরাচারকে তার নিকটে নগণ্য জ্ঞান কর। তাতেই সত্যের উপলব্ধি অবারিত হবে।

অকপট উপাসনার প্রত্যক্ষ প্রমাণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমার পূজা, নমাজ বা উপাসনা যে অকপট ভাবে হয়েছে, তার একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। সেটী হচ্ছে এই যে, উপাসনা থেকে উঠে এসে তুমি উপলব্ধি কর্ব্বে, কে যেন তোমার চখের পাতায় প্রেমের কাজল পরিয়ে দিয়েছে। উপলব্ধি কর্ব্বে, যার দিকে তাকাও, সেই যেন সুন্দর, যার কথা ভাব, সেই যেন পবিত্র, যত জীব আছে, সবাই যেন তোমার আপন। উপাসনা থেকে উঠে এই বোধটী যদি তোমার না জাগে, তবে বুঝতে হবে, তোমার উপাসনা ঠিক্ ঠিক হয় নি। অর্থাৎ, বাইরে formটী ঠিকই আছে, spiritটী আসে নি। উপাসনাকে জান্‌বে সঞ্জীবনী সুধা। এতে মৃতের ভিতরে জীবন জাগে, দুর্ব্বলের ভিতরে শক্তির সঞ্চার ঘটে, অপ্রেমিকের ভিতরে প্রেমের প্রস্ফুটন হয়। মহামায়ার শারদীয়া পূজার পরে যে বিজয়া-দশমী দিন শত্রু-মিত্র ভুলে কোলাকোলি কর, ওর মানে কি? মানে এই যে, জগজ্জননীর পূজার অপরিহার্য্য ফল জগতের সকল জীবের সাথে সৌভ্রাত্র্য-স্থাপন। ঈদের পরে যে শত্রু-মিত্র ভুলে একজন আর একজনকে কোল দাও, তার তাৎপর্য্য কি শুধুই একটা লোকাচারের অনুবর্ত্তন? তা নয়। এর তাৎপর্য্য এই যে, জগদীশ্বরের উপাসনার স্বাভাবিক ফল হচ্ছে মানবে মানবে শত্রুতার অবসান, প্রীতির উদ্বোধন, প্রেমের

স্ফূরণ। কিন্তু বছর বছর শারদীয়া পূজাও হচ্ছে, ঈদ-বরকতও হচ্ছে, বছর বছর কত লোকে কত লোককে কোলাকোলিও দিচ্ছে, কিন্তু মন থেকে হিংসা-বিদ্বেষ গেল কৈ? মারামারি কাটাকাটী ঘুচ্‌ল কৈ? দুর্গা পূজার পরেও ত' বাছারা, রাম যায় শ্যামের নামে মিথ্যা মামলা কত্তে। ঈদের পরেও ত' বাবা সকল, রহিম যায় করিমের পৈত্রিক ভিটা লাঠির জোরে জবরদস্তিসে দখল কত্তে। অর্থাৎ ভাগ্যবান যাঁরা, তাঁদেরই দুর্গাপূজা হবার মত হ'ল, তাঁদেরই ঈদ-উৎসব ঠিক মত হল, বাকী সব হতভাগ্য—শুধু পুষ্প-বিল্বপত্রের স্তূপ কুড়াল, অথবা মসজিদে ময়দানে ছুটাছুটী কর্ল্ল। যাঁরা সত্যি সত্যি ভগবানে আত্ম-নিবেদন কল্লেন, তাঁদেরই চিত্ত থেকে পাপ পলায়ন করল, তাপ ঘুচ্‌ল, হিংসা, নিন্দা, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা প্রভৃতি ভূতপ্রেতের তাণ্ডব থেকে একমাত্র তাঁরাই রক্ষা পেলেন। আর সবাই বাইরে নববস্ত্র পরিধান ক'রে কোচা ঝুলিয়ে বা টুপী দুলিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াল, ভগবানের দেওয়া প্রেমসুন্দর নববস্ত্র নিজের অন্তরকে পরাতে পারল না।

ভগবান্ কোথায় আছেন?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মানুষ, গরু, সাপ, বাঘ—এরা সব সীমাবদ্ধ জীব, শক্তি এদের সীমাবদ্ধ, জীবনও এদের সীমাবদ্ধ। অতএব এদের থাকবার একটা নির্দ্দিষ্ট ঘর-বাড়ী চাই, সেই ঘর-বাড়ী বেশ ছোট-খাটোত হবেই। হাজার বড় মানুষ তুমি হও, পাঁচটা সহর জুড়ে তোমার একটী বাড়ী হতে পারে না। রামবাবুর বাড়ী মধুগুপ্তের গলিতে, শ্যামবাবুর বাড়ী প্যারী সরকারের রাস্তায়, যদুবাবুর বাড়ী বাগবাজার ষ্ট্রীটে, এ'রকমই হবে। সীমাবদ্ধ মানুষ, তার সীমাবদ্ধ বাড়ী। ভগবান্ সীমাবদ্ধ নন। তিনি এতবড় যে, সমগ্র মানিকতলা ষ্ট্রীট জুড়েও যদি একটা বাড়ী হয়, তবু তাতে তিনি আটবেন না। সমগ্র কলকাতা সহর জুড়ে যদি একটা বাড়ী হয়, তবু তিনি তাতে আটবেন না। সমগ্র বঙ্গদেশ বা সমগ্র ভারতবর্ষ বা সমগ্র এশিয়া বা সমগ্র পৃথিবী বা সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, শুক্র, শনি, ইউরেনাস্ প্রভৃতি কোটি-কোটি-গ্রহ-উপগ্রহ-সমন্বিত বিশাল সৌরজগৎ জু'ড়েও যদি একটা বাড়ী হয়, তবে তাতেও তিনি আটবেন না। তিনি এত বিশাল যে, তিনি থাকেন সর্ব্বত্র, কিন্তু

কোনও এক স্থানেই আবদ্ধ নন। রামবাবু মধুগুপ্তের গলির বাড়ীতে রাত্রিতে দিব্যি তালা লাগিয়ে ঘুমুতে পারেন, শ্যামবাবু প্যারী সরকার ষ্ট্রীটের বাড়ীর দরজা বন্ধ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন, কিন্তু কুলুপ দিয়ে ভগবান্‌কে কোনও খানে আটক করার উপায় নেই। তিনি আছেন সর্ব্বত্র, কিন্তু তাঁকে ধরবার উপায় নেই, বাঁধবার উপায় নেই। মহতের চাইতেও যিনি মহৎ, বৃহতের চাইতেও যিনি বৃহৎ, তাঁর নাগাল পাবে কি ক'রে? কিন্তু সেই কৌশলটী আবার তিনিই ক'রে দিয়েছেন। মানুষের অন্তরের অন্তরে এমন এক প্রেম-কোমল অনুভূতিরূপে তিনি নিয়ত বিরাজ কচ্ছেন, সেই বিশ্বব্যাপী বিভূকে যেখানে মানুষ হৃদয়ের প্রেম দিয়ে স্পর্শ কত্তে পায়, যেখানে তিনি সর্ব্বলোকের চক্ষের অগোচরে তোমার আমার সর্ব্ব-সাধারণের হৃদয়-রমণ চিত্ত-রঞ্জন মানস-মোহন হন। হৃদয়ের সেই নিভৃত নিলয়ে তাঁর প্রেম-পেলব স্পর্শ পেয়ে তুমি ধন্য হবে, এই ভরসায় তোমার পূর্ব্বাচার্য্যেরা মন্দির গড়েছিলেন, মসজিদ গড়েছিলেন, গির্জ্জা গড়েছিলেন। কোটি কোটি বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের যিনি প্রভু, একটা মন্দিরের দেওয়ালের মাঝে তিনি আটক পড়ার নন কিন্তু সেখানে গিয়ে তুমি বাইরের জগৎকে ভুলতে কর চেষ্টা, নিজের অন্তরে প্রবেশের কর প্রয়াস, তাই মন্দিরের প্রয়োজন, তাই মস্‌জিদের প্রয়োজন, তাই গীর্জ্জার প্রয়োজন। ঐ যে মন্দিরে আরতির শঙ্খ বাজে, ঐ যে মস্‌জিদে আজানের মধুর ধ্বনি ওঠে, ঐ যে গীর্জ্জায় উপাসনার ঘণ্টা ঢং ঢং ক'রে নিক্কণিত হ'য়ে ওঠে সবই হচ্ছে তোমার বহির্ম্মুখ মনকে টেনে এনে অন্তর্ম্মুখ করার আহ্বান, তোমার অন্তরের মাঝে যে প্রেমের অমৃত-সিন্ধু টলটল ঢলঢল কচ্ছে, তার দিকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি হ'য়ে কল্যাণের মাঝারে আত্মভোলা হ'য়ে যাবার আমন্ত্রণ। ক'জন একথা বোঝে? তাই তোমার দৃষ্টি থাকে বাইরে, উপাসনার বিষয়ে নয় পরন্তু অবিষয়ে, ভগবানে নয় পরন্তু অনিত্য অসত্য চপল চটুল ক্ষণস্থায়ী অবান্তর জিনিষে। কিন্তু, তুমি যখন বাইরের জগৎ ভুলে তোমার অন্তর-প্রদেশে প্রবেশ কর, নিজের অন্তরের অর্ঘ্য দিয়ে অন্তরের দেবতার পূজার আয়োজন কর, তখন তিনি তোমার কাছে এসে ধরা দেন, তখন তিনি এসে সুস্মিত হাস্যে তোমার সুমুখে দাঁড়ান। কেউ চিত্ত-সংস্কার অনুযায়ী তখন তাঁকে সাকার মূর্ত্তিতে দেখে, কেউ বা চিত্ত-

সংস্কার অনুযায়ী অফুরন্ত করুণারূপে তাঁর স্পর্শকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করে, কেউ বা অন্তিমে তাঁর চরণের আশ্রয় সুনিশ্চিত মিল্‌বে এই ভরসারূপে তাঁকে বুকের মাঝে পায়। তিনি সর্ব্বত্র আছেন, কিন্তু তোমার অনুভূতির স্তরে প্রথমে তুমি পাবে তাঁকে তোমার হৃদয়ে, তোমার নিজের প্রাণের নিভৃত কুঠরীতে।

নিজের প্রাণে ডোব

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সুতরাং নিজের প্রাণে ডোব। ডুবুরি যেমন রত্নের অনুসন্ধানে সমুদ্রের তলদেশে ডোবে, তুমিও তেমনি ডোব। ভেসে বেড়িয়ে লাভ কি হবে?

ভেসে যদি বেড়াও ও মন
পরম রতন পাবি নারে,
তুল্‌তে যদি চাও সে মাণিক
ডুব দে রে নাম-পারাবারে।
লাভ কিছু নাই সন্তরণে,
ডুবলে শান্তি পাবি প্রাণে,
একবারে না পাওরে যদি
ডুবতে হবে বারে বারে।
ডুবের বিদ্যা যারা জানে,
তাদের কাছে চাল শিখে নে,
বাঁধ্‌ বুকে নির্ভরের পাথর,
তল পাবি সেই গুরু-ভারে।

বাইরের পানে তাকিয়ে আর মনকে বিক্ষিপ্ত ক'রো না। অন্য লোকে ঢাক পিটায় না টিকী নাড়ে, ঢোল পিটায় না দাড়ী ঝাড়ে, পুতুল পূজা করে না মিথ্যা ধর্ম্মের অনুসরণ করে, সেই সব দিকে লক্ষ্য না দিয়ে একমাত্র লক্ষ্য দাও যে তুমি কি ক'রে তোমার প্রাণের ভিতরে পরমপ্রভুর আনন্দ-ঘন মূর্ত্তির দর্শন পেতে পার। কার মত কি, কার পথ কি, কে শুধু খেলা ক'রে দিন কাটায়, কেইবা বৃথা প্রসঙ্গে সময় হারায়, কে কৃতকর্ম্মের দোষে নরকে যাবে, কার প্রতি

ভগবানের কৃপা কস্মিন্‌কালেও হবে না, সেই সব বাজে চিন্তা ছেড়ে দিয়ে নিজের মনকে একজনের অনুগত কর, একজনের চিন্তায় অনুক্ষণের জন্য রত কর, এক-জনের জন্য ব্যাকুল কর। বাইরে থেকে মনকে টেনে এনে সবলে অথচ সপ্রেমে মনকে ভিতরে বসাও, ভিতরে ডুবাও, অন্তরের অতলস্পর্শ সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশে ইষ্ট-সান্নিধ্য অনুভব করাও।

কলিকাতা

২৪শে শ্রাবণ, ১৩৩৬

তোমার আরাধ্য কে ?

জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি দেবাধিপগণ তোমার আরাধ্য নহেন। ইন্দ্র, যম, চন্দ্র, বরুণাদি দেবগণও তোমার আরাধ্য নহেন। কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী বা সরস্বতী প্রভৃতি শক্তি-বিগ্রহ সমূহও তোমার আরাধ্য নহেন। যীশু, বুদ্ধ, রাম ও কৃষ্ণাদি অবতার-গণও তোমার আরাধ্য নহেন। নানক, শঙ্কর, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি ত্রিলোকবরেণ্য মহাপুরুষগণও তোমার আরাধ্য নহেন। ইঁহাদের আনুগত্যে তুমি ইঁহাদেরও যিনি আরাধ্য সেই সর্ব্বকারণ-কারণ ঈশ্বরেরও ঈশ্বর পরমেশ্বরের আরাধনা করিবে। ব্রহ্মা যাঁর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মত্ব পাইলেন, বিষ্ণু যাঁর তপস্যা করিয়া বিষ্ণুত্ব লাভ করিলেন, মহাদেব যাঁর তপস্যা করিয়া শিবত্ব অর্জ্জন করিলেন, যাঁর এক একটী আদেশকে পালন করিবার চেষ্টা করিয়া কেহ ইন্দ্রত্ব, কেহ যমত্ব, কেহ চন্দ্রত্ব, কেহ বরুণত্ব পাইলেন, যাঁর এক একটা শক্তির একটা বিকাশরূপে মাত্র কালী-দুর্গাদির প্রকাশ, যীশু, বুদ্ধ, রাম ও কৃষ্ণাদি যাঁর কাছ হইতে শক্তি লইয়া জগতের জীবকুল উদ্ধার করিবার জন্য অবতীর্ণ হইলেন, নানকের কর্ম্মপর জ্ঞান, শঙ্করের সুবিমল জ্ঞান, গৌরাঙ্গের জ্ঞান-সংশ্লেষ-বর্জ্জিত প্রেম যাঁহার চরণ-নখর-কোণার বন্দনার ফল, সর্ব্ববেদাতীত সর্ব্বশাস্ত্রাতীত সর্ব্বভাষাতীত সর্ব্বদ্বন্দ্বাতীত সেই মঙ্গলনিলয় পরমেশ্বরই তোমার:আরাধ্য দেবতা। আরাধ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বিত্বের প্রতি তাকা-ইয়া নিজ সাধন-ভজনে সর্ব্ববিধ সঙ্কীর্ণতার ঊর্দ্ধে গমন কর। যাহার আরাধ্য যত

বিশাল, সে তত উদার। যাহার আরাধ্য যত ছোট, সে তত সঙ্কীর্ণচেতা, সে তত অনুদার।

পূর্ব্বপুরুষদের অনুষ্ঠিত পূজার্চ্চনাদি গ্রহণীয় না বর্জ্জনীয়?

ঐ পত্রেই শ্রীশ্রীবাবা আরও লিখিলেন,—

"পূর্ব্বপুরুষদের অনুষ্ঠিত নিত্যনৈমিত্তিক পূজা-অর্চ্চনাদি কতখানি তোমার গ্রহণীয় আর কতখানি তোমার বর্জ্জনীয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে তোমার আরাধ্য-নিষ্ঠার উপরই বাবা নির্ভর করে। তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা যে সকল পূজা অর্চ্চনাদি করিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিলে যদি তোমার আরাধ্য-নিষ্ঠা হ্রাস পাইয়া মন অপ্রাসঙ্গিক অবান্তর বিষয় সমূহে বিচরণ করে, তাহা হইলে অপরে উহাদিগকে সযত্নে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিলেও তোমার পক্ষে উহাদিগকে বর্জ্জনীয় বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। ঐ সকলের অনুসরণ করিলে যদি তোমার আরাধ্য-নিষ্ঠা ক্রমবিবর্দ্ধমান হইতে থাকে, তাহা হইলে অপর সকলে সদল-বলে উহাদিগকে ত্যাগ করিতে থাকিলেও তোমাকে প্রাণপণ বিক্রমে উহাকেই আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া থাকিতে হইবে। পূর্ব্বপুরুষগণের অবলম্বিত পূজার্চ্চনাদির কতক তোমার আরাধ্য-নিষ্ঠার নাশক এবং কতক তোমার আরাধ্য-নিষ্ঠার পোষক হইলে নাশকটুকুকে বর্জ্জন করিয়া পোষকটুকুকে রক্ষণ করিতে হইবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যোগরমণ সাধনদক্ষ পুরুষ ছিলেন, একমাত্র এই যুক্তিভেই তাঁহাদের সব কিছুই আমাদের গ্রহণীয় হইতে পারে না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বিলাত যান নাই, কেম্ব্রিজে হার্ভার্ডে পড়েন নাই, আজকালকার মত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি-এ-সি পি-এইচ-ডি উপাধি গ্রহণ করেন নাই, একমাত্র এই যুক্তিতেই তাঁহাদের সব-কিছুই আমাদের বর্জ্জনীয় হইয়া যাইতে পারে না। গ্রহণের ও বর্জ্জনের নিয়ামক হইবে আরাধ্যনিষ্ঠা।"

অপরের ধর্ম্মানুষ্ঠান-সম্পর্কে তোমার করণীয়

পত্রের উপসংহারীয় অংশে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"কেহ কেহ ভগবান্‌কে এক একটা বিশিষ্টমূর্ত্তিধারী বলিয়া কল্পনা করিয়া সেই কল্পনাকে অভ্রান্ত সত্যরূপে মনে মনে সুস্থির করত তদুচিতভাবে মন্ত্র-সংগ্রথন,

নৈবেদ্য-রচনা ও বিগ্রহ-নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কেহ সাড়ম্বরে কেহ অল্পাড়ম্বরে পূজার্চ্চনাদি করিতেছেন। ইঁহাদের কাহারও সহিত তোমার কোনও বিরোধ আছে, এরূপ কল্পনাও মনের মাঝে তোমার থাকা উচিত নহে। ইঁহারা ইঁহাদের কল্পিত পথেই একদা পূর্ণ সত্যের আস্বাদন পাইবেন। যে পথেই যিনি চলুন, যে ভাবেই যিনি ডাকুন, তাঁহাকে নিজের কাছে টানিয়া নিবার ক্ষমতা, তাঁহার ডাক শুনিবার ক্ষমতা পরমকারুণিক পরমেশ্বরের আছে। ইঁহাদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ করা যে একটা ব্যাধি-বিশেষ এবং তাহার চিকিৎসা যে অতীব দ্রুত আবশ্যক, ইহা সর্ব্বদা স্মরণে রাখিবে। পরানুষ্ঠানবিদ্বেষী ব্যক্তির মন নিজ ইষ্ট হইতে সরিয়া পরের ইষ্টে যায়। জগতে যেখানে যিনি যে ভাবেই ভগবানের প্রীত্যর্থে কোনও আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান করুন, তুমি সকলের সহিতই আন্তরিক যোগ রক্ষা করিও। বাহ্য যোগ যে স্থলে তোমার আরাধ্যনিষ্ঠার নাশক, সে স্থলে বাহ্যতঃ দূরে থাকিবে। যতটুকু বাহ্য সহযোগে ইষ্টনিষ্ঠার ক্ষতি হয় না, ভদ্রতা ও সহৃদয়তা সহকারে ততটুকু বাহ্য যোগ রক্ষা করিবে। লোকে সাম্প্রদায়িক কীর্ত্তন করিতেছেন, করুন, তুমি তোমার মনোভঙ্গীর প্রভাবে তাহার মধ্য হইতে তোমার অন্তরের ভাবটীকেই নিংড়াইয়া বাহির কর। জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের কোটি বৈচিত্র্যকে তুমি দর্পণরূপে গ্রহণ করিয়া সর্ব্বত্র নিজের অন্তরের প্রতিবিম্ব বাহির করিয়া লও। লোকে যখন 'প্রাণগৌরনিত্যানন্দ' বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন, তখন তুমি নিজ মনন-শক্তির মহিমায় তাহার মধ্যে 'হরি ওঁ' ধ্বনি শ্রবণ কর। লোকে যখন "আল্লা হো আকবর" নাদে গগন কম্পিত করিতেছেন, তুমি তখন তাহার ভিতর দিয়া তোমার ইষ্টনামের ঝঙ্কারটুকুই খুঁজিয়া লও। শালা বলিয়া গালি দিলেও অযোধ্যার এক মহাত্মা তার ভিতরে 'সীতারাম' শব্দ শুনিতে পাইতেন। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিত,—'সাধু, তোমার গাঁজার কল্কী কোথায়?' তিনি বলিতেন,—'কি বলিলে? সীতারাম বলিলে ত? তুমি দীর্ঘজীবী হও। যে সীতারাম নাম উচ্চারণ করে, জন্মে জন্মে আমি তাঁর চরণের দাস।' কর্ম্ম মাত্রেরই ফল আছে। লোকের কর্ম্ম লোকে করুক, কিন্তু মননের গুণে প্রত্যেকের ভিন্নমুখী কর্ম্মের মাঝ হইতে তুমি তোমার ইষ্টমুখী ফল আদায় করিয়া লও।

যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্—অর্থাৎ কর্ম্মের কৌশলকে বলে যোগ। লোকে তাঁহাদের নিজ নিজ রুচি, নিষ্ঠা ও সংস্কার অনুযায়ী ইষ্টকর্ম্ম করুন, তুমি মনন। কৌশলের গুণে তাহার ভিতর দিয়া নিজের পরমপ্রেষ্ঠকে আহরণ করিয়া লও। তবেই না তোমাকে যোগী বলা চলিবে! গায়ে ভস্ম মাখিলে বা শিরে জটা ধরিলে বা কটিতে বল্কল পরিলেই কেহ যোগী হয় না। সর্ব্বব্যাপারের মধ্য দিয়া আরাধ্য-নিষ্ঠার বর্দ্ধনে সক্ষম হইলে লোকে যোগী হয়। ভগবান্ আরবী বা সংস্কৃত ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা বোঝেন না, তাহাও নহে। ভাষা তাঁহার নিকটে পৌছে না, পৌছে শুধু ভাব। লোকে নিজ নিজ অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান নিয়া খাটিয়া গলদঘর্ম্ম হইতেছেন, তুমি ভাবের গুণে তাঁহাদের শ্রমে নিজের জন্য প্রেম-ভক্তির ফসল আদায় করিয়া ঘরে তুলিতে পার।”

কৃষিকর্ম্মই নিষ্পাপ জীবিকা

অপর একজনের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

“কৃষি এবং চিকিৎসা-বিদ্যা এই দুইটীকে আমি জীবিকার্জ্জনের উপায় রূপে তোমাদের পক্ষে অতীব পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। কৃষির ন্যায় নিষ্পাপ জীবিকা আর কিছুই নাই। তোমার কৃষি-কর্ম্মের ফলে দেশ, সমাজ বা জগতের একটী মানব বা একটী মানবীর কোনও ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। যতক্ষণ তুমি কৃষির সঙ্গে মামলাবাজীর সংমিশ্রণ না দিতেছ, ততক্ষণ তুমি সম্পূর্ণরূপে অজাতশত্রু। অবশ্য, একথা সত্য যে কৃষি করিতে গেলে হলচালক মজুর, হল-বাহক বলদ প্রভৃতির শারীরিক ক্লেশ অনিবার্য্য। কিন্তু যে নিজ হাতে চাষ করে না, সে তার মজুরকে পেট ভরিয়া খাইতে দিয়া সদয় ব্যবহার করিয়া উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও পারিতোষিকাদি প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করিতে পারে,—ভৃত্য জ্ঞানে নয়, ভ্রাতৃজ্ঞানে সহোদরজ্ঞানে সহকর্ম্মিজ্ঞানে সস্নেহ সপ্রেম সাম্যমূলক ব্যবহারের দ্বারা তাহার শ্রমের মর্য্যাদা-সহকৃত প্রতিদান দিতে পারে। কৃষি-কর্ম্ম করিতে গেলে, ভূমিমধ্যস্থ বহু ক্ষুদ্র প্রাণীর নিধন জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতে ঘটিয়া থাকে,—কিন্তু সর্ব্বজীবহিতকর নানা সৎকার্য্যে কৃষিলব্ধ শস্যের অধিকাংশ বা একটা বিশিষ্ট অংশ বিতরণের দ্বারা সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে। মানুষের বুকের রক্ত

না চুষিয়া, মানুষের মেরুমজ্জা চর্ব্বণ না করিয়া দুর্ব্বলের উপরে সবলের অত্যাচারকে প্রবর্দ্ধিত না করিয়াও তুমি কৃষিকার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পার। অথবা কৃষিকে শুধু কৃষি-কার্য্যরূপে গ্রহণ না করিয়া তুমি ইহাকে কৃষি-যজ্ঞরূপে গ্রহণ করিতে পার। অন্নং বহু কুর্ব্বীত, তদ্ ব্রতম্,—প্রচুর অন্ন উৎপাদন কর, কেননা ইহা ব্রত স্বরূপ, এই মহাবাক্য একদা যে ভারত-ঋষির উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহা কি শুধু নিজের গোলায় প্রচুর অন্ন বস্তাবন্দী করিয়া আটক রাখিবার জন্য ? অন্ন উৎপাদন কর এবং অন্ন বিতরণ কর,—ইহাই ছিল বৈদিক ঋষির একান্ত আন্তরিক অভিপ্রায়। কৃষিজীবী সেই অভিপ্রায় প্রতিপালন করিবার চেষ্টা যে ভাবে করিতে পারে, অন্যে সে ভাবে পারে না। এই জন্যই আমার দৃষ্টিতে কৃষি-কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্পাপ জীবিকা।"

গোজাতির প্রতি কৃতজ্ঞতা

ঐ পত্রেই শ্রীশ্রীবাবা আরও লিখিলেন,—

"কিন্তু আরও একটী কথা স্মরণে রাখিতে হইবে। কৃষিকে জীবিকারূপে গ্রহণের সময়ে তোমরা প্রথমেই সঙ্কল্প করিয়া নিও যে, গোজাতির প্রতি অকৃতজ্ঞ হইবে না। গাভীরা তোমাকে তোমার শৈশবে দুগ্ধ দান করিয়া বাঁচাইয়াছে, শুধু এই কথাই নহে, তাহারা তাহাদের পুরুষ-সন্তানদিগকে তোমাদের ধান্য উৎ-পাদনের জন্য দান করিয়াছে। গোজাতির প্রতি এই কৃতজ্ঞতার ঋণ যদি স্বীকার না কর, তাহা হইলে নিষ্পাপ জীবিকা আশ্রয় করিয়াও তোমরা অর্দ্ধেক মানুষই থাকিবে। গোজাতির প্রতি অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে আমি পূর্ণমানুষ বলিয়া স্বীকার করিতে অন্তরে কুণ্ঠা অনুভব করি। তোমরা কৃষি-জীবিকা অবলম্বনের কালে গো-সেবাকে তোমাদের অবশ্য-কর্ত্তব্যের অন্যতম অঙ্গরূপে গ্রহণ করিও। মনুষ্য-জাতির উন্নয়নের সহিত গোজাতির উন্নয়নকে অভেদ-সম্পর্কান্বিত বলিয়া জ্ঞান করিও।"

লোক-কুশলা জীবিকারূপে চিকিৎসা-বিদ্যা

পত্রের পরবর্ত্তী অংশে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন—"জীবিকারূপে গ্রহণ কর আর না কর, চিকিৎসা-বিদ্যার অল্পাধিক অধিকার প্রত্যেকে অর্জ্জন কর। ইচ্ছায়

অনিচ্ছায় পরোপকার করিবার পক্ষে এই বিদ্যা সর্ব্বদাই এক পরম সহায়। কৃষক রূপে তোমরা সমগ্র পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়, নিজের অন্ন নিজে অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে, যার যতটুকু চিকিৎসা-বিদ্যার জ্ঞান আছে. সে ততটুকু করিয়া বিপন্ন প্রতি-বেশীদের সেবা কর। জীবনকে সেবা ও স্বাবলম্বনের প্রতিমূর্ত্তি করিয়া গড়িয়া তোল। চিকিৎসাজীবীদিগকে অনেকে চামার বলিয়াছেন। চামার ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ সত্য সত্যই রহিয়াছে। চিকিৎসাজীবীদিগকে অনেকে শিক্ষিত নরঘাতক বলিয়া সংজ্ঞাত করিয়াছেন। চিকিৎসকদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি না জানিয়া নর-হত্যাও করিতেছে। কিন্তু সেবাবুদ্ধি যাঁহার জীবন-সাধনার বনিয়াদ, তাঁহার হস্তে এই বিদ্যা পড়িলে বহু মুমূর্ষুর প্রাণ রক্ষা হইতে পারে, বহু গৃহের অকালে শোকচ্ছায়া-পাত নিবারিত হইতে পারে, বহু রুগ্ন ও আতুরের অপরিসীম ক্লেশ সমূহের আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রতিকার ঘটিতে পারে। অর্থ গ্রহণ করিয়া বা বিনা মূল্যে উভয় প্রকারেই চিকিৎসাবিদ্ ব্যক্তি সমাজের প্রভূত হিত-সাধন করিতে পারেন। য়ুরোপে পূর্ব্বকালে কত যে প্রসূতি আর কত যে শিশু প্রসব-কালে প্রাণত্যাগ করিত, তাহার ইয়ত্তা নাই। বিজ্ঞ চিকিৎসাবিদেরা আজ সেই মৃত্যু-সংখ্যাকে অবিশ্বসনীয়-রূপে হ্রাস করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কাণাকে তাঁহারা চক্ষু পরাইয়া দিতেছেন, খোঁড়াকে তাঁহারা কৃত্রিম চরণে বিভূষিত করিয়া দৌড়-ঝাঁপ-সন্তরণে সমর্থ করিয়া তুলিতেছেন। সামান্য কারণে যে সকল মানুষ অকালে মরিত, তাহাদের মৃত্যু তাঁহারা সফলতার সহিত নিবারণ করিয়াছেন। যাহা অন্য দেশে সম্ভব হইয়াছে, তাহা এই দেশেও সম্ভব হইতে পারে এবং সম্ভব করিতেও হইবে। কিন্তু যে দেশে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র চিকিৎসক নিজ নিজ চিকিৎসা-বিদ্যার সঙ্গত প্রয়োগ করিতে সর্ব্বদা যত্নশীল রহিয়াছেন, সেই দেশেই অসামান্য চিকিৎসা-দক্ষগণের আবির্ভাব সম্ভব হইয়া থাকে। লোক-কুশলা জীবিকা রূপে তোমরা চিকিৎসা-বিদ্যার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল হইও।”

সর্ব্ববিধ পরোপকারে ব্রতী হও

পত্রের শেষাংশে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—“অবশ্য, আধ্যাত্মিক পরোপকারই যে জীবের প্রকৃত উপকার, এই যুক্তি উপস্থিত করিয়া কোনও কোনও ভক্ত বা জ্ঞানী

ব্যক্তিরা তোমাদিগকে বাহ্যিক লোকহিত হইতে নিবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা পাইবেন। তাঁহারা বলিবেন যে, একমাত্র ভগবৎ-প্রেমই জীবের পরম প্রাপ্য এবং সেই প্রাপ্তির দিকে জীবকে অগ্রসর করিয়া দেওয়াই জীবের প্রতি প্রকৃত পরোপকার। তাঁহাদের এই উক্তি মিথ্যাও নহে। কিন্তু যেহেতু এই উক্তি অতীব শ্রদ্ধেয় সত্য, সেই হেতু জীবের বাহ্যিক দুঃখ-যন্ত্রণার উপশম করিবার চেষ্টা হইবে গর্হিত ও নারকিজনোচিত, এইরূপ প্রলাপ-বচনের উপরে কোনও গুরুত্ব আরোপ করিবার আবশ্যকতা দেখি না। যাঁহারা এই সকল প্রলাপোক্তি উচ্চারণ করিয়া ফোঁটাতিলকের দাপটে আসর মাত করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে যখন দেখিবে মঠের বার্ষিক উৎসবের পায়স প্রসাদ ও ছানার জিলিপি প্রসাদ সঙ্কলানের জন্য মুক্তকচ্ছ সেবকগণকে চাঁদার খাতা হস্তে উর্দ্ধশ্বাসে গৃহ হইতে গৃহান্তরে দৌড়ের ঘোড়ার মত ছুটাছুটি করাইতে, তখনই তাঁহাদের কথার অন্তঃসারশূন্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। হাসপাতাল খোলা পাপ, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান পাপ, বেকারকে কর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া দেওয়া পাপ,—একমাত্র ইহাদের মঠে মোটা মোটা টাকার থলি উপহার দেওয়াই পুণ্য! ইহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া তোমরা জীবসেবা করিও। যে পার, জীবের আধ্যাত্মিক পরোপকার করিয়া তাহার নিত্যকুশলের আনুকূল্য করিও। যে তাহা না পার, সে জীবের নৈতিক কুশলের চেষ্টা করিও। যে তাহাও না পার, সে জীবের দৈহিক ও আর্থিক কুশলের চেষ্টা করিও। যে পার, সে যুগপৎ ত্রিবিধ হিতসাধনে যত্নশীল হইও। তুমি জীবের আধ্যাত্মিক কুশলে যত্নবান রহিয়াছ বলিয়া যে তাহাকে ক্ষুধার সময়ে অন্ন-পান প্রদান করিলে নিরয়স্থ হইবে, এইরূপ যুক্তি সাত্ত্বিকতার অহঙ্কার হইতেই জন্মিয়া থাকে। তোমরা সাত্ত্বিক হও, কিন্তু অহঙ্কৃত হইও না। তৃণাদপি সুনীচ হইয়া যাহারা বৈষ্ণব হয়, তাহাদেরও মধ্যে অনেকের বিনয়ের দর্প দেখা যায়। বিনয়ের দর্প যুক্তি-বিচারে অন্ধতা আনয়ন করে। তোমরা সেই দর্প হইতে প্রাণ বাঁচাইয়া চলিও। পরোপকারই যখন তোমাদের ব্রত, তখন সেই পরোপকার আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও দৈহিক সর্ব্ববিধই হওয়া প্রয়োজন। সর্ত্ত মাত্র একটী। তাহা হইতেছে এই যে, সেবা তুমি যাহাকেই দাও, উপকার তুমি যেরূপই কর, নিজেকে কর্ত্তা বলিয়া অভিমান রাখিও না,

নিজেকে জানিও পরমপ্রভুর দীনতম নগণ্যতম তুচ্ছতম দাস বলিয়া। পরোপকার কর সর্ব্বথা,—নিজের অহমিকাকে ভগবানের পদতলে চাপিয়া রাখিও।”

ধর্ম্মজীবন সংগ্রাম-মুখর

অপরাহ্নে জিজ্ঞাসুগণ সমবেত হইয়াছেন। একটী প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সে যুদ্ধজয় জয়ই নয়, যে যুদ্ধে কামান করেনি গর্জ্জন, অসি করেনি রক্তপান, বর্শা করেনি প্রতিপক্ষ যোদ্ধার হৃৎপিণ্ডকে স্পর্শ। ঘুষ দিয়ে পরীক্ষা পাশকে কি পাশ করা বল্‌বে? ফাঁকতালে কখনো বড় কাজ হয় না। ধর্ম্মজীবন যে যাপন কত্তে চায়, প্রলোভন চারদিক থেকে তাকে চেপে ধর্‌তে প্রয়াস পাবেই। কিন্তু বিচলিত হ'লে চল্‌বে না। ধর্ম্মজীবন যাপন করা আর যুদ্ধজয়ে বে'র হওয়া এক কথা। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে কামানের মুখে বুক পেতে দিতে হয়, ডর-ভয়কে নির্ব্বাসন দিতে হয়, এখনি হয়ত কামানের গোলায় মাথা উড়ে যাবে দেখেও হাতের হাতিয়ার শক্ত ক'রে ধরতে হয়, পায়ের তলায় গভীর রক্তপ্রবাহ গঙ্গার বেগে ব'য়ে যাচ্ছে দেখেও সঙ্গীণ হাতে এগিয়ে যেতে হয়, মায়াযোধী শত্রুর মস্তক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না তবু স্থির লক্ষ্যে গুলি ছুঁড়্‌তে হয়। চল্‌তে গেলেই উত্থান-পতন আছে কিন্তু যতবার পড়্‌বে ততবারই উঠবার চেষ্টা কর্ব্বে, ততবারই দৃঢ়পদে অগ্রসর হবার চেষ্টা চালাবে, প্রাণবায়ু যতক্ষণ তোমাকে স্বেচ্ছায় না পরিত্যাগ ক'রে যাচ্ছে ততক্ষণ এগুনোও থামাবে না, হাতিয়ারও ছাড়্‌বে না, কাদায় পড়ে গেছ ত' গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে যাও, হাতের বল কমে গেছে ত' দাঁত দিয়ে বন্দুকের ঘোড়া টান, তবু রণ-ভঙ্গ দেবে না, তবু চুপ মেরে থাকবে না, তবু পরাজয় স্বীকার কর্ব্বে না,—এরই নাম ধর্ম্মজীবন। বিপাকে প'ড়ে পিছন হ'ঠে এসেছ? ক্ষতি কি? শত্রুর দ্রুত-গতিকে ব্যাহত করার জন্য কি করা যায়, তার ফিকির দেখ। একটী মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট হ'তে দিও না, ক্ষীণতম সুযোগেরও অপব্যবহার করো না। এর নাম ধর্ম্ম-জীবন। প্রকৃত ধর্ম্মজীবন সংগ্রাম-মুখর জীবন।

বীরত্বই ধর্ম্মের জনক ও ফল

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কাপুরুষতাকে ধর্ম্ম ব'লে ভ্রম ক'রো না। বীরত্বই ধর্ম্মের জনক, বীরত্বই ধর্ম্মের ফল। দলে দলে কাপুরুষে দেশ যে পূর্ণ হ'য়ে গিয়েছে,

তার কারণ তোমরা প্রকৃত ধর্ম্মজীবন যাপন কর্ব্বার চেষ্টা এতকাল করনি। ধর্ম্মের একটা ঠাট মাত্র কষ্টে স্বষ্টে বজায় রেখেছ, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম থেকে প্রাণের ভয়ে বা মানের দায়ে বা স্বার্থের টানে শত যোজন দূরে স'রে পড়েছ।

কলিকাতা

২৫শে শ্রাবণ, ১৩৩৬

মানব-মর্ম্মে প্রবেশের উপায়

জনৈক পত্র-লেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—"ভাষার সাহায্যে একজন মানুষ অপর একজনকে নিজের অন্তরের কথা কতটুকুই বা বুঝাইতে পারে, একজন আর একজনের কথা কতটুকুই বা বুঝিতে পারে? পরস্পরকে বুঝিবার উপায় একের ভাষার ভিতরে অন্যের প্রবেশ নহে, পরন্তু একের মর্ম্মের ভিতরে অপরের প্রবেশই তাহার উপায়। কিন্তু মর্ম্মের ভিতরে প্রবেশ করিতে যুক্তি, অনুমান বা পারম্পর্য্য-বিচার কোনও কাজেই আসে না। মর্ম্মের ভিতরে প্রবেশ করিবার উপায় হইল একনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক সাধন। বহুবিধ অর্থহীন প্রজল্প হইতে বিরত হইয়া সাধন-পরায়ণ হও। তাহাতেই জগতের সকলের সঙ্গে প্রাণের বুঝাপড়া স্থির হইবে। প্রাণ বাজারে বিকাইবার সামগ্রী নহে, প্রাণ হাটের মাঝখানে খুলিয়া ধরিবার বস্তু নহে।"

বন্ধু-প্রীতির পরিচয়

অপর এক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"শ্রীমান্ অ—র সাফল্যে আনন্দ প্রকাশার্থ তোমরা কয়েকজন বন্ধু-স্বজন-হিতৈষীকে ডাকিয়া আপ্যায়ন করিবার ব্যবস্থা করিতেছ শুনিয়া প্রীত হইয়াছি। ইহা তোমাদের বন্ধু-প্রীতির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু বন্ধুর প্রতি প্রীতি প্রকাশের জন্য নিজেদেরই ভূরিভোজের ব্যবস্থা না করিয়া নিরন্ন কতকগুলি নর-নারীকে তৃপ্তিপূর্ব্বক অন্নপানীয় দানান্তর তাহাদের প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদিতে তাহাদিগকে ভূষিত করিলে তাহা আমার অধিকতর প্রীতিকর হইত। ভূরিভোজনের মধ্য দিয়া তোমাদের ব্যক্তিগত তৃপ্তি যথেষ্টই হইবে। কিন্তু নিজেকে সেই লেহ্য পেয়ের তৃপ্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া যাহাদের উহা প্রয়োজন, তাহাদের তৃপ্তির ব্যবস্থা

করিলে তোমাদের বন্ধুপ্রীতির পরিচয় হইত অবিনশ্বর। ভোগের ভিতর দিয়া প্রীতির পরিচয় কতটুকু দিবে? প্রকৃত বন্ধুপ্রীতির পরিচয় হইবে ত্যাগে।"

কলিকাতা

২৬শে শ্রাবণ, ১৩৩৬

বিপজ্জনক গুরুভক্তি

অদ্য সমাগত যুবকদের সঙ্গে গুরুভক্তির কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—গুরুভক্তি খুব ভাল জিনিষ এবং প্রয়োজনীয় জিনিষ। গুরুভক্তিহীনের সাধন-ভজনে জোর বাঁধে না। কিন্তু গুরুভক্তির একটা বিপজ্জনক রূপ আছে, যাতে গুরুরও মঙ্গল নেই, শিষ্যেরও কুশল নেই। এক গুরু ছিলেন শ্মশানবাসী, লোকালয়ে বড় একটা আস্‌তেন না এবং আহারীয় সংস্থানের জন্য কোনও চেষ্টা কত্তেন না। কখনো কখনো গ্রামবাসী কেউ এসে আহারীয় দিয়ে যেত, তাতেই তিনি প্রাণধারণ কত্তেন। কিন্তু গুরুদেবের কপাল মন্দ, এক ভয়ঙ্কর গুরুভক্ত শিষ্য হঠাৎ একদিন তাঁর জুটে গেল। শিষ্য বল্লেন,—গুরুদেব, আমি ঈশ্বর-দর্শন কত্তে চাই। গুরু খুসী হ'য়ে বল্লেন,—বেশ কথা, প্রাণপণে সাধন কর, নিশ্চিত ঈশ্বর-দর্শন হবে। শিষ্য বল্লে,—আমি সংসার ত্যাগ কর্ব্ব। গুরু বল্লেন,—তার কোনো প্রয়োজন নেই, সংসারে ব'সেই তাঁকে ডাক্, তাতেই তাঁর কৃপা হবে। শিষ্য বল্লে,—না আমি আপনার পাদপদ্মে মাথা গুঁজে এই শ্মশানেই পড়ে থাকব, সংসারে আর যাব না। গুরু বল্লেন,—এখানে তোর নানা কষ্ট হবে, অসুবিধা হবে। শিষ্য বল্লে,—হোক্, সব আমি সহ্য কর্ব্ব। গুরু বল্লেন,—থাক্‌বি কোথায়, এই ভাঙ্গা মঠের ভিতর একজনের বেশী স্থান হয় না। শিষ্য বল্লে,—আমি বাইরে পড়ে থাক্‌ব। গুরু বল্লেন,—এখানে আহারীয় অপ্রচুর। শিষ্য বল্লে,—আমি উপবাসী থাক্‌ব। গুরু বুঝলেন, আর বাক্যব্যয় বৃথা, অগত্যা বল্লেন,—আচ্ছা তবে থাক্। শিষ্য ভাবল, গুরুদেব তাকে পরীক্ষা কচ্ছিলেন এবং পরীক্ষায় সে অনায়াসে জয়ী হল। ফলে শিষ্য মনে মনে একটা বিজয়-গর্ব্ব অনুভব কত্তে লাগল। এদিকে শিষ্য ত' এসে গুরুর আশ্রম সরগরম ক'রে তুল্ল, কিন্তু গ্রামবাসীরা আগে সাধুকে যে পরিমাণে আহারীয় পৌছে দিত, তা' আর বাড়ল না। গুরু দেখলেন, নিজে পেট

ভরে খেতে গেলে শিষ্য মারা যায়, অতএব তিনি আধ-পেটা খেতে আরম্ভ কর্লেন। গুরুদেব দেখলেন, শিষ্য বাইরে পড়ে থাক্‌লে বর্ষায় আর শিশিরে তাকে সান্নিপাতিকে ধর্ব্বে, অতএব নিজের বিশ্রামের স্থানটুকু সঙ্কীর্ণ ক'রে এনে ব'সে ব'সে ঘুমুবার অভ্যাস কর্লেন। কিন্তু এতেও শিষ্যের গুরুসেবার আগ্রহ কম্‌ল না। দিনের বেলায় নানাস্থানের লোক এসে উপদেশের জন্য ব'সে থাকে ব'লে শিষ্য গুরুদেবের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা কইতে পায় না, অতএব রাত্রিতে যখন গুরুদেব ঘুমিয়ে থাকেন, তখন সে ডেকে ওঠে,—গুরুদেব! গুরুদেব! গুরু জেগে উঠে বল্লেন, - কিরে? শিষ্য বলে,—সারাদিন লোকের ভিড়ে আপনার কাছ থেকে কোনো উপদেশ নিতে পারি না, এখন শ্মশান নির্জ্জন, এখন আমায় কৃপা ক'রে কিছু উপদেশ দিন্। গুরু বল্লেন,—দীক্ষার কালে সেই যে একটী উপদেশ দিয়ে দিয়েছি, সেইটীই আগে পালন কর্, বাবা, পরে দেখ্‌বি, ঐ একটীর মধ্য দিয়েই সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ উপদেশ আপনি প্রকাশ পাবে। শিষ্য বল্লে,—সেটী ত' প্রভো পালন কর্‌বই, কিন্তু তার উপর যদি আরো কিছু উপদেশ দিতেন! তারপরে শিষ্য অফুরন্ত বাক্য-বর্ষণে শ্রান্ত ক্লান্ত হ'য়ে নিজেই যখন ঘুমিয়ে পড়্‌ত, গুরু তখন ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত সমাগত দেখে ঘুমুবার আর চেষ্টা না ক'রে শয্যাত্যাগ ক'রে শৌচের জন্য বের হ'তেন। এইভাবে কিছু দিন চল্‌বার পরে গুরুদেবের কষ্টপ্রদ পিত্তশূলের ব্যারাম উপস্থিত হ'ল। গুরু দেখ্‌লেন, এই রুগ্ন দেহ আশ্রয় ক'রে জীবহিত সম্ভব নয়, তখন তিনি যোগবলে দেহত্যাগ কর্ব্বার সঙ্কল্প ক'রে নাভি পর্য্যন্ত গঙ্গাজলে নেবে শিষ্যকে ডেকে বল্লেন,—তোর আর কিছু জান্‌বার থাকে ত' জেনে নে রে, এর পরে কিন্তু আর কিছু বল্‌বার অবসর থাক্‌বে না। শিষ্য ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বল্লে,—কেন, কেন? গুরু বল্‌লেন,—আমি দেহত্যাগ কর্ব্ব। শিষ্য চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে বল্ল,—সে কি গুরুদেব, আপনি না ব'লেছিলেন, একশ বছর আপনি মর্ত্ত্যলোকে থাক্‌বেন? গুরু বল্লেন,—বলেছিলাম ত' ঠিকই বাবা, কিন্তু তোমার মত গুরুভক্ত শিষ্য পেলে পঁচিশ বছরেই একশ বছরের কাজ হয়ে যায়।

আদর্শ ও অভিমত

ইহার পর হইতে কিছু দিন শ্রীশ্রীবাবা দিবসের কোন কোন অংশে মৌনী

থাকিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে যাঁহারা তাঁহার উপদেশ পাইবার জন্য আসিতেন, তাঁহাদিগকে তিনি তাঁহার পূর্ব্বের মতামত সম্বলিত একটা পাণ্ডুলিপি পড়িতে দিতেন। ১৩৩২ সালে যখন শ্রীশ্রীবাবা দুরন্ত রক্তবমন রোগে আক্রান্ত হন, তখন তাঁহার পার্থিব দেহের অবসান আশঙ্কা করিয়া তাঁহার বিভিন্ন সময়ের মতামত ও কথোপকথন সযত্নে সংগৃহীত হয় এবং ঐ পাণ্ডুলিপিটীকে "আদর্শ ও অভিমত" নাম দেওয়া হয়। উহা আর মুদ্রিত হয় নাই, পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই রহিয়া যায়। শ্রীশ্রীবাবার মৌনাবস্থায় কেহ কোনও উপদেশ নিতে আসিলে সেই পাণ্ডুলিপিখানাই কাহাকেও কাহাকেও পড়িতে দেওয়া হইতেছে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় "আদর্শ ও অভিমতের" সমগ্র পাণ্ডুলিপি আমাদের হাতে পৌঁছে নাই। ইহার কিয়দংশ কীটদষ্ট ও ছিন্ন হইয়াছে, কিয়দংশ হারাইয়া গিয়াছে। যেটুকু রহিয়া গিয়াছে, তাহাই অখণ্ড-সংহিতার পাঠক-বর্গকে নিম্নে উপহার দিলাম।

আদর্শ ও অভিমত
প্রথম তরঙ্গ, ১৩৩২

জীব-সেবা মোক্ষলাভের উপায়

প্রশ্ন কর্ত্তা—আমাদের সাধনা কি ?

শ্রীশ্রীবাবা।—জীব-সেবাই আমাদের সাধনা।

প্রশ্ন।—মোক্ষলাভ কি আমাদের প্রার্থনীয় নয় ?

শ্রীশ্রীবাবা।—কেন প্রার্থনীয় হবে না ? মোক্ষ মানে পরমাশান্তি। সে শান্তি কে না চায় ? সে শান্তিতে কার না প্রয়োজন ? জীব-সেবা সেই শান্তি লাভেরই পন্থা। মোক্ষ তোমার লক্ষ্য, জীব-সেবা তোমার উপায়।

ভারতে জীব-সেবার আদর্শ

প্রশ্ন।—আমার ত' মনে হয় জপ, পূজা, হোম, যজ্ঞ, ধ্যান, ধারণা এই সকলের মধ্য দিয়েই প্রকৃত শান্তিলাভ হ'তে পারে। আজকাল যে জীব-সেবা কথাটার খুব

আলোচনা হচ্ছে, আমার মনে হয় ওটা যেন পাশ্চাত্য humanitarian দের কথার একটা নকল-করা সংস্করণ।

শ্রীশ্রীবাবা।—তোমার অনুমান একেবারেই ভুল, একথা বলছি না। কিন্তু জীব-সেবা কথাটা এদেশে নূতন নয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তৃপ্তি হোক্, এ প্রার্থনা ভারতবাসী কয় লক্ষ বছর আগে থেকে কত্তে শিখেছে, তা বোধ হয় নির্দ্ধারণ করা সম্ভবই নয়। আজকালকার ইয়াঙ্কি, ইংরেজ বা ফরাসীরা ত' তুচ্ছ, তাদের গুরুর গুরু গ্রীক-রোমানেরা যখন জীব-সেবার খোঁজমাত্রও পায় নি, তারও অনেক আগে থেকে ভারতীয় সাধক জীব-সেবাকে সাধনা ব'লে জেনেছে এবং সে সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য চেষ্টা করেছে। জপ, পূজা, হোম, ধ্যান এসব যাঁর জন্য, ভারতীয় জীবনে জীব-সেবাও তাঁরই জন্য। যখন আমরা ভগবানকে ভুলে পরের জন্য জীবন দিতে যাই, তখন আমাদের আত্মোৎসর্গ অভারতীয় হ'য়ে যায়। ঐ যে তৃষ্ণা-কাতর পথিক, সে আমার ভগবান্; ঐ যে ক্ষুধাক্ষিন্ন দরিদ্র, সে আমার ভগবান্; ঐ যে নগ্নকটি লজ্জানত ভিক্ষুক, সে আমার ভগবান্। এই বোধ নিয়ে যখন জল-দান করি, অন্নদান করি বা বস্ত্র বিতরণ করি, তখন এই সেবাই আমার ভগবৎ-সাধনা হয়।

সেবাধর্ম্মের সহিত ধ্যান-জপের সম্বন্ধ

প্রশ্ন।—তা হ'লে কি বুঝ্‌তে হবে যে, সেবা-ধর্ম্ম গ্রহণ কর্লে আর ধ্যান জপ কিছুই কত্তে হবে না?

শ্রীশ্রীবাবা।—তা বুঝ্‌বে কেন? সেবা তোমার ভগবৎ-সাধনার সহায়, তোমার ধ্যান-জপের সহায়। জীব-সেবাও কর, ধ্যানজপও কর; দেখ্‌বে, জীব-সেবা তোমাকে চিত্তের যে ঔদার্য্য দিচ্ছে, তা তোমার মনকে ভগবানের ধ্যানে গভীরতা যোগাচ্ছে। আবার, ভগবানের নামজপে বা ধ্যানে তোমার প্রাণে যে আনন্দ-লহরী খেলে যাচ্ছে, তার ফলে তোমার জীব-সেবার সামর্থ্য সহস্রগুণ বর্দ্ধিত হচ্ছে। ভগবৎ-সাধনায় যারা আলস্য করে, তারা জীব-সেবা কত্তে গিয়েও শেষটায় আত্মসেবার নরককুণ্ডে ডুবে মরে, যে প্রাণটা পরার্থের নামে উৎসর্গ ক'রে দেওয়া হ'য়েছিল, সেই উন্নত প্রাণটাকে নিজের যশ, নিজের মান, নিজের প্রতিপত্তি

এসব ছোট জিনিষের সেবায় লাগিয়ে ব্যর্থ ক'রে দেয়। আবার যারা জীব-সেবাকে তুচ্ছ ক'রে ঘরের দরজায় খিল দিয়ে ন্যাস-প্রাণায়াম কত্তে লেগে যায়, তারাও দুদিন পরে স্বার্থপর হ'য়ে পড়ে, জগতের উদ্ধারের চিন্তা ভুলে যায়। জগৎশুদ্ধ সবাই যদি উদ্ধার না পায়, তবে আমার একার উদ্ধারে আর কতটুকু লাভ হ'ল? আমি যখন জগৎ-ছাড়া নই, তখন মোক্ষলাভের জন্য যতই কসরৎ করি না কেন, জগৎ আমাকে ছাড়্‌বে কেন? মোটকথা, জপ-ধ্যান আর জীব-সেবা এরা একে অন্যের অনুপূরক। একটীকে বাদ দিয়ে অপরটী অঙ্গহীন।

সেবার প্রকার-ভেদ

প্রশ্নকর্ত্তা।—কিন্তু দরিদ্রকে অন্নবস্ত্র দান যদি আমার সামর্থ্যের অতীত হয়?

শ্রীশ্রীবাবা।—হোক্ না সামর্থ্যের অতীত, তাতে কোনও ক্ষতি নেই। পারি আর না পারি, আমি অভাবীর অভাব দূর কত্তে ইচ্ছুক হয়েছি, এতেই জীব-সেবা হচ্ছে। আমার সদিচ্ছা দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে তার কোনো উপকার হোক্ বা না হোক্, আমার ইচ্ছা যদি অকপট হয়, তবে আমার এই অন্তর্নিহিত ইচ্ছা-দ্বারাই প্রভাবিত হ'য়ে কোন-না-কোন সামর্থ্যবান্ ব্যক্তি তার অভাব-মোচনে চেষ্টিত হবেন। ফলে, পরোক্ষ ভাবে তার উপকার হবে। তারপর, জীব-সেবা কথাটাকেও শুধু অন্ন-বস্ত্র-দান অর্থে বুঝলে চল্‌বে না। সারাজীবন যাকে ভিক্ষা ক'রে খেতে হচ্ছে, তার একটী দিনের খোরাকীর ভার নিয়েছ ব'লেই তুমি একটা মস্ত বড় জীব-সেবক হ'য়ে দাঁড়িয়েছ, তা নয়। একবার এক দুর্ভিক্ষে অন্নবিতরণ ক'রে, একবার এক জল-প্লাবনে Relief Work ক'রে বা একবার এক মহামারীতে চিকিৎসা ও শুশ্রূষাদি ক'রেই জীব-সেবার তালিকা তুমি পূর্ণ ক'রে দিতে পার না। জগতে যত জীব, তাদের প্রত্যেকের সেবার জন্য ততটী পৃথক্ ভঙ্গী। ক্ষুধার্ত্তকে যখন সেবা কত্তে যাবে, তখন অন্নদানই জীব-সেবা। অজ্ঞানকে যখন সেবা কত্তে যাবে, তখন জ্ঞান-দানই জীব-সেবা। দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্তা নারীকে যখন সেবা কত্তে যাবে, তখন হয়ত স্থল-বিশেষে নরহত্যাও জীব-সেবা। জীব-সেবার কোনও ধরাবাঁধা আইন-কানুন নেই। দেশ, কাল, পাত্র ভেদে জীব-সেবাও পৃথক্ পৃথক রকমের হবে। দৃষ্টান্ত দেখ, যীশু বা গৌরাঙ্গ ক্ষুধার্ত্তের মুখে রুটী দিতে

পারেন নি, কিন্তু তাঁরা আত্মার খাদ্য যুগিয়ে জীব-সেবা করেছেন। রাজর্ষি অশোক হাসপাতাল ক'রে, অতিথিশালা ক'রে, বিহার-প্রতিষ্ঠা ক'রে জীব-সেবা করেছেন। আবার গুরুগোবিন্দ মোক্ষকামী যোগীর সমাজকে এবং শিবাজী শান্তিপ্রিয় মাওয়ালী কৃষক-সম্প্রদায়কে একত্র সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে দুর্দ্ধর্ষ এক যোদ্ধার জাতি সৃষ্টি ক'রে তার মধ্য দিয়েই জীব-সেবা করেছেন।

যুদ্ধ এবং জীব-সেবা

প্রশ্নকর্ত্তা।—যোদ্ধার জাতি সৃষ্টি ক'রে আবার জীব-সেবা কি ক'রে হ'তে পারে? পৃথিবীর দুঃখপুঞ্জ ত' পরস্পর-জিগীষু যোদ্ধাদের দ্বারাই বেড়ে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীবাবা।—সে কথা সত্য, কিন্তু যুদ্ধ ছাড়া যখন গতি থাকে না, রক্তপাত ছাড়া যখন আর কোনও পথ খোলা থাকে না, তখন ধর্ম্মকে রক্ষার জন্য যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ, যুদ্ধ না করা অধর্ম্ম। ধর্ম্মই জীবসেবার সহায়, অধর্ম্ম নয়। ধর্ম্মকে অবজ্ঞা ক'রে বা লাঞ্ছিত হ'তে দিয়ে জীব-সেবা হয় না। ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ তপস্বীদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়ে যদি গুরু-গোবিন্দ সকলকে ব্যূহবদ্ধ না কত্তেন, তা'হলে শিখের ধর্ম্ম থাক্‌ত না, শিখের অস্তিত্ব থাক্‌ত না, অনুদার ধর্ম্মান্ধ শক্তির নিষ্পেষণে শিখজাতির ধর্ম্মের স্মৃতি বা তার জাতীয় অস্তিত্বের চিহ্ন পর্য্যন্ত মুছে যেত। তাই শিখদের অস্ত্রধারণের প্রয়োজন পড়েছিল। আমাকে যে আঘাত করে, ক্ষমা করার সামর্থ্য থাক্‌লে তাকে ক্ষমা কর্ব্ব বই কি? কিন্তু ক্ষমা মহতের লক্ষণ ব'লেই আত্মরক্ষায়, ধর্ম্মরক্ষায়, নির্দ্দোষীর প্রাণরক্ষায়, নারীর সতীত্ব রক্ষায় উদাসীন হওয়া কখনো ধর্ম্ম নয়! বরঞ্চ তাতে আমি ধর্ম্মচ্যুত হব। শিখরা লড়াই ক'রে ধর্ম্মকে রেখেছিলেন, তাই যুদ্ধের দ্বারাও জীব-সেবাই হ'য়েছিল।

প্রশ্নকর্ত্তা।—যুদ্ধও যে ধর্ম্মানুমোদিত হ'তে পারে, তা বুঝতে পাচ্ছি। কিন্তু যুদ্ধ দ্বারা জীব-সেবা কি ক'রে হ'ল বুঝতে পার্লাম না।

শ্রীশ্রীবাবা।—যেখানে তোমার মাতার, তোমার ভগ্নীর, তোমার জায়ার বা তোমার কন্যার সম্মান প্রতি পদে লাঞ্ছিত হচ্ছিল, যুদ্ধ দ্বারা সেখানে সে লাঞ্ছনা দূরীভূত হ'ল। দুর্ব্বল যেখানে উৎপীড়িত হচ্ছিল, সেখানে সে অত্যাচার থেকে উদ্ধার পেল। নিরপরাধের যেখানে রাজদণ্ড হচ্ছিল, সেখানে সে নির্ব্বিঘ্ন হ'ল।

জোর ক'রে ধ'রে অন্য-ধর্ম্মাবলম্বীকে ধর্ম্ম-বিশেষে দীক্ষিত কর্ব্বার যে নির্য্যাতনমূলক অন্ধ গোঁড়ামি চল্‌ছিল, তা চিরতরে রুদ্ধ হ'ল। এর প্রত্যেকটী স্থলে যুদ্ধের দ্বারা আর্ত্ত-সেবাই হয়েছে। যুদ্ধ ছাড়া যেখানে দরিদ্রের দারিদ্র্য ঘোচে না, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় জোটে না, দুঃখীর দুঃখ নিবারিত হয় না, যুদ্ধ সেখানে জীব-সেবারই নামান্তর। পরাধীনতা যেখানে জীবের অসহনীয় ক্লেশের কারণ, সেখানে ক্লেশ উপশমের অন্য উপায় না থাক্‌লে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হওয়াই প্রকৃত জীব-সেবা। পরধর্ম্মীর অত্যাচারে বাঙ্গলা ও মগধের যুদ্ধ-বিমুখ স্মার্ত্ত পণ্ডিতেরা বনে-জঙ্গলে আত্ম-গোপন ক'রে সমাজকে নানা বিধি-ব্যবস্থার বেড়াজালে ঘিরে যতখানি জীব-সেবা ক'রেছেন, আমার মতে অত্যাচারের প্রতিবাদকারী বীর শিখ যোদ্ধারা তার শতগুণ জীব-সেবা কত্তে পেরেছেন। তবে, দুর্ভাগ্যের কথা, ধর্ম্মরক্ষার যে মহান্ আদর্শ নিয়ে শিখ-জাতির অভ্যুদয়, দিনের পর দিন তা ম্লান হ'য়ে শেষটা স্বার্থরক্ষায়, ব্যক্তিগত সুখতৃষ্ণায় পরিণত হয়েছিল। নতুবা ভারতবর্ষের ইতিহাস আজ অন্যরূপে লিখ্‌তে হ'ত। শিখের উদার ধর্ম্ম, শিখের বীর জীবনের মহিমা হয়ত সমগ্র ভারতবর্ষটাকে আপন ক'রে নিতে পাত্ত। শিবাজীর অভ্যুদয় সম্বন্ধেও ঠিক ঐ একই কথা। যে নির্লোভ নিষ্কাম কর্ম্মসাধনার আদর্শ শিবাজীর গৈরিক পতাকাকে বিজয়-গর্ব্বে উড্ডীন করেছিল, মারাঠা জাতি সঙ্কীর্ণ স্বার্থের পদতলে তাকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিল! "গো ব্রাহ্মণহিতায় চ" শেষ পর্য্যন্ত গিয়ে বর্গীর হাঙ্গামায় নিজের চিতা রচনা কল্ল!

আদর্শ ও অভিমত

দ্বিতীয় তরঙ্গ (১৩৩২)

নারীর ব্যায়াম

শিক্ষাবিষয়ক একখানা গ্রন্থ পঠিত হইতেছিল। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—স্ত্রীলোকের অশ্বারোহণ, অস্ত্রচালনা, ব্যায়াম প্রভৃতি কুরুচি মাত্র।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অনেকে আছেন, স্ত্রীদের পক্ষে সন্তান-প্রসবের অতিরিক্ত অন্য কোনও কাজ আছে ব'লে মনে করেন না। ইনিও হয়ত তাঁদেরই একজন। এ গুলি হচ্ছে ইতিহাস ও শরীর-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞানের অতিমাত্র সীমাবদ্ধতার ফল।

এই ভারতবর্ষেই যে অসংখ্য মহিলা দেশের স্বাধীনতা, নিজের সতীত্ব বা পতিকুলের সম্মান রক্ষার জন্য অশ্বারোহণ ক'রে, তরবারি পরিচালনা ক'রে, মল্লবিদ্যার ব্যবহার ক'রে বিন্দুমাত্র গৌরবভ্রষ্ট হন নি কিম্বা সন্তান-প্রসবে বা সন্তান-পালনে অসমর্থ হন নি, সে কথা কি ইতিহাস বল্‌ছে না? রাণী দুর্গাবতী যে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ক'রে রণক্ষেত্রেই জীবন দিয়েছিলেন, সেটা কি নারীজাতির পক্ষে কোনো অপমানের কথা? বরং এই যে আজ গ্রামে গ্রামে অবাধে নারীহরণ চল্‌ছে, দু-একটী ছাড়া সহস্র সহস্র আক্রান্তা নারীর মধ্যে কেউ দুর্ব্বৃত্তদের বিন্দুমাত্র বাধা দিতে পাচ্ছে না, এটাই অত্যন্ত অপমানের কথা। শুধু নারীদেরই অপমান, তা' নয়, অপমানটা পুরুষেরই বেশী। সে-ই ত' নারীকে ব্যায়াম-চর্চ্চায় বঞ্চিত করেছে, আত্মরক্ষায় অক্ষম করেছে, পিঞ্জরে পূরে রেখে নিজের অভিভাবকত্ব চালাচ্ছে! অথচ এম্‌নি ব্যাপার যে, নারীর বিপদের সময়ে পুরুষের টিকিটীর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। অপহৃতাকে খুঁজে বের কর্ব্বার কালে সে উদাসীন। যার দুর্ভাগ্যের জন্য তারই পৌরুষহীনতা দায়ী, তাকে ফিরিয়ে এনে ঘরে তুলে নিতে সে নারাজ। মোট কথা হচ্ছে, নারীদের বাহুতেও শক্তি দিতে হবে, যেন তারা নিজেদের মান নিজেরা রাখ্‌তে পারে, আততায়ীর বুকে আমূল ছুরিকা বিদ্ধ ক'রে দিয়ে রক্তে স্নান কত্তে পারে, সতীত্বের অমর্য্যাদাকারী নরপশুর হিংস্রতাকে ভয় না ক'রে তাকে তার ন্যায্য প্রাপ্য চুকিয়ে দিতে পারে।

নারীর ব্যায়ামের বাণী প্রচার

প্রশ্নকর্ত্তা।—কিন্তু সে ব্যবস্থা কি ক'রে সম্ভব?

শ্রীশ্রীবাবা।—দনুজ-দলনী মূর্ত্তিতে নারীকে যে জাগ্‌তে হবে, রণরঙ্গিনী রক্ত-বীজ-বিনাশিনী কালী করালীকে যে গভীর হুঙ্কারে ত্রিলোক কাঁপিয়ে অবতীর্ণা হ'তে হবে, এই বাণী আজ দেশের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে দাও।

নারী-জীবনের পূর্ণতা কোমলে-কঠোরে

প্রশ্নকর্ত্তা।—কিন্তু আজকাল সহস্র সহস্র লেখক ও শিল্পী নারীর শুধু কোমল দিক্‌টারই চর্চ্চা ক'রে ক'রে এক অস্বাভাবিক আবহাওয়া সৃষ্টি ক'রেছেন। এঁদের বিরুদ্ধতা ঠেলে অগ্রসর হওয়া বড় সহজ হবে মনে করি না।

শ্রীশ্রীবাবা।—সহজ হোক্, কঠিন হোক্, যা প্রয়োজন এবং যা কর্ত্তব্য, তা যে তোমাকে কত্তেই হবে। এর জন্য নূতন একদল চিন্তাশীল লোক সৃষ্টি ক'রে নিতে হবে। প্রথম কৈশোরেই যাদের ভিতর স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ দেখা যাচ্ছে, এমন একদল লোককে খুঁজে বের ক'রে নিতে হবে, আর তাঁদের সমস্ত অন্তর্নিহিত সম্পদকে বিকশিত হবার যোগ্য সুযোগ ক'রে দিতে হবে। এঁদের মধ্যে কবি, দার্শনিক, ঔপন্যাসিক, চিত্রকর, নাট্যকার, গায়ক, বক্তা প্রভৃতি সব থাক্‌বেন। সর্ব্বত্র এঁরা স্বাধীনতার, পরিপূর্ণতার এবং মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে দুহাতে ছড়িয়ে যাবেন। রুদ্রভাব আর শান্তভাব এ দুটী একাধারে থাক্‌লেই যে সৌন্দর্য্য তার পূর্ণ সৌষ্ঠব লাভ করে, এই কথাটা এঁরা দেশকে, জাতিকে বুঝাবেন। একই নারী যে পতিসোহাগিনী আবার মহিষ-মর্দ্দিনী হ'তে পারেন, একই নারী যে গণেশ-জননী আবার ছিন্নমস্তা সাজ্‌তে পারেন, সেই ধারণাটা দেশকে এঁরা দিতে থাক্‌বেন।

নারীর শক্তি-চর্চ্চায় পুরুষের বিরোধের কারণ

প্রশ্নকর্ত্তা।—আচ্ছা, পুরুষেরা যে স্ত্রীজাতির মধ্যে শক্তিচর্চ্চার বিরোধী, তার প্রকৃত কারণটা কি ?

শ্রীশ্রীবাবা।—এক কারণ, পুরুষদের নানা ভিত্তিহীন আশঙ্কা ও অজ্ঞতা। দ্বিতীয় কারণ, সাধারণতঃ পুরুষেরা স্ত্রীগণকে নিজেদের চাইতে হেয় মনে করে। তৃতীয়তঃ, অধিকাংশ পুরুষের মধ্যে বীরত্বের একান্ত অভাব। আমরা যেদিন প্রকৃতই বীর হব, সেদিন নারীরা বীর্য্যবতী হ'তে আর বাধা পাবেন না, বরং পদে পদে উৎসাহ পাবেন। তখন নারীজাতির দৈহিক শক্তি অর্জ্জনের জন্য দেশ জুড়ে শত শত প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠ্‌বে।

নারীহরণ-প্রতীকারের দ্বিবিধ উপায়

প্রশ্নকর্ত্তা।—নারীহরণের প্রতীকার কি ভাবে কত্তে হবে মনে করেন ?

শ্রীশ্রীবাবা।—আমার মতে উপায় আছে দুটী। একটী হচ্ছে, নারীদের বাহুতে শক্তি দিতে হবে. অস্ত্রচালনায় এঁদের সুনিপুণা কত্তে হবে. আত্মবিশ্বাস ও কৌশলজ্ঞতা জন্মাবার জন্যে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা কত্তে হবে। দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে,

পুরুষের মন থেকে কামুকতার আবর্জ্জনা দূর কত্তে হবে। এক গ্রামে একটী নারীর সতীত্বের অমর্য্যাদা হ'লে দশটা গ্রামের সবগুলি পুরুষ যে প্রতিকারের জন্য ক্ষেপে ওঠে না, চুপ ক'রে সয়ে যায়, তার প্রধান কারণটা ভয় বা অসামর্থ্য নয়। সেটি হচ্ছে, কামুকতা। একটী অসহায়া যুবতীকে কায়দা-মতন পেলে এদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই হিংস্র ব্যাঘ্রের মূর্ত্তি ধারণ কত্তে অসম্মত নয়। এদের মনে আবার নারী-নির্য্যাতকের বিরুদ্ধে ক্রোধ জন্মাবে কি ক'রে? যে ব্যক্তি নিজে পাপী বা পাপ-প্রবণ, অন্য পাপীকে নিন্দা কর্ব্বার বেলা সে তর্ক-পঞ্চানন হ'তে পারে কিন্তু তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে কোন্ নৈতিক শক্তির বলে? যিনি নিজে সৎ, নিজে সংযমী, তাঁরই শুধু যথার্থ শ্রদ্ধা জন্মাতে পারে এবং তেমন পুরুষই নারী-মর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী নরপশুদের উপযুক্ত দণ্ডবিধানে উদ্যত হ'তে পারেন। তাই আমি মনে করি, সংযম ও চরিত্রের আন্দোলনকে নারীহরণ-নিবারণের প্রধান অস্ত্ররূপে গ্রহণ কত্তে হবে। নারীনির্য্যাতনের প্রতীকারে দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকেও কখনো কখনো অগ্রবর্ত্তী হ'তে দেখা যায় বটে, কিন্তু তারা প্রায়ই একটী অমলাকে উদ্ধার কত্তে গিয়ে আবার দশটী বিমলার নরকের পথ প্রস্তুত করে।

প্রশ্নকর্ত্তা।—কিন্তু সকল পুরুষের মন থেকে অবৈধ পাপলিপ্সা দূর ক'রে দেওয়াত' সম্ভব নয়।

শ্রীশ্রীবাবা।—সুতরাং জগতে চিরকালই একদল নারীহরণকারী দুর্ব্বৃত্ত থাক্‌তে চাইবে। তাদের জন্য মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা রাখ্‌তেই হবে। তাদের অপরাধের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধানের জন্য হনুমানের ন্যায় জিতেন্দ্রিয় একদল অমর কর্ম্মীকে স্বর্ণলঙ্কা ছারখার কর্ব্বার জন্য চিরকালই প্রস্তুত থাক্‌তে হবে। নারীদেরও সীতার মত কোমলাঙ্গী ও রোদন-সম্বলা না হ'য়ে দ্রৌপদীর মত সাহসিকা ও বিপদের মুখে অনধীরা হ'তে হবে। সংযম-আন্দোলনের সহায়তায় পুরুষের চরিত্রবলকে এমন অনমনীয় ক'রে তুল্‌তে হবে যেন, নারী অমর্য্যাদাকারী নরপশুকে ক্ষমা করা মহতের লক্ষণ ব'লে সে আত্মবঞ্চনা না করে। চরিত্রবান ব্যক্তিই দুর্ব্বৃত্তকে প্রবল জেনেও তার শাস্তি-বিধানে সাহসী হন। চরিত্রবান্ পুরুষই জনশক্তিকে এই মহাপাপের বিরুদ্ধে প্রবুদ্ধ ক'রে তুল্‌তে পারেন।

আদর্শ ও অভিমত
তৃতীয় তরঙ্গ, (১৩৩২)

অর্থ ও স্বদেশ-সেবা

প্রশ্নকর্ত্তা।—দেশের সেবা যে দিক্ দিয়েই কত্তে চাই না কেন, টাকা ছাড়া এক পা বাড়াবার উপায় নেই। অনেক চিন্তা ক'রে দেখেছি, কিন্তু অর্থ-সমস্যার আর মীমাংসা ক'রে উঠ্‌তে পাচ্ছি না।

শ্রীশ্রীবাবা।—তা এখন বরং মীমাংসাটা চট ক'রে না-ই হ'য়ে গেল! বেশ ত' কিছুদিন চেষ্টা-চরিত্র ক'রেই দেখ না, কোনও পথ বেরোয় কিনা। কিন্তু একটী কথা মনে রেখো, দেশের কাজের জন্য অর্থ ততবড় কথা নয়, প্রাণই আসল কথা। প্রাণটা যদি দিতে পার, অর্থ আস্‌বেই, আর যদিই বা না আসে, কাজ আট্‌কাবে না। কিন্তু উৎসর্গ কর্ব্বার জন্য প্রাণ যদি না মিলে, তা হ'লে অর্থ মিল্‌লেই বা কি লাভ হবে?

প্রশ্নকর্ত্তা।—আমার ত' মনে হয় কার্য্যোপযোগী অর্থ মিল্‌লে দেশের কাজে নিজেকে সঁপে দিতে পারে শত করা নিরানব্বই জন।

শ্রীশ্রীবাবা।—না বাছা, অত আশান্বিত হয়ো না। যাদের মনে কচ্ছ কাজ কর্ব্বার টাকা পেলেই লেগে যেতে পারেন, কার্য্যকালে আবার এদের মধ্যে ঠিক শত-করা নিরানব্বই জনই পিছন ফির্‌বেন। যাঁরা বলেন, 'সুযোগ পাই না, তাই দেশের জন্য কাজ করি না'—তাঁদের দেশসেবার আকাঙ্ক্ষাটার মধ্যে ভেজাল রয়েছে। পাঠ-শালা খুলে গ্রামের সকল গোবৎস ঠেঙ্গিয়ে মানুষ কত্তে পার্‌লাম না ব'লে কি একটামাত্র বাছুরের রাখালীও করা যাবে না? তোমাদের বন্ধুদের মধ্যেই একটী দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। বিধবাদের দুঃখ দেখে তার প্রাণ কেঁদেছে। কিন্তু পুনর্বিবাহের আদর্শ তার মনঃপূত হয়নি। সে মনে মনে বুঝেছে, বিধবা যদি তার বৈধব্যটার একটা মহিমা সৃষ্টি ক'রে নিতে পারে, তাহ'লে এই বৈধব্যই তার জীবনের সুখ ও সার্থকতার নিদান হবে। শিক্ষাই সে এর একমাত্র উপায় ব'লে বুঝেছে; বিধবা-দের জন্য উপযুক্ত আশ্রম গঠিত না হ'লে বর্ত্তমান অবস্থায় বিধবাকে ঠিক্ ঠিক দেবতা ক'রে গড়া যে কত শক্ত, সে তাও বোঝে। কিন্তু সে অতিশয় দরিদ্র,

বিধবাশ্রম গড়া দূরের কথা, একটী বিধবাও প্রতিপালন তার পক্ষে অসম্ভব। ঋণে সে জর্জ্জরিত, সংসারে দারুণ অভাবের দুশ্চিন্তায় অকালে সে বার্দ্ধক্যগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তাই ব'লে সে হাল ছেড়ে দেয় নি। নিজ প্রতিবেশী একটী কর্ম্মকার জাতীয়া বিধবা মেয়েকে সে সুন্দর লেখাপড়া শিখিয়েছে, ব্রাহ্মণের বিধবাদের মত সদাচারপরায়ণা করেছে, নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ে নানা প্রকারে সংশিক্ষা দিয়ে তার চরিত্রবল, তেজস্বিতা, সদ্‌বিষয়ে রুচি ফুটিয়ে দিয়েছে। অথচ, উপার্জ্জনের চেষ্টায়, চাকুরীর উমেদারীতে তাকে বৎসরের অধিকাংশ সময়েই বাইরে কাটাতে হয়। বৎসরের পর বৎসর ধ'রে একটু একটু ক'রে অসীম ধৈর্য্যের শক্তি নিয়ে সে এই মা-টীকে তৈরী করেছে। এই ছেলেটীর দৃষ্টান্তের আলোকে যদি দেখ, তবে বুঝতে পার্ব্বে যে, যত লোকে বলে,—"সুযোগ পাই না মশাই, সুযোগ পাই না, নইলে আমরা দেশের চৌদ্দপুরুষকে উদ্ধার ক'রে দিতাম,"—তাদের মধ্যে কজন সত্যবাদী। বিশ্ববিদ্যালয়ের পঁচিশ ত্রিশ হাজার ছাত্র ছুটী উপলক্ষ্যে বছরের মধ্যে তিন মাস দেশে থাকে। এই ছুটীটায় প্রতিদিন যদি তারা একটী ঘণ্টা ক'রে সময় দেশের লোকের অজ্ঞানতা দূর কর্ব্বার জন্য খরচ করে, তাহ'লে বিনা টাকায়, বিনা পয়সায় দশ বছরের মধ্যে ভারত যে কোনও স্বাধীন দেশের সমকক্ষতা লাভ কর্ত্তে পারে। কিন্তু যত হা-হুতাশ বিতর্কসভায়, কাজের বেলাই অরুচি আর অর্থাভাবের দোহাই। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় গ্রামবাসীদের খবরের কাগজখানা পড়ে শুনাতে ক'লাখ টাকা লাগে? সপ্তাহে একটা ক'রে উচ্চচিন্তামূলক সৎ-সঙ্গীত শেখাতে ক'লাখ টাকা লাগে? সপ্তাহান্তে, পক্ষান্তে বা মাসান্তে একটা সভার মত ক'রে মহাপুরুষদের জীবনী ও বাণী শুনাতে কত টাকার দরকার হয়? আমার মত এই, অর্থের অজুহাতে যারা দেশের ছোট ছোট কাজগুলি, তুচ্ছ প্রয়োজনগুলি উপেক্ষা করে, বড় কাজ তাদের কাছে আশা করা ভুল। আর যদিও যশের তাড়নায় বড় কাজে তারা হাত দেয়, তাহ'লেও কাজের ভিতর এমন সব মারাত্মক ত্রুটী থেকে যায়, এমন সব গুরুতর গলদ প্রবেশ করে যে, তাতেই কর্ম্ম পণ্ড হ'য়ে যায়। পরন্তু বড় কাজের সুযোগের অভাবে প্রাণভরা প্রেম নিয়ে যিনি ছোট কাজগুলিই অসামান্য সহিষ্ণুতা সহকারে ক'রে যান, মা সরস্বতী তাঁর শ্রেষ্ঠ ভাণ্ডার থেকে

দুর্ল্লভতম বুদ্ধিশক্তি তাঁকে প্রদান করেন, আর মা-লক্ষ্মীও দুদিন আগে হোক্ আর পিছে হোক্, নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদনে তৎপরা হন।

প্রশ্নকর্ত্তা।—অনেকে ছোট খাট "স্কেলে" দেশের কাজ করেন কিন্তু অর্থাভাবে সাংসারিক কর্ত্তব্যের দায়ে আবদ্ধ হ'য়ে আছেন।

শ্রীশ্রীবাবা।—তা ঠিক্। কিন্তু দেশের জন্য প্রাণদান কথাটা একেবারে বিনা সর্ত্তে বুঝ্‌তে হবে। দেশ আমার পরিবার-বর্গের ভার নিক্, তারপর আমি প্রাণ দিব, এর নাম ঠিক্ ঠিক্ প্রাণদান নয়। দেশ ভার নিক্ আর না নিক, সময় এলেই আমি আমার ছিন্নশির দেশ-মাতার পায়ে উপঢৌকন দিব,—একেই বলে প্রাণদানের সঙ্কল্প। দেশসেবী ত' সৈনিক! প্রস্তুত হ'য়ে তিনি ব'সে আছেন,—ডাক পড়্‌লেই বুকটা কামানের মুখে পেতে দেবেন, তারপর চাই তিনিই মরেন, কি কামানটাই গোলা উদ্গার কত্তে কত্তে স্তব্ধ হ'য়ে মরুক।

আদর্শ ও অভিমত
চতুর্থ তরঙ্গ, ১৩৩২

সন্ন্যাস কি ঈশ্বরের অনভিপ্রেত ?

আজিকার প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—সৃষ্টির প্রসার কি ঈশ্বরের অভিপ্রেত, না, অনভিপ্রেত ?

প্রশ্নকর্ত্তার ভাবভঙ্গীতে মনে হইতেছে, তিনি সংসার ও সন্ন্যাসকে লক্ষ্য করিয়াই কথা বলিতেছেন।

শ্রীশ্রীবাবা উক্ত প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়া প্রশ্নকর্ত্তাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার কিরূপ মনে হয় ?

প্রশ্নকর্ত্তা।—আমার মনে হয়, সৃষ্টির প্রসারই ঈশ্বরের অভিপ্রেত।

শ্রীশ্রীবাবা।—কি কি কারণে তোমার এরূপ মনে হচ্ছে ?

প্রশ্নকর্ত্তা।—স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি, একটা গাছ জন্মালে তাতে শত শত ফল ধর্‌ছে, প্রত্যেকটা ফলে আবার নূতন গাছ সৃষ্টি কর্ব্বার শক্তি নিয়ে একটা ক'রে বীজ জন্মাচ্ছে, এই সব বীজের দ্বারা আবার শত শত নূতন গাছ সৃষ্টি হচ্ছে।

শ্রীশ্রীবাবা।—এবং আরও দেখ্‌তে পাচ্ছ যে, একটী মানব ও একটী মানবীর মিলন থেকে কত নূতন নূতন মানব-মানবীর সৃষ্টি হচ্ছে, এদের ঔরসে ও গর্ভে আবার কত মানব-মানবীর আবির্ভাব হচ্ছে। কেমন, তাই না?

প্রশ্নকর্ত্তা।—আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীশ্রীবাবা।—এই সব দেখেই তোমার মনে হচ্ছে যে, জীবজগতের প্রসারই বিধাতার অভিপ্রায়। অতএব জীবমাত্রেরই এই সৃষ্টিকার্য্যে যোগদান করা কর্ত্তব্য। কেমন, না?

প্রশ্নকর্ত্তা।—আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীশ্রীবাবা।—কিন্তু বল দেখি, একটা গাছে যতগুলি ফল ফলে, তার প্রত্যেকটী ফলের বীজেই কি গাছ হয়?

প্রশ্নকর্ত্তা।—না, তা হয় না।

শ্রীশ্রীবাবা।—কেন হয় না, বল দেখি?

প্রশ্নকর্ত্তা।—সবগুলি বীজে নূতন গাছ জন্মাবার ক্ষমতা থাকে না।

শ্রীশ্রীবাবা।—কেন থাকে না?

প্রশ্নকর্ত্তা।—তা' বল্‌তে পারি না।

শ্রীশ্রীবাবা।—আচ্ছা, একথা বলা চলে কি যে, ঈশ্বরের এমন অভিপ্রায় ছিল যে, ঐ বীজগুলি দিয়েও গাছ জন্মাক, কিন্তু অন্য কোনও কারণ বশতঃ সৃষ্টির ক্ষমতা লোপ পাওয়ায় ঈশ্বরের অভিপ্রায় ব্যর্থ হ'য়ে গেল?

প্রশ্নকর্ত্তা।—না, তা বলা চলে না।

শ্রীশ্রীবাবা।—কারণ, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি যদি অভিপ্রায় করেন যে নির্দ্দিষ্ট একটী বীজে বৃক্ষোদ্‌গম হবেই, তাহ'লে কোনও কারণেই তার সৃষ্টি-শক্তি লোপ পেতে পারে না। কেমন, এই ত' তোমার কথা?

প্রশ্নকর্ত্তা।—আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীশ্রীবাবা।—তাহ'লে একথা বলা চলে কি, যে বীজগুলিতে বৃক্ষোদ্‌গমের ক্ষমতাই নেই, তারা বৃক্ষসৃষ্টি করুক, এ অভিপ্রায় ঈশ্বরের নাই?

প্রশ্নকর্ত্তা।—তা' বলা চলে।

শ্রীশ্রীবাবা।—তা হ'লে একথা বলা যায় না কি যে, সৃষ্টির প্রসার যেমন ঈশ্বরের অভিপ্রায়, তেমন কোনও কোনও স্থলে সৃষ্টির সঙ্কোচও তাঁরই অভিপ্রায় ?

প্রশ্নকর্ত্তা।—তা' বলা যায়।

শ্রীশ্রীবাবা।—আচ্ছা, বৃক্ষোদ্গমের ক্ষমতা যতগুলি বীজের আছে, সবগুলিই কি বৃক্ষসৃষ্টি ক'রে থাকে ?

প্রশ্নকর্ত্তা।—না, তা করে না।

শ্রীশ্রীবাবা।—অনেকগুলি অকালে পচে বা শুকিয়ে যায়, কতকগুলি বা অঙ্কুরোদ্গমের যোগ্য ভূমিই পায় না। কেমন ?

প্রশ্নকর্ত্তা—আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীশ্রীবাবা।—এবং কতগুলি বীজ অঙ্কুরোদ্গমের সকল শক্তি থাকা সত্ত্বেও, পচে বা শুকিয়ে না যাওয়া সত্ত্বেও এবং যোগ্য ভূমি মিলা সত্ত্বেও অন্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় ব'লে বৃক্ষসৃষ্টি করে না। যেমন ধর, কোনও বীজ ঔষধার্থে, কোনও বীজ খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্নকর্ত্তা।—তা সত্য।

শ্রীশ্রীবাবা।—বল্‌তে পার, অনেক বীজ অকালে পচে বা শুকিয়ে যায় কেন, অনেক বীজ উপযুক্ত ভূমি পায় না কেন, অনেক বীজ ঔষধার্থ বা অপরের আহারার্থ ব্যবহৃত হয় কেন ?

প্রশ্নকর্ত্তা।—তা বল্‌তে পারি না।

শ্রীশ্রীবাবা।—এমন কথা বলা চল্‌বে কি যে, ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল এরা জীবসৃষ্টি করুক, কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণ বশতঃ ঈশ্বরের অভিপ্রায় ব্যর্থ হয়ে গেল ?

প্রশ্নকর্ত্তা।—না, তা বলা চল্‌বে না।

শ্রীশ্রীবাবা।—বলা যায় কি যে, এই কয়টী নির্দ্দিষ্ট বীজের দ্বারা সৃষ্টি ব্যতীত অপর কোনও প্রয়োজনসিদ্ধির অভিপ্রায় ঈশ্বরের ছিল ?

প্রশ্নকর্ত্তা।—তা বলা যায়। কিন্তু সেই প্রয়োজনগুলি কি ?

শ্রীশ্রীবাবা।—প্রয়োজন অনন্ত হ'তে পারে। সবই যে এক নিমেষে বুঝে ফেল্‌ব, তা নয়। তবে, মোটামুটি দেখা যায়, যেগুলি পচে গেল, সেগুলি ভূমির

উর্ব্বরতা বাড়াল। যেগুলি শুকাল, সেগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটের আবাসভূমি বা পক্ষীর আহার্য্য হ'ল। ঔষধ সেবন ক'রে নীরোগ ও সবল না হ'লে যাদের বংশধরেরা বলবান্ হ'তে পারৃত না, সেই সকল মানুষের ঔষধ হয়ে কতকগুলি বীজ জীব-জগতের স্থায়িত্ব বাড়াল। ক্ষুধায় ক্লিষ্ট হ'য়ে যারা খাদ্যাভাব-কষ্টে পড়্ত, কতকগুলি তাদের আহারীয় যোগিয়ে জীবকে মৃত্যু হ'তে রক্ষা করল। এবং এরা আরও কত কত প্রয়োজনকে সিদ্ধ করল, তার ইয়ত্তা কি ?

প্রশ্নকর্ত্তা।—মানুষের সমাজেও কি এইরূপ ?

শ্রীশ্রীবাবা।—তা বৈ কি ? তবে বৃক্ষের দৃষ্টান্তের সাথে মানবের দৃষ্টান্ত মিলাতে গেলে সাদৃশ্যটা একটু দুরূহ রকমের হবে। কিন্তু প্রকৃত কথাটা একই। একটী মানুষের ঘরে অনেকগুলি মানুষ জন্মে, এরা সকলেই সৃষ্টির ক্ষমতা নিয়ে আসে না। কতকগুলি জন্মাবধিই সৃষ্টিশক্তি-বঞ্চিত হ'য়ে বৰ্দ্ধিত হয়। কতকগুলির সৃষ্টি-শক্তি থাক্‌লেও অকালমৃত্যু হয়, তাই সৃষ্টি ক'রে যেতে পারে না। কতক-গুলির সৃষ্টিশক্তি স্বত্বেও যেরূপ বিবাহে সৃষ্টি-প্রসার হ'ত, তেমন বিবাহ হয় না, যেমন ধর, বন্ধ্যা নারীর সঙ্গে সামর্থ্যবান্ পুরুষের বিবাহ অথবা সামর্থ্যহীন পুরুষের সাথে সামর্থ্যবতী নারীর বিবাহ। কোন কোন স্থলে সৃষ্টিসমর্থা স্ত্রী ও সৃষ্টি-সমর্থ পুরুষের বিবাহও সৃষ্টি-রক্ষা কত্তে পারে না, দারিদ্র্য বশতঃ, অন্নাভাবে, গর্ভাবস্থায় কোনো অপ্রত্যাশিত বিপদে ভ্রূণাবস্থায়ই সন্তান ম'রে যায়। দু-একজন থাকেন, যাঁরা সৃষ্টি কর্ল্লে কত্তে পাত্তেন কিন্তু তা না ক'রে সমাজের দৈহিক এবং মানসিক ব্যাধি নিবারণার্থে, সমাজের উদরের এবং অন্তরের ক্ষুধা প্রশমনার্থে আকৌমার ব্রহ্মচর্য্যপুষ্ট সবল সুদৃঢ় জীবন সর্ব্বতোভাবে সমর্পণ ক'রে দিলেন, নিঃশেষে পরসেবার সুমহৎ ব্রত গ্রহণ কর্ল্লেন। এঁরাই সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী। এঁরা নূতন জীব সৃষ্টি করেন না, কিন্তু অপরাপররা যা সৃষ্টি কচ্ছেন, তা যাতে পাপে, অপরাধে, দুর্ম্মতিতে নির্ম্মূল হ'য়ে না যায়, তার জন্যে প্রাণপাত করেন। এঁরা নিজেদের ঔরসে বা নিজেদের গর্ভে সন্তান সৃষ্টি করেন না ব'লে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হন না।

সকলেই কি সন্ন্যাসী হইতে পারে ?

দ্বিতীয় এক প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিন্তু সবাই যদি সন্ন্যাসী হয়ে যান ?

শ্রীশ্রীবাবা।—তা' কখনো হ'তে পারে না। একমাত্র সৃষ্টির প্রসারও যেমন বিধাতার অভিপ্রেত নয়, সৃষ্টির সম্যক্ বিলোপও তেমন তাঁর অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ। যে ভগবান্ এক এক দল লোককে সন্ন্যাসী করেন, ঠিক তিনিই এক এক দল লোককে গৃহীও করেন। মানব-সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে কোনও শ্রেণীর আধিক্য, কোনও শ্রেণীর বা অল্পতা হয়। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পরে অঙ্গ-বঙ্গ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীতে পূর্ণ হ'য়ে গিয়েছিল, কিন্তু এঁরাই আবার বাধ্য হ'য়ে পরে দলে দলে সংসারী হ'য়েছিলেন। শুন্‌তে পাই, এই ভাবেই নাকি বিরাট নমঃশূদ্র জাতিটার সৃষ্টি হ'য়েছে। সমাজ-ত্যাগী সন্ন্যাসীরা ফিরে এসে গৃহী হ'লেন ব'লে, বিশেষতঃ বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি হিন্দু-সমাজের আন্তরিক একটা বিদ্বেষ ছিল ব'লে, সমাজ আর এঁদের বুকে তুলে নিলেন না। তখন এঁরা নিজেদের মধ্যেই একটা সমাজ গ'ড়ে নিলেন। এই দেখ না, যোগী জাতিটার ইতিহাস কি? এঁদের গোত্র শিব-সন্ন্যাস। অর্থাৎ শিব এঁদের ইষ্টদেবতা, সন্ন্যাসীরা এঁদের পূর্ব্বপুরুষ। এখনও মৃত্যু হ'লে এঁদের মধ্যে সন্ন্যাসীর মত যোগাসনে উপবিষ্ট ক'রে ভূগর্ভে প্রোথিত করান প্রথা রয়েছে। এঁদেরও ঐ একই কারণে সমাজের কাছে অপাং-ক্তেয় হ'য়ে থাক্‌তে হ'য়েছে। যে জ্ঞানদেবকে দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থানে দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য্য ব'লে মনে করা হয়, তাঁর পিতা উচ্চ ব্রাহ্মণকুলের সন্তান হ'য়েও সন্ন্যাস-গ্রহণের পর পুনরায় গৃহী হওয়ায় সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হ'য়েছিলেন। সন্ন্যাস-গ্রহণ-মাত্র যিনি ত্রিলোকের গুরু, পুনরায় দারপরিগ্রহ-মাত্র তিনি সমাজের দৃষ্টিতে অস্পৃশ্য,—এই এক শাসন চিরকাল হিন্দু-সমাজে চ'লে আস্‌ছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা, নাথপন্থী যোগী-যোগিনীরা নিশ্চয়ই তা জান্‌তেন। সমাজের কাছে ছোট হ'য়ে থাক্‌তে হবে জেনেও তারা সন্ন্যাস পরিত্যাগ ক'রে গৃহী হ'লেন কেন জানো? যেহেতু সন্ন্যাস সকলের জন্য নয়, সকলে সন্ন্যাসের জন্য নন। যাদের জন্য সন্ন্যাস নয়, জোর ক'রে সন্ন্যাসী হ'তে চাইলেও তাদের ফিরে দাম্পত্য-জীবন গ্রহণ কত্তেই হবে, হয় আত্ম-কল্যাণের জন্য—নয় জীব-কল্যাণের জন্য। ব্যাপার এম্‌নি অদ্ভুত যে, শ্রীগৌরাঙ্গের ন্যায় কত গৃহী একে একে দুই বার দারপরিগ্রহ ক'রেও পরিশেষে ভার্য্যাপরিত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হন, আবার

শ্রীনিত্যানন্দের ন্যায় কত আজন্ম-সন্ন্যাসী অনায়াসে সন্ন্যাস ছেড়ে দার-পরিগ্রহ করেন, গৃহীর শান্ত জীবন যাপন করেন, সন্তান উৎপাদন করেন। যেদিন থেকে মানুষ সমাজবদ্ধ ভাবে বাস কত্তে শিখ্‌ল, সেই দিন থেকেই সংসার ও সন্ন্যাস এই দুইটী অবস্থার মধ্য দিয়ে তার জীবন বিকশিত হচ্ছে। সমাজ-সৃষ্টির আদি কাল থেকেই কতক লোক সনক, সুনন্দন, শুকদেবের মত চিরসন্ন্যাসী, কতকলোক গৃহী। আজ অবশ্য সন্ন্যাসীকে সংসারীরা তাদের কষ্টার্জ্জিত অন্নের উপর ভাগ বসাতে দেখে গাল দিচ্ছে, সংসারীদের জীবনে নীচ ভোগ-লোলুপতা ও কামপঙ্কি-লতা দেখে সন্ন্যাসীরা আবার প্রাণ খুলে তাদের নিন্দা কচ্ছে,—যেন কবির লড়াই; কিন্তু বুঝ্‌তে গেলে, সংসার ও সন্ন্যাস দুটো প্রতিদ্বন্দ্বী আশ্রম নয়। এক আশ্রম সত্যি সত্যিই অপর আশ্রমের দ্বারা উপকৃত হচ্ছে এবং উভয়েরই কল্যাণের জন্য উভয়ের অস্তিত্ব প্রয়োজন। এই জন্যই শত যুক্তি বিস্তার ক'রেও সংসারীরা সন্ন্যাসের বিলোপ সাধন কত্তে পার্ব্বেন না, আর, শত মোক্ষের লোভ দেখিয়েও সন্ন্যাসীরা সকল মানব-মানবীকে নিজের দলে ভিড়াতে পার্ব্বেন না।

আদর্শ ও অভিমত
পঞ্চম তরঙ্গ, (১৩৩২)

সংসারী ও সন্ন্যাসী

প্রশ্নকর্ত্তা।—মহাশয়, সংসার কি ?

শ্রীশ্রীবাবা।—নিজ লক্ষ্য থেকে স'রে পড়ার নামই সংসার। আর, একটী লক্ষ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে ন্যস্ত করার নামই সন্ন্যাস। সৃ ধাতুর মানে চলা, বিচরণ করা, বিচলিত হওয়া। নিয়তই যার লক্ষ্য-ভ্রষ্টতা হচ্ছে, তাকে বলা যায় সংসারী। যিনি একটী লক্ষ্যকে নিয়ে মরণ পণ ক'রে মাটী কাম্‌ড়ে প'ড়ে আছেন, কিছুতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছেন না, কিছুতেই বিচলিত হচ্ছেন না, তিনিই সন্ন্যাসী।

বিবাহ করা ও সংসারী

প্রশ্ন।—তাহ'লে বিয়ে করাকে সংসারী করা বলে কেন।

শ্রীশ্রীবাবা।—তারও কারণ রয়েছে। বিয়ে করলে মানুষটীর স্বাধীনতা কমে যায়। পরিবার প্রতিপালন অবশ্য কর্ত্তব্য ব'লে একদিকে যেমন দৈহিক স্বাধীনতা

খাটো হয়, আবার স্ত্রীটীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, অনুরাগ-বিরাগ প্রভৃতিকে উপলক্ষ্য ক'রে মানসিক স্বাধীনতাও অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়। তারপর, পুত্রকন্যারূপী ভজনবাদীরা আছেন। কারো নেংট কোমরে কাপড় চাই, কারো মাসে মাসে স্কুলের মাইনে চাই, নিত্যনূতন পুঁথি-কেতাব চাই, ফুটবল ক্লাবের চাঁদা চাই, আর দু'চার দিন পরে পরে ডাক্তারের দর্শনী আর ঔষধের দাম ত' চাই-ই চাই। এর উপরে আবার শত দুশ্চিন্তা। কোন্‌টা খেল্‌তে খেল্‌তে জামায় আগুন লেগে পুড়ে মর্‌ল, কোন্‌টা কুসঙ্গে মিশে গোল্লায় গেল, কোন্‌টা চোর-ডাকাতের দলে ঢুক্‌ল, এসব নানা দুশ্চিন্তা তাঁকে জোঁকের মত ধ'রে ব'সে আছে, আর, মজা মে'রে রক্ত খাচ্ছে। এত সব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কটা লোক মাথা ঠিক্ রাখতে পারে ? এই জন্যেই বিবাহ করাকে সংসারী বলে। কিন্তু বিয়ে ক'রেও যাঁরা জীবনের পরম লক্ষ্যটীকে ভোলেন নি, বিবাহিত জীবনেরও প্রত্যেকটী চিন্তাচেষ্টাকে যাঁরা ঐ লক্ষ্য লাভেই প্রয়োগ কচ্ছেন, তাঁদের সংসারী বলা চলে না।

কে বড়,—সন্ন্যাসী, না সংসারী ?

প্রশ্ন।—সন্ন্যাসীরা বড়, না, গৃহীরা বড় ?

শ্রীশ্রীবাবা।—কোনো কোনো সন্ন্যাসীর চাইতে কোনো কোনো গৃহী বড়, আবার কোনো কোনো গৃহীর চাইতে কোনো কোনো সন্ন্যাসী বড়। সন্ন্যাস নিলেই কেউ বড় হয় না, আবার গৃহী হ'লেই কেউ ছোট হ'য়ে যায় না। দেখ্‌তে হবে, যাঁর যাঁর আশ্রমোচিত কর্ত্তব্য তিনি খাঁটি খাঁটি ক'রে যাচ্ছেন কি না। যেখানে প্রবল বাধা আছে ব'লে সব কর্ত্তব্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না, সেখানে দেখতে হবে যে, কর্ত্তব্য-পালনের চেষ্টায় সবখানি প্রাণ রয়েছে কি না। যিনি নিজের আশ্রমোচিত কর্ত্তব্য ষোল আনা কত্তে পাচ্ছেন, অথবা ক'রে উঠ্‌তে না পার্‌লেও ষোল আনা চিত্তটা নিজ কর্ত্তব্যেই লাগিয়ে রেখেছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। যে সন্ন্যাসী নিজ কর্ত্তব্য করেন না বা কর্ব্বার জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় লেগে থাকেন না, তিনি গৃহীর চাইতে নিকৃষ্ট। যে গৃহী ঐ রকম ক'রেই গার্হস্থ্য কর্ত্তব্যটাকে ফাঁকী দিয়ে এড়িয়ে যেতে চান, তিনি সন্ন্যাসীর চাইতে নিকৃষ্ট।

সংসার ও সন্ন্যাসে সহযোগিতা

প্রশ্ন।—একজন শ্রেষ্ঠ গৃহী ও একজন শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ?

শ্রীশ্রীবাবা।—দুইজন প্রতিবেশী স্বাধীন রাজা যদি পরস্পরের মধ্যে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ থাকেন যে, একজনের বিপদে অপরে এসে সৈন্য দিয়ে সাহায্য কর্ব্বেন, তাহ'লে তাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ আর কে নিকৃষ্ট বল দেখি ?

প্রশ্নকর্ত্তা।—দুজনেই সমান, কারণ উভয়েই যে স্বাধীন।

শ্রীশ্রীবাবা।—ঠিক্ ঠিক্ স্বাধীন নন। তবে, এক হিসাবে স্বাধীন। এক জনের সাহায্য না নিয়েও আর এক জনের কষ্টে সৃষ্টে কায়ক্লেশে চ'লে যেতে পারে। কিন্তু শত্রুর উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষা ক'রে আকস্মিক বিপদ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে ভালভাবে থাকতে হ'লে প্রতিবেশী রাজার সহযোগিতা আবশ্যক হয়ই। এই সহযোগিতাটাও একপ্রকারের অধীনতা। তবে, স্বেচ্ছায় সহযোগিতা স্বীকার করা হচ্ছে ব'লে এবং এই সহযোগিতা দুই পক্ষেরই সমান প্রয়োজন ব'লে ওটাকে আমরা অধীনতা সংজ্ঞা দেই না। সন্ন্যাসী আর সংসারীও ঠিক্ এই রকমেরই স্বাধীন। সন্ন্যাসীরা যদি বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্ব্বতে প'ড়ে থাকেন, তা হ'লে সংসারীদের সহায়তা ছাড়া তাদের বেশ চলে। হিমালয়ে যে লক্ষ লক্ষ মহাত্মারা তপস্যা কচ্ছেন, সংসারীদের সম্পর্ক ছাড়াও তাঁদের আটকাচ্ছে না। আবার সন্ন্যাসীদের ছাড়াও গৃহীদের চলে। চখের উপরেই দেখ্তে পাবে, কত পরিবারে সন্ন্যাসীর তিলমাত্র প্রভাবটুকুও নেই। সিদ্ধ সন্ন্যাসীর জ্ঞানোদ্ভাসিত জীবনের জ্যোত ত' দূরের কথা, ক্ষীণরশ্মিটুকু সেখানে প্রবেশ-পথ পাচ্ছে না। কিন্তু এই অন্ধকারেই এরা বিড়ালের চোখ দিয়ে পথ দেখে নিচ্ছে। সংসারী ও সন্ন্যাসী এই রকমের স্বাধীন। কিন্তু সন্ন্যাসী যদি এসে সংসারীকে বিপদের সময়ে সহযোগিতা দেয়, সংসারী যদি আবার সন্ন্যাসীকে প্রয়োজনের সময়ে সহায়তা করে, তাহ'লে দুজনেরই কাজের সুবিধা বেড়ে যায়। এইটুকু বুঝে যদি গৃহী সন্ন্যাসীকে আর সন্ন্যাসী গৃহীকে সহায়তা দিতে কৃপণতা না করেন, তা হ'লে উভয়েই সমান। আর যদি, একজন সহায়তা কম দেন কিন্তু নেবার বেলা বেশী নেন, তবে তিনি নিকৃষ্ট।

স্ত্রীলোকের সন্ন্যাস

প্রশ্ন উঠিল,—স্ত্রীলোকেরাও সন্ন্যাসী হইতে পারেন কি না।

শ্রীশ্রীবাবা।—অবাধে পারেন। স্ত্রীজাতি আর পুরুষজাতিতে মনুষ্যত্বের পার্থক্যটা কোথায়? মানুষ হিসাবে ত' দুজনেই সমান! মানুষ হিসাবে জগতে যা-কিছু প্রাপ্য আছে বা জগৎকে যা-কিছু দেবার রয়েছে, স্ত্রীই হউন আর পুরুষই হউন. সবটুকু আদায় করার ও সবটুকু দান করার অধিকার প্রত্যেকের আছে। সন্ন্যাস সর্ব্বত্যাগের একটা আদর্শ, সর্ব্বস্ব-সমর্পণের একটা অবস্থা। এ আদর্শ ও অবস্থা মানুষেরই জন্য, স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকে এ'র অধিকারী। আর, জগৎকে আমরা দিতেই বা পারি কি? আমাদের চিত্ত দিতে পারি, মন দিতে পারি, বুদ্ধি দিতে পারি, হৃদয় দিতে পারি, আত্মা দিতে পারি, দেহ দিতে পারি,—এখন আমি স্ত্রীই হই, আর পুরুষই হই। তবে, সে দানটুকু কত্তে হবে, মানুষ হিসাবে, স্ত্রী বা পুরুষ হিসাবে নয়। আমার দেহটাকে আমি মানুষ হিসাবে দিতে গেলে সেই দানটার যে ভঙ্গী হবে আর ফল হবে, স্ত্রী বা পুরুষ হিসাবে দিতে গেলে তার ভঙ্গী আর ফল তা থেকে পৃথক্ হবে। স্ত্রীত্ব-ও পুংস্ত্ব-বোধ-শূন্য হ'য়ে একজন স্ত্রী আর একজন পুরুষ জগৎকে একই জিনিষ দিতে পারেন, জগতের কাছ থেকে একই জিনিষ নিতে পারেন। কিন্তু স্ত্রীত্ব-বোধ ও পুংস্ত্ব-বোধ নিয়ে স্ত্রী-পুরুষ একই জিনিষ দিতেও পারেন না, নিতেও পারেন না। এই জন্যই অনেক-গুলি ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষের অধিকারের তারতম্য চিরকালই থাক্‌বে। কিন্তু সন্ন্যাস জিনিষটা জাতিলিঙ্গের অতীত। স্ত্রী-পুরুষ, দ্বিজ-শূদ্র, হিন্দু-অহিন্দু, কালা-ধলা সকলের এতে সমান অধিকার।

শঙ্করার্য্যের স্ত্রী-বিমুখতা

প্রশ্ন।—আচ্ছা, তা হ'লে শঙ্করাচার্য্য একটী স্ত্রীলোককেও দীক্ষা দেন নাই কেন?

শ্রীশ্রীবাবা।—সম্ভবতঃ দীক্ষাপ্রার্থিনী হয়ে কোনও মহিলা তাঁর কাছে যান নি। আর, যদিও কেউ গিয়ে থাকেন, হয়ত তিনি সন্ন্যাসের যোগ্যা ছিলেন না। আমার মনে হয় না যে, উভয়-ভারতীর মত যোগ্যা নারী সন্ন্যাস-প্রার্থিনী হ'লে

শুধু নারী ব'লেই শঙ্কর তাঁকে ফিরিয়ে দিতে পাত্তেন। নারী মাত্রকেই যে নিকৃষ্ট ব'লে মনে করে, সে কখনো মাতৃ-ভক্ত হ'তে পারে না। অথচ শঙ্কর ছিলেন অসাধারণ মাতৃ-ভক্ত। তাই শঙ্করকে স্ত্রীজাতি-বিদ্বেষী ব'লে গণনা করা ভ্রমই হবে। মণ্ডন-মিশ্রের সঙ্গে আচার্য্য শঙ্করের যে বিচার, তার কাহিনীটুকুতে পরিশেষে আমরা উভয়-ভারতীর অন্তর্ধান দেখ্‌তে পাই। এ অন্তর্ধান যে সন্ন্যাস নয়, তা কে বল্‌বে? বুদ্ধদেবের জীবনে দেখ্‌তে পাই, তিনি স্ত্রীলোককে সন্ন্যাস দেবার বিরুদ্ধে ছিলেন। এই বিরুদ্ধতা স্ত্রীজাতির প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ নয়। স্ত্রীজাতির সন্ন্যাসে যোগ্যতা নাই, এমন মতও তাঁর ছিল না। কিন্তু স্ত্রীজাতিকে সন্ন্যাসের অধিকার দিলে তাতে যদি বৌদ্ধ সঙ্ঘে কোনও প্রকার দুর্ব্বলতা প্রবেশ করে, শুধু এই আশঙ্কাটী তাঁর ছিল। তাঁর এই আশঙ্কা স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধার অভাব বশতঃ নয়, পুরুষ ও নারী উভয়েরই স্বাভাবিক জৈব প্রকৃতির মূর্ত্তিটা তিনি চিনতেন ব'লেই এ আশঙ্কাটুকু করেছিলেন। তাই তাঁর পিসীমা আর্য্যা গৌতমী যখন এসে বল্লেন,—"ভগবান্ স্ত্রীজাতিকে ভিক্ষু-বৃত্তি গ্রহণের অনুমতি দিন," তখন বুদ্ধদেব সে প্রার্থনায় অনুমোদন করেন নি। কিন্তু আর্য্যা গৌতমীর আগ্রহ দেখে, আর শিষ্য আনন্দের পরামর্শে তিনি শেষটায় নারী জাতির সন্ন্যাসের অনুমতি দিয়েছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য স্ত্রীমুখ দর্শন কত্তেন না, তাঁর প্রধান শিষ্যেরাও এই ভাবে কঠোর ব্রত পালন ক'রে চল্‌তেন, কিন্তু সেই মহাপ্রভুই কি আবার বাজারের বেশ্যাকে চির-সন্ন্যাসিনী ক'রে দেন নি? নারীকে নরকের দ্বার ব'লে শঙ্করই শ্লোক লিখেছেন বটে, কিন্তু সেই শ্লোক পুরুষদের জন্য,— সাধারণ পুরুষ, যারা স্ত্রী-পুরুষের ভেদ-জ্ঞানটাকেই একমাত্র ধ্যেয় বস্তু ক'রে রেখেছে, রিপুর তাড়নায় যারা নিয়ত চঞ্চল, তেমন অধঃপতিত দুর্ব্বল পুরুষের জন্য। তাঁর যদি কোনও স্ত্রী-শিষ্য থাক্‌ত, তবে তার জন্য তিনি হয় ত আবার উল্টো শ্লোক রচনা কত্তেন যে, পুরুষরা প্রলোভনের অবতার স্বরূপ, তাদের বিষধর ভুজঙ্গের মত ভয় করে চল্‌বে।

সন্ন্যাসিনীদের আবির্ভাব

প্রশ্ন।—আজকাল সন্ন্যাসীর সংখ্যা আগের চেয়ে ঢের বেশী দেখা যায়। আগে

দুই চারি মুল্লুক ঘু'রে এলে দু-একখানা গেরুয়া চোখে পড়্ত। আচ্ছা, এক সময়ে কি সন্ন্যাসীনীদেরও এরূপ সংখ্যাধিক্য ঘটবে ?

শ্রীশ্রীবাবা।—ততটা হবে না ব'লেই মনে হয়। কিন্তু দেশ মধ্যে একদল সন্ন্যাস-ব্রতধারিণী নারী প্রাণ জ্বালিয়ে দেশ, সমাজ ও ধর্ম্মের সেবার জন্য যে আবির্ভূত হবেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন।—কি লক্ষণ দেখে এই অনুমান কচ্ছেন ?

শ্রীশ্রীবাবা।—দেশের প্রয়োজন দেখে। যখন যে জিনিষটীর অভাব পড়ে, তখন তার তীব্র অভাব-বোধ থেকেই প্রতাকারের উৎপত্তি হয়। পুরুষ-জাতির অবনতি অনুসন্ধান ক'রে যদি কেউ কখনো এক ফোঁটা চখের জল ফেলে থাকেন, তবে আমি বলি, স্ত্রীজাতির অবনতির পরিমাণ বুঝ্লে কাঁদ্তে কাঁদ্তে তার চক্ষু অন্ধ হ'য়ে যাবে। কারণ, স্ত্রীজাতি নিজের দুর্ব্বলতার ফলে যতটা অবনত হয়েছেন, তা ত' হয়েছেনই, তার উপরে অবনত পুরুষ-জাতি আবার তাঁদের আরও অধঃ-পতিত হ'তে বহুকাল থেকে বাধ্য করে আস্ছে। আজ নারীর চেতনা ফিরিয়ে আন্বার প্রয়োজনে তার জন্য সুশিক্ষা চাই। চিরকাল অন্ধকারে বাস ক'রে যে অন্ধতা তার চোখে জন্মেছে, তাকে দূর করার জন্য এখন আলো চাই। আমরা পুরু-যের জাত যত পণ্ডিতই হই না কেন, স্ত্রীজাতিকে ঠিক্ ঠিক্ গ'ড়ে তোলা আমাদের কর্ম্ম নয়। সায়েব ডিরোজিও যেমন মাইকেল মধুসূদনকে বাঙ্গালী ক'রে গড়্তে পারেননি, বিদেশী শিক্ষা যেমন আমাদের জীবনকে জাতীয় পুষ্টির অনুকূল ক'রে গড়্তে পাচ্ছে না, ঠিক্ তেমনি পুরুষ গুরু-মশাইরা নারীকে তার প্রকৃত কেন্দ্রে দাঁড় করিয়ে, তার নিজস্বতায় দৃঢ় রেখে শিক্ষা দিতে পারেন না। কারণ, নারীর যে জীবনের কেন্দ্রটা কোথায়, তা নারীরাই ঠিক্ ঠিক্ ভাবে অনুভূতি-সিদ্ধরূপে জানেন। আমরা হয় ত শুনে টুনে অনুমান মাত্র কত্তে পারি। কিন্তু শিক্ষাদান অনুমতির কাজ নয়, ওটা অনুভূতির কাজ। তারপর আরো এক কথা,—আজ পর্য্যন্ত স্ত্রীজাতিতে আর পুরুষজাতিতে সম্বন্ধটা বড় নীচ ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। পুরুষেরা ভোগাধিকারী বিলাস-প্রভু, নারীরা তাদের লালসার দাসী, ইন্দ্রিয়বৃত্তির তৃপ্তিদায়িকা সেবিকা! পুরুষেরা নিজ নিজ রুচির মাপে নারীকে

সুখ-সম্ভোগের উপকরণ স্বরূপে ব্যবহার কচ্ছে, একটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে বা একটা অধর্ম্মের বিরুদ্ধেও ক্ষীণ প্রতিবাদটুকু করার তার উপায় নেই! এ' ত', মানুষে মানুষে সম্বন্ধ নয়! এ যে পশুতে আর পশুস্বভাব পশুপালকে সম্বন্ধ! তাই, নারীর শিক্ষা পুরুষের হাতে পড়্‌লে পুরুষ অজ্ঞাতসারেও নিজের পাতে ঝোল টান্‌তে পারে। এই জন্যই নারীদের মধ্যে শিক্ষা, সদাচার ও সদ্ধর্ম্ম প্রসারের জন্য একদল সন্ন্যাসিনী কর্ম্মীর আবির্ভাবের প্রয়োজনই পড়েছে।

ভবিষ্যৎ সন্ন্যাসীদের আবির্ভাব ও বাল-বিধবা-সমাজ

প্রশ্ন।—এই সকল সন্ন্যাসিনীরা কোথা থেকে recruited (সংগৃহীত) হবেন?

শ্রীশ্রীবাবা।—সংগৃহীত হবেন না, মাটি ফুটে বেরুবেন। ঐ যে দেখ্‌তে পাচ্ছ বিষণ্ণমুখী বাল-বিধবা, একদিকে সমাজ যাকে ব্রহ্মচর্য্যের অভিনয় কর্ব্বার জন্য জোর ক'রে হাত-পা বেঁধে রেখেছে, আর একদিকে সমাজ-সংস্কারক যাকে অগঠিত-জীবন যে কোনও একটা লোকের সাথে বিয়ে দিয়ে সুখী কত্তে চাচ্ছে, ঐ বিধবাদের মধ্য থেকে এই তেজস্বিনী সন্ন্যাসিনী-চমূর আবির্ভাব হবে। একদিকে যেমন তাঁরা সমাজের মুখে বাম চরণের আঘাত ক'রে বল্‌বেন,—"চাই না তোমার ভাঙ্গা ছাতার ছায়া, চল্‌লাম আমি সন্ন্যাসের সুবিস্তৃত চন্দ্রাতপতলে", তেমনি আবার সমাজ সংস্কারকদলের পিঠে হাত দিয়ে সান্ত্বনার স্বরে বল্‌বেন,—"তোমার দেওয়া বিয়ের সুখে কপালের পোড়া দাগটাত' আর মুছে যেত না, আর ভাগ্যটাও আমার বদ্‌লে যেত না, তাই আমি আমার বৈধব্যটাকে দেশ, সমাজ ও ধর্ম্মের সেবার একটা সুযোগরূপে ব্যবহার ক'রেই জীবনটাকে ধন্য কত্তে চাই।" এই ভাবে পুনর্ব্বিবাহে অনিচ্ছুকা নিঃসন্তানা বিধবাদের দিয়ে সমাজের সকল শ্রেণীর নারীদের শিক্ষার সুব্যবস্থা আপনি হবে।

কুমারীর সন্ন্যাস

প্রশ্ন।—চিরকুমারীদের দিয়ে এসব কাজ চল্‌তে পারে না?

শ্রীশ্রীবাবা।—খুব পারে। কিন্তু সমাজের একটা বিরাট অংশ যখন বৈধব্য-হেতু নিষ্কর্ম্মা হয়ে প'ড়ে আছে, তখন সেই অংশটাকে কাজে লাগাবার জন্যই সমাজ-মধ্যে অস্বস্তি-বোধ আগে হবে। বালিকারা বিয়ের পরে ইচ্ছা কর্ল্লেও যে

আর পবিত্র জীবন যাপন কত্তে পারেন না, অসংযমী স্বামীর উচ্ছৃঙ্খল কামেচ্ছাকে মান্‌তে গিয়ে প্রতি বৎসরই আতুর-ঘরে যেতে বাধ্য হন, সেই ব্যথাটাও সমাজের মনকে শীঘ্রই চঞ্চল ক'রে তুল্‌বে এবং তারই ফলে একদল প্রতিভাদীপ্তা নারী সন্ন্যাসকে সর্ব্বস্ব দিয়ে গ্রহণ কর্ব্বেন। কিন্তু, সে হচ্ছে একটু দেরীর কথা।

আদর্শ ও অভিমত
ষষ্ঠ তরঙ্গ ১৩৩২

ত্যাগের অর্থ

প্রশ্নকর্ত্তা। কোনও এক সন্ন্যাসী মহাত্মার উপদেশ শুনিয়া আসিয়াছেন যে, ত্যাগী সন্ন্যাসীর কৃপা পাইয়া যে ব্যক্তি ত্যাগী সন্ন্যাসীই হইল না, সংসারীই রহিল, সে আবার কিসের কৃপা পাইয়াছে?

শ্রীশ্রীবাবা।—ত্যাগী বল্‌তে যে সন্ন্যাসীই বুঝতে হবে, তা নয়। ত্যাগী মানে স্বার্থত্যাগী। ত্যাগী গুরুর কৃপা পেয়ে স্বার্থপর শিষ্য স্বার্থত্যাগ কত্তে শিক্ষা করে,—কেউ বা ছোট-খাট স্বার্থত্যাগ ক'রে হাতে-খড়ি দেয়, কেউ বা সকল স্বার্থ ত্যাগ ক'রে একেবারে নিঃস্বম্বল হয়। কেউ বা সংসারে থেকেও পূর্ণ ত্যাগী হয়, কেউ বা সন্ন্যাসী হ'য়েও মাত্র অর্দ্ধত্যাগী থাকে। ত্যাগের সঙ্গে সংসার বা সন্ন্যাসের সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ঠ, ত্যাগীর চিত্তটার সঙ্গে সম্বন্ধ তার চাইতে ঘনিষ্ঠতর। স্বার্থপরের চিত্ত গৈরিকের আচ্ছাদনে আবৃত হ'য়েও ত্যাগ কত্তে সমর্থ হয় না।

প্রশ্নকর্ত্তা।—তিনি ত' বল্‌লেন, সন্ন্যাসী ছাড়া আর কারো মুক্তিতে অধিকার নেই।

শ্রীশ্রীবাবা।—হয়ত তিনি "সন্ন্যাসী" বল্‌তে কর্ম্মফল-ত্যাগীকেই লক্ষ্য ক'রে থাক্‌বেন।

প্রশ্নকর্ত্তা।—না, তা করেন নি। তিনি স্পষ্ট ক'রে বলেছেন,—ধর্ম্মলাভ কত্তে হ'লে অন্ততঃ শেষ সময় হ'লেও স্ত্রী-ত্যাগ ক'রে বেরুতে হবে। তাঁর যে-সব গৃহী গুরুভাই আছেন, তাঁদের উপরেই তাঁর বেশী বিরক্তি দেখ্‌লাম।

শ্রীশ্রীবাবা।—না হে, গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয়ের জন্যই মুক্তির পথ খোলা আছে, ধর্ম্ম কারো একচেটে জিনিষ নয়। ভিন্ন ভিন্ন কালে, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায়, ভিন্ন ভিন্ন

পাত্রে মোক্ষলাভের পন্থার বৈচিত্র্য হবেই। সবাইকে যাঁরা এক ছাঁচে ঢাল্‌তে চান্, তাঁরা জগতের বৈচিত্র্যের কথা ভুলে যান, তাই বিচারে বিভ্রম হয়, সিদ্ধান্তে ত্রুটী থাকে। গৃহী যখন সন্ন্যাসীকে অপদার্থ ব'লে নিন্দা করেন, আর সন্ন্যাসী যখন গৃহীকে অধম ব'লে গালি দেন, তখন জান্‌বে দুজনেরই ধর্ম্মবুদ্ধির চাইতে ধর্ম্মান্ধতাটা বেশী হয়েছে। পরমার্থ লাভ কত্তে হ'লে ইন্দ্রিয়-সুখের লিপ্সা ত্যাগ কত্তে হয়,—গৃহীকেও কত্তে হয়, সন্ন্যাসীকেও কত্তে হয়, স্ত্রীকেও কত্তে হয়, পুরুষকেও কত্তে হয়। শুধু "স্ত্রীত্যাগ" কথাটা বড়ই ছোট হয়ে যায়। "ভোগাকাঙ্ক্ষা-ত্যাগ" বলাই সঙ্গত। "ভোগাকাঙ্ক্ষা" যদি ত্যাগ না হয়, তা হ'লে বাড়ীঘর ছেড়ে পালালেই কি স্ত্রী-ত্যাগ করা হয় নাকি? মনে মনে যে পাপকে ধ্যান করে, সেও কি পাপী নয়?

সন্ন্যাসীর বিপদ

প্রশ্নকর্ত্তা।—কিন্তু বিবাহিত জীবনে প্রলোভন বেশী।

শ্রীশ্রীবাবা।—সন্ন্যাসীর বিপদ তার চেয়ে শতগুণ বেশী। বিবাহিতের ভোগার্থী মন একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাঁধা আছে, কিন্তু সন্ন্যাসী যদি ভোগার্থী হয়, তবে তার মন বিশ্বভুবন ঘু'রে বেড়ায়। কামদমনের সামর্থ্য নাই অথচ কৌমার্য্যকে ধ'রে বসে আছে, এমন সন্ন্যাসীর কি দুরবস্থার শেষ আছে? চিত্ত যার অশুদ্ধ, সে যদি জোর ক'রে সন্ন্যাসী হতে যায়, তবে সে তার মনের পাপে সমগ্র দেশ দগ্ধ করে। বল্‌তে পার, ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতন হ'ল কেন? যাকে তাকে ধ'রে এনে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের দল বাড়াতে গিয়েই বৌদ্ধ-ধর্ম্ম মৃত্যুদণ্ড বরণ ক'রে নিলেন।

সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্যের দায়িত্ব

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—সন্ন্যাস যদি তোমার আকাঙ্ক্ষিত হয়, তবে সন্ন্যাস-জীবনের যে কি দায়িত্ব আর কত বিপদ, সেইটী সর্ব্বদা মনে রেখে নিজেকে প্রস্তুত কত্তে থাক। রাবণ রাজা যেদিন সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে সীতা-হরণ করে-ছিলেন, সেদিন তিনি যে গৈরিকের শুধু অবমাননাই করেছিলেন, তা' নয়। সেদিন পরনারী-লোলুপ রাবণ গৈরিকের গায়ে বঞ্চনার সংস্কারও দুরপনীয় ক'রে লাগিয়ে গিয়েছিলেন। আজও সে ভণ্ডতার সংস্কার গৈরিককে পরিত্যাগ করে নি। ষড়রিপুলাঞ্ছিত বিলাস-সেবী সন্ন্যাসীরা সন্ন্যাসের মুখে যে চূণকালী মাখিয়ে

দিয়েছে, তা যদি মুছে ফেল্‌তে না পার, তবে জে'ন, তোমার সন্ন্যাসের আকাঙ্ক্ষাটা একটা নিতান্ত বাজে জিনিষ। সংসার বা সন্ন্যাস, এ দুটোর যে কোনো একটা গ্রহণের স্বাধীনতা তোমার রয়েছে। কিন্তু যেদিন কোনো একটাকে গ্রহণ কর্ব্বে, সেদিন তোমাকে কেমন-ধারা যে চল্‌তে হবে, সেইটা পূর্ব্বাহ্ণেই ভেবে বুঝে দেখ্‌তে হবে। সন্ন্যাসের বাধা-বিঘ্ন-বিপত্তিগুলিকে যেমন ভেবে দেখ্‌তে হবে, তেমনি আবার সংসারের দায়িত্বকেও হিসাব ক'রে বুঝে নিতে হবে।

সন্ন্যাসী ও গৃহীর প্রভাব-ক্ষেত্র

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবা সন্ন্যাসী ও গৃহীর প্রভাব-ক্ষেত্রের পার্থক্যের কথা বলিলেন,—গৃহীর কর্ম্ম-ক্ষেত্র এবং তার সাধনার প্রভাব সাধারণত নিজ পরিবারবর্গের দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সন্ন্যাসীর কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃততর, তাই তার সাধনার প্রভাব একটু বেশী স্থান নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। গৃহীর সাধনার effect intensive, আর সন্ন্যাসীর সাধনার effect extensive. পুরুষানুক্রমিক ভাবে একটা সাধনার অনুশীলন হওয়া সম্ভব ব'লে গৃহীর সাধনা সন্তান-সন্ততির মর্ম্মে মর্ম্মে জড়িয়ে থাকে—in the form of accumulated energy, সন্তানের ধারা বেয়েই তা বাড়্‌তে থাকে। তাই বংশের মূলগত কল্যাণটা গৃহীর হাতেই রয়েছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মন ভিন্ন ভিন্ন সাধনার অনুশীলন ক'রে যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ সৃষ্টি কচ্ছে, সেই সকল বিরোধের সামঞ্জস্য স্থাপন ক'রে সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে একটা organismএ পরিণত করা সন্ন্যাসীর কাজ। এই জন্যই প্রায়শঃ সন্ন্যাসীরাই লোক-সমাজের গুরু। যে গৃহী সাধন-সঞ্জাত শক্তি আগামিগণের মধ্যে সংক্রামিত ক'রে যেতে পাচ্ছেন না, গৃহী হিসাবে তার জীবন ব্যর্থ। যে সন্ন্যাসী শত মত-বিরোধকে সামঞ্জস্যে এনে জীব-সমাজকে নির্ব্বিরোধ জীব-কল্যাণে প্রেরণা দিতে পাচ্ছেন না, সন্ন্যাসী হিসাবে তার জীবন অসার্থক।

সংসারী ও সন্ন্যাসীর কলহ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এই সোজা কথাটা না বুঝেই সন্ন্যাসীরা সংসারীকে আর সংসারীরা সন্ন্যাসীকে যার যা মনে এসেছে, তাই ব'লে গাল-মন্দ দিয়েছেন।

গৃহীরা সন্ন্যাসীকে দুমুঠো ভিক্ষা দিয়ে ভেবেছেন,—"বেটা সাধু শুধু নিজের মুক্তি চায়, আর আমাদের ঘাড় ভেঙ্গে মালপোয়া খায়,—এরা রক্তপিপাসু পরগাছা।" সন্ন্যাসীরা গৃহীর সঙ্কীর্ণতা দেখে ভেবেছেন,—"শুধু নিজের ছেলে, নিজের স্ত্রী, এই নিয়েই বদ্ধ হ'য়ে পড়ে আছে ঐ হতভাগারা, নরকে পচে যে মচ্ছে, সেই খেয়াল নেই।" গৃহী বলেছেন,—"সন্ন্যাসীরা স্ত্রী বর্জ্জন করেছে ত' বেশী কি একটা বাহাদুরী ক'রেছে? স্ত্রীসঙ্গ কর না, তা যেন মান্‌লুম, মনে মনে যে পাপ ভাব না, তার ঠিকানা কি?" সন্ন্যাসী বলেছেন,—"তুমি ত' তোমার গৃহি-জীবনের পরীক্ষিত সংযমের বড়াই ক'রে বড় লাফাচ্ছ, কিন্তু বাপু, তুমি পরীক্ষায় পাশ কি ফেল, সেকথা কে জানে?" গৃহী বলেছেন,—"ইন্দ্রিয়-বৃত্তিও একটা বৃত্তি, পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ কত্তে হ'লে তারও অনুশীলনের প্রয়োজন আছে; সন্ন্যাসীরা ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে চেপে মেরে ফেলে, এটা তাদের মহাপাপ,—তারা অপূর্ণ মানুষ।" সন্ন্যাসী ব'লেছেন,—"মহৎ সঙ্কল্পের পায়ে জগৎ-কল্যাণ কামনায় আত্ম-সমর্পণের নামই মনুষ্যত্ব। এই আত্ম-সমর্পণের পথে ইন্দ্রিয়-বৃত্তিই বৃহত্তম বিঘ্ন। গৃহীরা এই অনর্থ-মূল ইন্দ্রিয়-বৃত্তিতেই ম'জে থাকে এবং স্বহস্তে মনুষ্যত্বকে হত্যা করে, তারা অমানুষ হয়, পশু হয়।" গৃহীরা বলেছেন,—"সন্তানকে যে বুকে না ধ'রেছে, সে জগৎকে ভালবাস্‌বে কি ক'রে? জগৎ-প্রেমের কথা সবই ভুয়া, সন্ন্যাসীরা মূলতঃ স্বার্থপর ছাড়া আর কিছুই নয়।" সন্ন্যাসী বলেছেন,—"ঔরসজাত সন্তানের রক্ত-মাংসে তোমার স্বার্থবুদ্ধি আরো বেশী ক'রে জড়িয়ে রয়েছে, জগৎকে প্রতিনিয়ত সন্তানের কাছে বলি দিচ্ছ, তুমি ঘোরতর স্বার্থ-সুখী।" গৃহী ব'লেছেন,—জীবসৃষ্টি ঈশ্বরের অভিপ্রেত, সন্ন্যাসীরা বিধাতার বিদ্রোহী।" সন্ন্যাসী ব'লেছেন,—"জীবের পরমমোক্ষই বিধাতার অধিকতর অভিপ্রেত, কিন্তু গৃহীরা তা দেখ্‌তে পায় না, গৃহীরা অন্ধ জীব।" এই ভাবে অফুরন্ত যুক্তি-তর্ক পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হচ্ছে। সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা এবং অন্ধ গোঁড়ামি ছাড়া এসব কলহের আর কোনো মানে নেই। আসল কথার দিকে নজর ক'জনের থাকে? খাঁটী কথাটী হচ্ছে এই যে, গৃহী হও আর সন্ন্যাসী হও, যে যত বড় স্বার্থত্যাগী, সে ততবড় লোক।

সন্ন্যাসের পাত্র-নিরূপণ

প্রশ্ন।—কার সন্ন্যাসে আর কার গার্হস্থ্যে জগতের বেশী লাভ, একথা কি ক'রে বুঝা যাবে ?

শ্রীশ্রীবাবা।—সাধক গুরু সাধক শিষ্যের সকল কথা বুঝ্তে পারেন। তাছাড়া শিষ্য নিজেও সাধন-ভজন কত্তে কত্তে নিজের যোগ্যতা অযোগ্যতা ধর্তে পারেন। তপস্বী না হ'লে অন্যে ত' দূরের কথা, ছেলেমেয়ের মা-বাপেরও সাধ্য নাই যে, বুঝে ফেলে, কার কোন্ পথ গ্রহণীয়, কার কোন্ পথ পরিত্যজ্য। যত লোক সন্ন্যাস নেন, তাদের মধ্যে কারো কারো পক্ষে সন্ন্যাসটা একটা সহজাত ব্যাপার। কোনও প্রকার উপদেশ, উত্তেজনা, উৎসাহ বা আহ্বান ব্যতিরেকেই এঁরা শুকদেবের মত জন্মমাত্র বা সহজ জ্ঞানের উন্মেষ মাত্র সন্ন্যাসী হন। এঁদের নাম দিতে পারি, সহজ সন্ন্যাসী। আর এক দল আছেন, জগতের লোকের বিশেষ কোন দুঃখ দেখে সেই দুঃখ নিবারণের জন্য গার্হস্থ্য জীবনের সুখলোভ ত্যাগ ক'রে এঁরা বুদ্ধদেব বা বিবেকানন্দের মত সন্ন্যাসী হন। এঁদের নাম দিতে পারি, পরিত্রাতা সন্ন্যাসী। আর একদল আছেন যাঁরা সংসার-দুঃখ সইতে রাজি নন, তাই সন্ন্যাসী হন। এঁদের নাম দিতে পারি, আত্মত্রাতা সন্ন্যাসী। কার বংশে এঁদের মধ্যে যে কে এসে জন্মাবেন, তপস্বী না হ'লে গৃহী তা বুঝ্তে পারে না।

সন্ন্যাসীর সংখ্যাবৃদ্ধি

আদর্শ ও অভিমত
সপ্তম তরঙ্গ, ১৩৩২

প্রশ্নকর্ত্তা।—দেশে সন্ন্যাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া কি ভাল ?

শ্রীশ্রীবাবা।—অত্যন্ত বৃদ্ধি ত' ভাল নয়ই। কারণ তার আর্থিক ও নৈতিক এই দুই প্রকারেরই প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু যতদিন গৃহীর জীবন সুসংস্কৃত না হচ্ছে, ততদিন পর্য্যন্ত দুঃখভোগী জীবের তৃষিত নয়ন সন্ন্যাসের গৈরিক-রঞ্জিত পতাকার পানে তাকাবেই। সাধারণ মানব যখন দেখতে পায় যে, পারিবারিক জীবনের দায়িত্ব একবার স্বীকার কর্লে আর মাথা তুলে দাঁড়ান যায় না, ইচ্ছায়

হোক, অনিচ্ছায় হোক, একবার বিবাহের হাড়িকাঠে মাথা পেতে দিলে আর কোনও স্বাধীনতা থাকে না, তখন সে দুঃখমুক্তির জন্য নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসকে প্রার্থনা কর্ব্বেই। কিন্তু আজ যদি এমন ব্যবস্থা করা যায় যে, বিবাহ করার পরেও মাথা তুলে দাঁড়ান সম্ভবপর হয়, তাহ'লে নিশ্চিত জেনো, সন্ন্যাসীর সংখ্যা অতি দ্রুত হ্রাস পাবেই পাবে।

গৃহি-জী‌নের সংশোধন

প্রশ্নকর্ত্তা।—গৃহি ...ক সংশোধিত করার উপায় কি ?

শ্রীশ্রীবাবা।—ব্রহ্মচর্য্য, একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যই অবলম্বনীয়। আর কোন ও পন্থা নাই। ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে নরনারী উচ্চভাব ধারণে অক্ষম হয়ে পড়ে। তাই তপস্যারও তপস্যা হচ্ছে—ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্যই সকল কল্যাণের বীজ, সকল উন্নতির উৎস। বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যাতে বর ও কন্যার মধ্যে বিন্দুমাত্র অপবিত্রতা প্রবেশ কত্তে না পারে, তেমন ব্যবস্থা কত্তে হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে দিতে হবে বিদ্যুন্ময়ী উচ্চচিন্তা। উচ্চচিন্তা ব্রহ্মচর্য্যের সহায় হবে, ব্রহ্মচর্য্য উচ্চচিন্তার সহায় হবে। এই ভাবে সুগঠিত জীবন নিয়ে যখন নরনারী বিবাহিত হবে, একমাত্র তখনই গার্হস্থ্যাশ্রমের কর্ত্তব্য সম্পাদন কত্তে তারা সহজে পার্ব্বে। কিন্তু এখানেই খতম্ নয়। গৃহীর জীবনের সকল সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়েও যাতে স্বামী ও স্ত্রীর আত্মিক মিলন অতি দ্রুত সাধিত হতে পারে, তার জন্য উভয়কে নিয়মিত সাধন চালাতে হবে। পরস্পরের রুচিপ্রকৃতির সাম্য-বিধান ক'রে সাধনযোগে উভয়ের মধ্যে আধ্যাত্মিক অভেদত্ব প্রতিষ্ঠিত কত্তে হবে। যখন ভোগলিপ্সা আধ্যাত্মিক ঐক্যের অন্তরায় হবে, তখন তাকে নির্ম্মমভাবে বর্জ্জন কত্তে হবে। তবেই গৃহীর জীবন হবে সুখের আগার, শান্তির নিকেতন। মোট কথা, ব্রহ্মচর্য্যই আজ সকল ব্যাধির মহৌষধ, ব্রহ্মচর্য্যই জরামরণহারী পরম-অভয়-প্রদ অমৃত।

ব্রহ্মচর্য্য প্রচারের পন্থা

প্রশ্নকর্ত্তা।—কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য প্রচারের পন্থা কি ?

শ্রীশ্রীবাবা।—"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখাও,"—এই হচ্ছে ব্রহ্মচর্য্য

প্রচারের প্রকৃষ্টতম পন্থা। যাঁরা নিজ জীবনকে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যের মহিমায় প্রদীপ্ত করেছেন, ব্রহ্মচর্য্য প্রচার তাঁদের কাজ। ব্রহ্মচর্য্যকে নিজ জীবনে সার্থক করার জন্য যাঁরা সর্ব্ব-সুখকামনায় পদাঘাত করেছেন, ব্রহ্মচর্য্য প্রচার তাঁদের কাজ। নিজ জীবনে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত ক'রে যাঁরা জগদ্ব্যাপী অসংযমের দুঃখ দেখে দয়ার্দ্র-হৃদয় হয়েছেন, ব্রহ্মচর্য্য প্রচার তাঁদের কাজ। তবে যাঁরা ব্রহ্মচর্য্যের অনুরাগী, কিন্তু সম্যক্ ব্রহ্মচর্য্যে সমর্থ নন, তাঁদেরও এখানে প্রচুর কর্ত্তব্য রয়েছে। তাঁরা দেশব্যাপী আনুকূল্য সৃষ্টি কর্ব্বেন। ভারতবর্ষকে যদি নবজাগ্রত জীবনের যৌবন-সম্ভার নিয়ে জগতের সমক্ষে স্পর্দ্ধাভরে দাঁড়াতে হয়, নিজের পৌরুষ-দৃপ্ত মহিমার হৈম সিংহাসনে পুনরায় রাজ-গৌরবে উপবেশন কত্তে হয়, তবে জেনো, এই ব্রহ্মচর্য্যের মহামন্ত্র তাকে অহর্নিশ জপ কত্তে হবে। যা কখনো হয় নি, হবে বলে কেউ কল্পনা পর্য্যন্ত কত্তে পাচ্ছে না, ব্রহ্মচর্য্যের শক্তিতে ভারতের ইতিহাসের বুকে তাই প্রতিষ্ঠিত হবে। ব্রহ্মচর্য্যের শক্তিতে দেশব্যাপী জাতিভেদের অসহনীয় বৈষম্য দূর হবে, নারীজাতির পরাধীনতার লৌহ-শৃঙ্খল চূর্ণ হবে, পশুর পশুত্ব ঘুচে যাবে, অমানুষেরা মানুষ হবে।

ব্রহ্মচর্য্য ও জাতিভেদ

প্রশ্নকর্ত্তা।—ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাবে জাতিভেদ দূর হবে কি ক'রে স্বামীজী?

শ্রীশ্রীবাবা।—তুমি বল্‌ছ শুধু জাতিভেদের কথা, আমি বলি সমাজের সকল কিছুর কথা। যত প্রকারের সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা আমাদের আছে, সকলের মূলে ব্রহ্মচর্য্যকে রাখ্‌তে হবে এবং এক ব্রহ্মচর্য্যের শক্তিতেই সমাজের সকল ছোট-বড় সমস্যার সমাধান হ'য়ে যাবে। বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারী বল্‌তেন,—"জাতি-ভেদ মানুষেই গড়েছিল, মানুষেই ভাঙ্গতে পারে, অমানুষে পারে না।" আগে মানুষ হও, দেখ্‌বে জাতিভেদ তোমার একটা নখের টোকায় ভেঙ্গে যাচ্ছে। আর, মানুষ যতদিন না হচ্ছ, ততদিন পর্য্যন্ত খালি চীৎকার ক'রে এতদিনের একটা বদ্ধ সংস্কার ভেঙ্গে ফেল্‌বে তুমি? জাতিভেদ এদেশের একটা সুপ্রতিষ্ঠিত সামাজিক সংস্কার, তাকে ভাঙ্গা যদি আবশ্যকই হয়ে থাকে, তবে জেনো, শক্ত লোকেই তা কত্তে পার্ব্বেন, সামান্য লোকের কাজ নয়। সেই শক্ত লোক ব্রহ্মচর্য্যের শক্তিতে

জন্মাবেন। সেই শক্ত লোক বীর্য্য-সাধনার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ কর্ব্বেন। যাঁদের পদভরে মেদিনী কাঁপে, যাঁদের নিঃশ্বাসে ঝঞ্ঝা চলে, তেমন বজ্রপুরুষেরা ব্রহ্মচর্য্যের শক্তিতে আবির্ভূত হবেন এবং শুধু জাতিভেদের দুঃখ কেন, আরো যত দুঃখ তোমাকে পীড়া দিচ্ছে, আরো যত বেদনা তোমার জীবনকে দুর্ব্বহ করেছে, সব তাঁদের সমর্থ বাহুর অব্যর্থ আঘাতে চূর্ণ ক'রে দেবেন। কারণ, ব্রহ্মচর্য্যের সব চাইতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হচ্ছে সৎসাহস।

স্ত্রী-স্বাধীনতা ও নারীজাতির নিজস্ব চেষ্টা

প্রশ্ন।—আপনি স্ত্রী-স্বাধীনতার কথাও বলেছেন। স্ত্রীজাতির কিরূপ স্বাধীনতা পাওয়া দরকার?

শ্রীশ্রীবাবা।—সে বিষয় আমরা পুরুষেরা ঠিক্ ঠিক্ বল্‌তে পারি না। মায়েরা নিজেরা মুখ ফুটে না বল্লে আমরা সম্পূর্ণরূপে বুঝে উঠ্‌তে পার্ব্ব না,—তাঁদের স্বাধীনতার স্বরূপ কি? এই বিষয়ে খুব বেশী মাথা না দিয়ে আমাদের উচিত সর্ব্বাগ্রে মায়ের জাতির ভিতরে ব্রহ্মচর্য্য-মূলক সৎশিক্ষার প্রচার করা। শিক্ষার গুণে তাঁরা নিজেদের প্রকৃত অবস্থা বুঝে নিজেদেরই স্বাধীন বুদ্ধির বলে অন্যায়ের প্রতীকার কত্তে পার্ব্বেন। তাঁরা যে অত্যাচারিতা হচ্ছেন, একথাটা আমরাও বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত তাঁরা নিজেরা নিজেদের দুরবস্থার প্রতীকারে চেষ্টা না কত্তে পাচ্ছেন, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের সদুদ্দেশ্যমূলক চেষ্টাও অনেক সময়ে অজ্ঞাতসারে দোষদুষ্ট থেকে যাবেই। কারণ, আমরা চাই চিরকাল স্ত্রীজাতির উপরে অভিভাবকত্ব কত্তে, নারীজাতি যে পুরুষজাতির সহযোগিনী মাত্র, এই কথাটা আমরা অনেক সময় অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ভুলে যাই। সুতরাং শিক্ষার গুণে যতদিন পর্য্যন্ত মায়ের জাতি নিজেদের ভালমন্দ নিজেরা না বুঝ্‌তে পাচ্ছেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁদের সম্বন্ধে সংস্কার কত্তে আমাদের পক্ষে হঠকারিতা যথাসম্ভব বর্জ্জন করাই উচিত। কিছুদিন আগে বিখ্যাত লালা লজপত রায় লাহোরে বিধবা-বিবাহের সমর্থন ক'রে এক বক্তৃতা দেন। লালাজী প্রসিদ্ধ বাগ্মী এবং পণ্ডিত লোক। তাঁর বক্তৃতায় সভাস্থলে প্রচুর উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এই সময়ে এক বিদুষী পাঞ্জাবী মহিলা বক্তৃতা দিতে দাঁড়ান। তিনি লালাজীর বড়

বড় যুক্তিগুলির এমন প্রবল প্রতিবাদ উপস্থিত কর্ল্লেন যে, শ্রোতাদের উৎসাহ একেবারে নিবে গেল। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বিধবা নারীর দুঃখ দেখে যখন একজন অকপটচেতা মহাপ্রাণ পুরুষ বিধবার পুনর্বিবাহ দিয়ে সেই দুঃখের প্রতীকার কত্তে চাইলেন, সেই সময়ে এই বিদুষী কেন তাতে প্রতিবাদ কচ্ছেন? সেই মহিলা যদি অশিক্ষিতা হ'তেন, তবে বরং বল্‌তাম যে, কুসংস্কার। কিন্তু শিক্ষার গুণে কিছু কুসংস্কার তাঁর কেটে গেছে ব'লে মনে কত্তেও পারি। তবে তাঁর এই প্রতিবাদ কেন? আরও একটা দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছি। এই বাংলা দেশেরই এক অতি বিখ্যাত ব্যক্তি তাঁর বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন,—কন্যার একান্ত অমতে। এই কন্যাই বা পুনর্ব্বিবাহের পক্ষে শারীরিক, আর্থিক ও সামাজিক সর্ব্বপ্রকার আনুকূল্য স্বত্বেও অসম্মত ছিলেন কেন? এই দুটো "কেন"র ঠিক্ ঠিক্ জবাব বোধ হয় নারীরা ছাড়া আর কেউ দিতে পার্ব্বেন না। আমার মনে হয়, বৈধব্যের দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও কোনো কোনো নারী এমন একটা গৌরবের জিনিষ পান, যা' সমাজ-সংস্কারকদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।

বিধবা-বিবাহের আবশ্যকতা

প্রশ্নকর্ত্তা।—বিধবার পুনর্ব্বিবাহ সম্বন্ধে আপনার খাঁটি খাঁটি মত কি?

শ্রীশ্রীবাবা।—পক্ষে ও বিপক্ষে দুই দিকেই। শিশু-বিবাহ ও বাল্য-বিবাহের প্রচলন যতদিন না উঠে যাচ্ছে, ততদিন পর্য্যন্ত বাল-বিধবার পুনর্ব্বিবাহ না হ'লে অনেক স্থলে জাতির নৈতিক অবনতি অবশ্যম্ভাবী। একটা পাপিষ্ঠা বিধবা সমাজের যা ক্ষতি গুপ্তভাবে কত্তে পারে, একটা লম্পট যুবক প্রকাশ্য ব্যভিচারেও ততখানি অনিষ্ট কত্তে পারে না। ঘরে ঘরে গুপ্ত গণিকাবৃত্তি, ঘরে ঘরে ভ্রূণহত্যা, এসব মহা-পাপ হ'তে দেওয়ার চাইতে বিধবার পুনর্বিবাহ অনেক অধিক অনুমোদনযোগ্য। তবে, যদি বাল্য-বিবাহের নিরোধ করা যায় এবং সংযমানুকূল স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপক প্রচার করা যায়, তাহ'লে বিধবা-বিবাহের প্রয়োজন যে প্রায় থাকবে না, একথা দৃঢ়রূপেই বলা চলে। সমাজকে নরক-নিমজ্জন থেকে রক্ষার জন্য বিধবা-বিবাহ যেখানে প্রয়োজন, সেখানে কোনও প্রকার কুণ্ঠা রাখ্‌লে চল্‌বে না। কিন্তু অপর সম্প্রদায়ের লোক-সংখ্যার তুলনায় হিন্দু সমাজের লোক-সংখ্যা ক'মে যাবার

যুক্তিতে বিধবা-বিবাহ সমর্থন করাটাকে আমি একটা ছেলেমানুষী মাত্র মনে করি।

বাল্য-বিবাহ-নিরোধ

প্রশ্নকর্ত্তা।—বাল্যবিবাহ-নিরোধের উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবা।—এক্ষেত্রেও উপায় ব্রহ্মচর্য্যের আন্দোলন। ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা যারা বোঝে না, তারাই অল্প বয়সে ছেলেমেয়ের বিয়ে দেয়। এমন এক সর্ব্বব্যাপী বিশাল আন্দোলন সৃষ্টি কত্তে হবে, যেন, সমাজ-বৃক্ষের গভীরতম শিকড়টীও সাড়া পায়। এমন এক প্রদীপ্ত মশাল জ্বালাতে হবে, যেন, পেচকের নিবাস-ভূমিতেও গিয়ে তার আলো পৌছে। ব্রহ্মচর্য্যের কথা ব'লে ব'লে ছেলে-বুড়ো সকলকে ক্ষেপিয়ে তুল্‌তে হবে। এমন প্রচার কত্তে হবে, যেন গৌরীদানকারী মূর্খের প্রাণ কন্যার আসন্ন বৈধব্যের ভয়ে দুরু-দুরু ক'রে কেঁপে ওঠে, যেন পুত্রের জননীর প্রাণে সন্তানের জন্য গভীর আতঙ্ক জেগে ওঠে। এমন প্রচার কত্তে হবে যেন, অল্প বয়সে বিবাহ দিতে গেলে পুত্রকন্যা পিতামাতার বিদ্রোহী হ'তে ভয় না পায়। *

প্রাগ্ বৈবাহিক ব্রহ্মচর্য্য

প্রশ্নকর্ত্তা।—কিন্তু স্বামীজী, এরূপ অবাধ্যতা শিক্ষা দিতে গেলে অভিভাবক সম্প্রদায় ব্রহ্মচর্য্য প্রচারকদের বিশেষ বিরুদ্ধতা কর্ব্বেন।

শ্রীশ্রীবাবা।—তাঁরা সাবধান হবেন, তাঁরা আত্মদোষ সংশোধন কর্ব্বেন, কি কল্লে বাল্য-বিবাহ না দিয়েও বাল্য-বিবাহের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যটুকু সাধন করা সম্ভব, তা তাঁরা খুজে বে'র কর্ব্বেন। বাল্যবিবাহকে আমাদের সমাজের সর্ব্বাঙ্গ-ব্যাপী লাম্পট্যের একটা লক্ষণ ব'লে প্রচার কল্লেই খাঁটি সত্য কথা বলা হয় না। স্বামি-পত্নীর মধ্যে অভেদ-সত্ত্বার প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই বাল্যবিবাহের গোড়ার কথা। আর তারপরেই হচ্ছে, অবিবাহিত অবস্থাতে যাতে অবৈধ সম্ভোগাদি না ঘটে তৎকল্পে সতর্কতা। কারণ, স্বামি-পত্নীর অভেদ ভাব প্রতিষ্ঠিত না হ'লে

---

* ইহার পাঁচ বৎসর পরে শ্রীযুক্ত হরবিলাস সারদার চেষ্টায় বাল্যবিবাহ নিরোধক আইন হইয়াছে।

কখনো কারো দাম্পত্য জীবন সুখের হ'তে পারে না এবং অবিবাহিত অবস্থায় পুরুষ যদি নারী-সাহচর্য্যে বা নারী যদি পুরুষ-সাহচর্য্যে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সুযোগ গ্রহণ করে, তাহ'লে সমাজ-জীবন ধ্বংশ হ'তে কতক্ষণ? কিন্তু বাল্য-বিবাহ না হ'লেও যে স্বামিপত্নীর মানসিক ও আধ্যাত্মিক অভেদ-ভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ আছে এবং যৌবনের পূর্ণ বিকাশ পর্য্যন্তও যদি বিবাহিত না হয়, তবু যে যুবক ও যুবতীদের পূর্ণ পবিত্রতা রক্ষার উপায় আছে, একথা যে মুহূর্ত্তে অভিভাবক সম্প্রদায়কে বুঝান যাবে, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁরা বিনা বাক্যব্যয়ে নিজেদের বহু-সহস্র-বর্ষ-সঞ্চিত সুদৃঢ় সংস্কার স্বেচ্ছায় বর্জ্জন কর্ব্বেন। তাঁদের যাতে প্রকৃত সত্যের প্রতি দৃষ্টি চালিত হয়, তারই জন্য অনেক স্থলে বিনয়ী, শিষ্ট ও নম্র ছেলে-মেয়েদের মধ্যেও অবাধ্যতার আবশ্যকতা পড়্বে। এতে ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারকদের প্রতি তাঁদের যদি বিরুদ্ধতাও আসে, তবে তাতে উপেক্ষা কত্তে হবে। সত্যের আন্দোলন নিয়ে সত্য-সঙ্কল্প হ'য়ে দাঁড়ালে কারো বিরুদ্ধতায় কিছু আসে যায় না। সত্যমেব জয়তি, নানৃতম্। তোমরা ত' আর ছেলেদের বল্বে না যে সবাই গেরুয়া প'রে সন্ন্যাসী হোক্! সন্ন্যাস-প্রচার কিছুতেই তোমাদের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম-সংস্কার হেতু বা এজন্মেরই কোনো বিশিষ্ট তপস্যার ফলে যাঁরা সন্ন্যাসের প্রতি আকৃষ্ট হবেন, তাঁরা নিজেরাই এসে তোমাদের দলে ভিড়্বেন, তার জন্য গৃহীদের বাড়ীতে গিয়ে জাল ফেল্তে হবে না। ব্রহ্মচর্য্য প্রচারই তোমাদের উদ্দেশ্য। অধিকাংশ মানব-মানবীই গার্হস্থ্য জীবন যাপন করেন, সুতরাং ব্রহ্মচর্য্যের ভিত্তিতে গার্হস্থ্যকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে সকল ক্লেদপঙ্ক থেকে তাকে মুক্ত করাই তোমার উদ্দেশ্য। সন্ন্যাসি গঠন তোমাদের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না, কারণ, সন্ন্যাসী কেউ গড়্তে পারে না, যার যার পূর্ব্বজীবনের কর্ম্ম-সংস্কারের আকর্ষণে মানুষ আপনি সন্ন্যাসী হয়। তোমরা শুধু শেখাবে,—"হে ঋষির বংশধর, বীর্য্যধারণ কর, বীর্য্যবান্ হও, সামর্থ্য সঞ্চয় কর, মনুষ্যত্ব লাভ কর।" তোমরা তাদের বুঝিয়ে দেবে, পবিত্র জীবনের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, পবিত্রতা প্রার্থনীয় কেন। বিবাহ সম্বন্ধীয় চিন্তা জীবনের পবিত্রতাকে বিধ্বস্ত ক'রে দিতে চায় ব'লে তাদের মনে "চব্বিশ" এই অঙ্কটী গভীর ভাবে অঙ্কিত ক'রে দিতে হবে। চব্বিশ বৎসরের পূর্ব্বে কোনও পুরুষ বিবাহিত

জীবনকে স্বীকার কর্ব্বে না, চব্বিশ বৎসর বয়স পূর্ণ না হ'তে কোনও পুরুষ নিজেকে বিবাহ-যোগ্য ব'লে বিশ্বাস কর্ব্বে না। এই জন্য সকলকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কত্তে হবে এবং এই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য তাদের উৎসাহকে নানা সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সতেজ রাখ্‌তে হবে। "চব্বিশ বৎসর" কথাটা মনে অঙ্কিত কর্ব্বার চেষ্টা করলে সেই ছেলের বিবাহ কিছুতেই বিশ বাইশের আগে হওয়া সম্ভব হবে না। ছেলেরা সকল বিষয়ে পিতামাতার বাধ্য থাকুক কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের বিরুদ্ধে নয়।

আদর্শ ও অভিমত
অষ্টম তরঙ্গ, ১৩৩২

সন্ন্যাসিনী-সমাজ ও নারী-জাগরণ

সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে অনেকক্ষণ আলোচনার পরে প্রশ্নকর্ত্তার জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আমরা নিজেরা পুরুষ ব'লে পুরুষদের সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা বেশী হ'য়ে থাকে। এটা পুরুষদের পক্ষে কতকটা স্বাভাবিক, কতকটা স্ত্রীজাতির প্রতি উপেক্ষামূলক। তবে, একথা বল্‌তে পারি, নারীরা যেদিন দলে দলে সমাজ-কল্যাণের পথে আগুয়ান্ হবেন, সেদিন আমরা চেষ্টা ক'রেও আর তাদের প্রতি উপেক্ষা-পরায়ণ থাক্‌তে পার্ব্ব না। নারীদের আজ জেগে ওঠবার প্রকৃতই বড় বিষম প্রয়োজন পড়েছে। তাঁদের মধ্যে দশপ্রহরণধারিণী মা-দুর্গার ভৈরবী মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশের আজ বড় প্রয়োজন হয়েছে। তাঁদের মধ্যে সন্ন্যাস-ব্রতধারিণী পরার্থ-কারিণী তপস্বিনীদের আগে আবির্ভাব হোক্। কবি যে বলেছেন,—"না জাগিলে যত ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগে না, জাগে না"—সে কথা বিন্দুমাত্রও অতিরঞ্জিত নয়। শিক্ষা-দীক্ষা ছড়িয়ে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিলিয়ে, মনুষ্যত্বের উদ্দীপনা জ্বালিয়ে তাঁরা আজ ভারতবর্ষের নিদ্রানিমগ্না নারী-শক্তিকে জাগিয়ে তুলুন, অবলাকে শৌর্য্য-বীর্য্য-শালিনী করুন, রমণীকে জননীতে পরিণত করুন, তুচ্ছ-সুখ-প্রার্থিনীকে পরার্থ ও পরমার্থের দিকে আকৃষ্ট করুন। তাঁরা আজ কুমারীকে কৌমার্য্যের পূর্ণ মহিমা রক্ষার উপায় শিখিয়ে দিন, সধবাকে সতীত্ব-সাধনার প্রকৃত মর্ম্ম ও শ্রেষ্ঠ পন্থা দেখিয়ে দিন, বিধবাকে পরগলগ্রহ ব্যর্থ জীবন যাপন না ক'রে জীব-কল্যাণের জন্য যোগ্যতা সঞ্চয়ের উপদেশ দিন এবং

দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করুন। আমরা এসব সন্ন্যাসিনা মাদের আবির্ভাবের জন্য ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা কচ্ছি। তাঁরা এসে হাল না ধর্লে এ জীর্ণ-সমাজ-তরণী আমরা শুধু দাঁড়ের জোরে বেয়ে নিয়ে যেতে পার্ব কেন ?

স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে শিক্ষিত করার অন্তরায়

প্রশ্নকর্ত্তা।—বিবাহিত পুরুষেরা যদি নিজ নিজ স্ত্রীদিগকে শিক্ষিত কত্তে চেষ্টা করেন, তাহ'লে নারী-জাগরণ কতকটা হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীবাবা।—কিন্তু সম্যক্ সম্ভব নয়। কারণ, অধিকাংশ স্বামীই নিজেরা প্রয়োজনীয় বিষয়ে অশিক্ষিত। কেউ কেউ দু-পাতা পড়েছে সত্য, কিন্তু সংযম কাকে বলে, আত্মসম্মান কাকে বলে, স্ত্রীজাতির প্রতি মর্য্যাদা-বোধ কাকে বলে তা জানে না। দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে শিক্ষিত অশিক্ষিত কাউকে যে কথা শিখাতে হয় না, তারা শুধু সেইটুকুই জানে। অথবা সত্য ক'রে বলতে হ'লে তারা সেইটুকুও ঠিক্ ঠিক্ মত জানে না, কতকগুলি অর্দ্ধ সত্য ও বিকৃত সত্যের অংশ মাত্র অগঠিত-জীবন বন্ধুদের মুখ থেকে শুনে ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় অন্ধের মত চখ বুজে চলে। তারপর ত শিক্ষাদান বড় কঠিন কাজ। যে যাকে শ্রদ্ধা করে না, সে তাকে শিক্ষা দিতে পারে না। প্রকৃত গুরু শিষ্যকে নিজ গুরুর মত মনে ক'রে ভক্তির সহিত শিক্ষা দেন। আরো একটা বড় গোলযোগ হচ্ছে এই যে, যাঁরা কিছুটা শিক্ষিতা নন, তেমন স্ত্রীকে শিক্ষা দেবার মত ধৈর্য্য স্বামীদের প্রায় ক্ষেত্রেই থাকে না। পিতৃগৃহেই যতদিন মেয়েদের সংশিক্ষার ব্যবস্থা না হচ্ছে, ততদিন স্বামিগৃহে শিক্ষা অতি অল্পই হবার সম্ভাবনা। কারণ, অসংযমীর কাছে ধৈর্য্যের প্রত্যাশা বাতুলতা।

কুমারী কি শিখিবে ?

প্রশ্নকর্ত্তা।—সে কথা সত্য বটে। কিন্তু তের চৌদ্দ বৎসর বয়সের মেয়ে পিতৃগৃহে আর কতটুকু শিক্ষা পেয়ে আস্বে ?

শ্রীশ্রীবাবা।—এজন্য বিবাহের বয়স অনুকূল ক্ষেত্রে আরো পিছিয়ে নিতে হবে এবং সন্ন্যাসিনী মায়েরা গ্রামে গ্রামে শিক্ষাশ্রম প্রতিষ্ঠিত ক'রে এদের কুমারী অবস্থাতেই প্রকৃত শিক্ষার সবটুকু দিয়ে দেবেন। কি ক'রে সুন্দর সুঠাম বীর্য্যবান্

সন্তান-সন্ততি লাভ কত্তে হয়, কি ক'রে বিপথগামী স্বামীকে নিজ চরিত্রের বলে সৎপথে ফিরিয়ে আন্‌তে হয়, কি ক'রে বিবাহিত জীবনকে মোক্ষ-সাধনার ক্ষেত্র-রূপে ব্যবহার কত্তে হয়, কি ক'রে নিজ আত্ম-সম্মান বাঁচিয়ে বিপদের সময়ে আত্ম-রক্ষা কত্তে হয়,—এসব তাঁরা শিখাবেন। গ্রামে গ্রামে তাঁরা পবিত্রতার মন্দির রচনা ক'রে সেখান থেকে নারীদের শিক্ষা দেবেন,—কি ক'রে আমৃত্যু অসত্যের সঙ্গে যুদ্ধ কত্তে হয়, প্রলোভনকে জয় কত্তে হয়, পরদারলোলুপ কামুকের মুখে পদাঘাত কত্তে হয় এবং প্রয়োজনকালে অস্ত্র-চালনা ক'রে দস্যু-হস্ত থেকে নিজেকে রক্ষা কত্তে হয়। নারী ব'লেই যে সে হেয় নয়, তারও যে সদসৎ বিচারের ক্ষমতা আছে, তারও যে আত্ম-সম্মান নামে একটা পদার্থ আছে, তারও যে বিপদে বীরত্ব আছে, বাহুতে বল আছে, তারও যে মস্তিষ্কে বুদ্ধি আছে, হৃদয়ে সাহস আছে, বলদর্পিত অত্যাচারীর কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করার ক্ষমতা তারও যে আছে, একথা তাঁরা শেখাবেন এবং তেমন ক'রে গড়ে তুল্‌বেন। জীবন-ব্যাপী অসম্মান আর নিয়ত গোপন অশ্রু বর্ষণের চাইতে যুদ্ধ ক'রে মৃত্যুও যে শ্রেয়ঃ, নিজের সম্মান যেখানে বিপন্ন সেখানে লাজুকতা পরিত্যাগই যে প্রকৃত সতী-ধর্ম্ম, এই কথা এঁরা তাদের মর্ম্মে মর্ম্মে গেঁথে দেবেন। আজ সমগ্র ভারত এই সব সন্ন্যাসিনী মা-দের আবির্ভাবের জন্য ব্যাকুল ভাবে পথ-পানে চেয়ে আছে। বালবিধবাদের পুনর্বিবাহিত সিন্দূর-শোভিত ললাট অপেক্ষা সন্ন্যাস-ব্রতধারিণী পর-কল্যাণ-কারিণী মূর্ত্তি আজ আমাদের অধিকতর কাম্য।

আদর্শ ও অভিমত
নবম তরঙ্গ ১৩৩২

ব্রহ্মচর্য্য-আন্দোলনে স্ত্রীজাতির স্থান

প্রশ্নকর্ত্তা।—আপনার প্রবর্ত্তিত ব্রহ্মচর্য্য আন্দোলনে স্ত্রীলোকদের স্থান কোথায়?

শ্রীশ্রীবাবা।—তাঁদের স্থান যোগ্যতানুসারে সর্ব্বত্র। বহু বহু পূজনীয় মহাত্মারা বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করা সত্ত্বেও স্ত্রীলোককে আমি পুরুষের পক্ষে নরকের দ্বার মনে করি না। নরকের কারণ পুরুষের নিজের সাধন-সংযম-হীন দুর্ব্বল মন,

স্ত্রীলোক উপলক্ষ্য মাত্র। যেখানে স্ত্রীলোক নেই, দুর্ব্বলচেতা পুরুষের অধঃপতন সেখানেও হয়, তার বিকৃত চিত্ত-প্রবৃত্তি নির্জ্জীব ইট, কাঠ পাথরকে নরক-নিপাতের উপলক্ষ্য ক'রে নেয়। স্ত্রীলোকের কাম-প্রবৃত্তি পুরুষের অপেক্ষা আটগুণ প্রবল, একথা আমি স্বীকার করি না। কিন্তু তা যদি সত্যও হ'য়ে থাকে, তবু, কাম-দমনের ক্ষমতা যে পুরুষজাতির চেয়ে স্ত্রীজাতির অনেক গুণে বেশী, একথা ত' সর্ব্বসন্দেহের অতীত। মিথ্যা ক'রে স্ত্রীজাতির স্কন্ধের উপরে কতকগুলি অপবাদের বোঝা চাপিয়ে, কতকগুলি কল্পিত জঘন্যতার আরোপ ক'রে সমাজের সেবা থেকে তাদের সরিয়ে রাখা আমি সুবিচার-সঙ্গত ব'লে মনে কচ্ছি না। সামাজিক জীবনে স্ত্রী-পুরুষের কর্ত্তব্যের ও কর্ম্মপ্রকৃতির পার্থক্য আছে, তা আমি স্বীকার করি, কিন্তু সমাজের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ে পুরুষদের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের দায়িত্ব ও অধিকার কম আছে ব'লে আমি বিশ্বাস করি না। সুতরাং আমার এ ব্রহ্মচর্য্য আন্দোলনে মায়ের জাতির জন্য সম্মানিত আসন সর্ব্বত্র।

শিক্ষাকালে কুমার-কুমারীর মিশ্রণ

প্রশ্নকর্ত্তা।—কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে যত মহাত্মা উপদেশ দিয়েছেন, তাঁরা সবাই যে স্ত্রীবর্জ্জন ক'রে চল্‌তেই বলেছেন, তার মানে কি?

শ্রীশ্রীবাবা।—মানে অতি স্পষ্ট। তাঁরা পুরুষদের জন্যই উপদেশ দিয়েছেন, পুরুষদের কল্যাণ নিয়েই ব্যস্ত থেকেছেন, স্ত্রীজাতিকে পৃথক সত্ত্বারূপে ভেবে দেখেন নি, তাই তাদের জন্য পৃথক্ উপদেশ দেবারও প্রয়োজন অনুভব করেন নি। কিন্তু আমরা যে যুগে জন্মেছি, সেই যুগে নারীকে পুরুষের নির্জ্জীব ছায়া ব'লে মনে কর্লে চল্‌বে না। এ যুগে নারীকে পুরুষের আজ্ঞাবাহিনী ব'লে ভাবলেই চল্‌বে না। এ যুগের নারী পুরুষের সজীব কর্ম্ম-সঙ্গিনী, পুরুষের মুক্তিপথের বান্ধবা। তাই, এ যুগের ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারকের দৃষ্টি উভয়তঃ প্রসারিত থাকা চাই। এতদিন 'ব্রহ্মচর্য্য' বল্‌তে লোকে সাধারণতঃ 'পুরুষের ব্রহ্মচর্য্য'ই বুঝ্‌ত, এখন থেকে ব্রহ্মচর্য্য বল্‌তে 'স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই ব্রহ্মচর্য্য' বুঝাবে। এতদিন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করার মানে এই ছিল যে, ব্রতধারী পুরুষ সর্ব্বপ্রযত্নে স্ত্রী-সংশ্রব ত্যাগ ক'রে আত্ম-সংযম শিক্ষা কর্ব্বেন। এখন থেকে তার সঙ্গে আর একটী কথা যুক্ত হবে যে, ব্রতধারিণী নারীও সর্ব্ব-

প্রযত্নে পুরুষ-সংশ্রব বর্জ্জন ক'রে আত্ম-সংযম শিক্ষা কর্ব্বেন। যুগের গতি লক্ষ্য ক'রে স্থল-বিশেষে সংযমের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য ব্রতধারী পুরুষ ও ব্রতধারিণী নারীর মিশ্রিত ভাবে সঙ্ঘজীবন যাপনের আবশ্যকতা হ'তে পারে কিন্তু জীবন গঠনের প্রথম সময়েই সমবয়স্ক বালক-বালিকাদের নিয়ত মিশ্রণের দ্বারা একটা বিশেষ রকম নৈতিক শক্তি লাভের প্রচুর সম্ভাবনা আছে ব'লে আমি মনে করি না।

কুমারী-আশ্রমের শিক্ষা-দীক্ষা

প্রশ্নকর্ত্তা।—কুমারী-আশ্রমের শিক্ষা-দীক্ষা এবং বালক-ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের শিক্ষা-দীক্ষা কি একই প্রকার হওয়া উচিত?

শ্রীশ্রীবাবা।—স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক পার্থক্য তাদের কর্ত্তব্যকে নিজ নিজ গণ্ডীতে কতকটা সীমাবদ্ধ ক'রে রেখেছে, তাই, শিক্ষায় কিছুটা পার্থক্য থাক্‌বেই। শিক্ষার মানে কি? জীবের ভিতরে যতগুলি সদ্‌গুণের, সামর্থ্যের ও যোগ্যতার বিকাশ সম্ভবপর, তার সব কয়টাকে বিকশিত ক'রে দেবার চেষ্টার নামই শিক্ষা-দান। শিক্ষা একটা বানরকেও দেওয়া যায়, একটা মানুষকেও দেওয়া যায়, কিন্তু উভয়ের মধ্যে বিকাশের সম্ভাবনার তারতম্য আছে ব'লে শিক্ষারও তারতম্য হয়। পুরুষের শিক্ষায় বহির্জগতের সংগ্রামে জয়ী হবার আয়োজন বেশী থাক্‌বে, নারীর শিক্ষায় পারিবারিক জীবনের পূর্ণতা-সম্পাদনের চেষ্টা বেশী থাক্‌বে। যে নারী বিবাহিত জীবন গ্রহণ কর্ব্বেন না, তাঁর শিক্ষা হয়ত একটা পৃথক প্রকারের হতে পারে, কিন্তু প্রধানতঃ নারীর বহির্জীবনটুকু অধিকাংশ স্থলে সন্তান-প্রসবিত্রী জীবধাত্রী মায়েরই জীবন, সুতরাং প্রকৃত মা হবার জন্য যত প্রকারের দৈহিক, মনসিক, নৈতিক ও বুদ্ধিগত উৎকর্ষ লাভ তাঁর দরকার, সবটুকু তাঁকে দিতে হবে। রামপ্রসাদ ব'লেছেন,—"মা হওয়া নয় সোজা কথা; প্রসব কল্লেই হয় না মাতা।" এই সিদ্ধবাণীর আলোকে নারীর মাতৃত্বকে বুঝতে হবে এবং তদনুযায়ী তাকে শিক্ষা দিতে হবে। মানুষের মধ্যে যে পশুভাব রয়েছে, তাকে শিক্ষার প্রভাবে নিরস্ত ক'রে মাতৃত্বকে মহৎ ও পবিত্র ক'রে তোলাই সকল সমাজসংস্কারের গোড়ার কথা। এই যে আজ জননীরা শুধু শেয়াল-কুকুরের ছানাই প্রসব কচ্ছেন,

দশ মাস দশ দিন জননীদিগকে দারুণ জঠর-যন্ত্রণা দিয়ে চারদিকে শুধু নপুংসকের বাচ্চারাই ভুমিষ্ঠ হচ্ছে, এই ভাবে আর কত দিন চল্‌বে ?

স্ত্রীশিক্ষার পন্থা-নির্ণয়

প্রশ্নকর্ত্তা।—কিন্তু স্ত্রী-শিক্ষার প্রকৃতি সম্পর্কে প্রাচী-নপন্থী ও নব্যপন্থীদের মধ্যে যে ঘোরতর অনৈক্য রয়েছে !

শ্রীশ্রীবাবা।—আমাদের হ'তে হবে মধ্যপন্থী। ঠাকুরমার আমলের মেয়েরা পারিবারিক শৃঙ্খলা, ধর্ম্মভীরুতা ও আত্মসুখে স্পৃহাহীনতার যে সুশিক্ষা পেতেন, তা যেমন আমরা আজও আবশ্যকীয় ব'লে মনে করি, পাশ্চাত্য দেশের মেয়েদের শিক্ষায় যে দৈহিক স্বচ্ছন্দতার ব্যবস্থা আছে, তার প্রবর্ত্তনও আমরা তেমনি দরকারী ব'লেই মনে করি। ঠাকুরমাদের আমলে মেয়েরা সমগ্র দেশের মনের সাথে নিজেদের মনের যোগ-স্থাপনের সুযোগ পায়নি। আবার, পাশ্চাত্য দেশে কাব্য, দর্শন আর বিজ্ঞানের চাপে মেয়েদের মস্তিষ্ক আর্ত্তনাদ কচ্ছে। ডেনমার্কের একজন পণ্ডিত, Dr. Hartel, নির্দ্ধারিত করেছেন যে, তাঁর স্বদেশে শতকরা একচল্লিশজন ছাত্রী মস্তিষ্কের অতিশ্রমহেতু অতিশয় শোচনীয় অস্বাস্থ্য সঞ্চয় কচ্ছে। মিঃ ক্লার্ক * নামে একজন আমেরিকান লেখক লিখেছেন,—"আমেরিকাতে স্ত্রী-শিক্ষায় ছাত্রীদিগকে এত অধিক মস্তিষ্কের শ্রম কত্তে হচ্ছে যে, এইভাবে যদি আর অর্দ্ধ শতাব্দী চলে, তাহ'লে সন্তানার্থী আমেরিকান পুরুষকে সমুদ্রের পরপারবর্ত্তী ভিন্ন দেশ থেকে স্ত্রী আমদানী ক'রে বংশরক্ষা কত্তে হবে।" পাশ্চাত্য মনীষীরা অনেকেই এখন বুঝতে পাচ্ছেন যে, মস্তিষ্কের অতিশ্রম অনেক নারীকে বন্ধ্যা ক'রে দিচ্ছে এবং অধিকাংশকেই নিজ নিজ সন্তানকে স্তন্য দেবার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত কচ্ছে। পাশ্চাত্যদের এই দুরদৃষ্টের কুবাতাস যাতে আমাদের গায়ে না লাগ্‌তে পারে, তার জন্য আমাদের সাবধানতার প্রয়োজন আছে। আবার, প্রাচীনপন্থীর অল্পশিক্ষিত মেয়েরা আজকালকার যুগের সকল প্রয়োজনের দাবী মিটাতে সব সময়ে সমর্থ হবে না। দেশোদ্ধারকারী স্বামীকে উৎসাহ দিতে, পরকল্যাণরত

---

* Education & Heredity, Contemporary Science series Edited by H. Ellis.

স্বামীর সৎকার্য্যে সহায়তা দিতে, ভগবৎ-প্রেমিক স্বামীর সাধন-পথের বিঘ্ন কমিয়ে দিতে অশিক্ষিতা বা অল্পশিক্ষিতা বধূ সব সময় সমর্থ হবে, এমন আশা করা যায় না। তাই বর্ত্তমান ভারতের স্ত্রীশিক্ষার পন্থা হবে—মধ্যপন্থা। প্রাচীন বা নব্য এই দুইজনেরই মতামতের বাড়াবাড়িটুকু বাদ দিয়ে দেশোপযোগী, কালোপ-যোগী ও পাত্রোপযোগী ব্যবস্থা কত্তে হবে। এ দেশটা ভারতবর্ষ না হ'য়ে ইংল্যাণ্ড বা ফ্রান্স হ'লে পাশ্চাত্য ঢং-এর শিক্ষা-ব্যবস্থা হয়ত মানান-সই হ'তে পাত্ত। এ কালটা বিংশ শতাব্দী না হ'য়ে খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ষোড়শ শতাব্দী হ'লে হয়ত নৈমিষারণ্যের তপোবনের ব্যবস্থা পূরাপূরি উপযোগী হ'ত। এখন আমাদের দেখ্‌তে হবে সেই সেই পথ, যে পথে চল্‌লে তপোবনের সংযম ও শুদ্ধতা, আর, ইয়োরোপের Smartness ও Forwardness আমাদের মায়েদের মধ্য দিয়ে জাতির স্থায়ী সম্পদরূপে পরিণত হ'তে পারে।

নারীর চিরকৌমার্য্য

প্রশ্নকর্ত্তা।—সম্প্রতি একখানা বাংলা মাসিক পত্রিকায় একজন লেখিকা কুমারীদের চিরকৌমার্য্য অবলম্বন ক'রে শুদ্ধভাবে জীবন-যাপনের চেষ্টার খুব সমর্থন করেছেন। তিনি ব'লেছেন যে স্ত্রীলোকের আকৌমার ব্রহ্মচর্য্য নিষিদ্ধ নয়, কন্যা জন্মালে তাকে বিয়ে দিতেই হবে, এমন অন্যায় কথা আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরাও সব সময়ে মানেন নাই এবং ভবিষ্যতেও মান্‌বার বিশেষ আবশ্যকতা নাই। যাঁরা বলেন, স্ত্রীলোকেরা কুমারী থেকে গেলে জন-সংখ্যার হ্রাস-হেতু জাতির ক্ষতি হবে, তাদের যুক্তি যে কুযুক্তি, তাও তিনি ব'লেছেন। তিনি আরো লিখেছেন,—যদি চিরব্রহ্মচারিণীর পবিত্র জীবন যাপনের জন্য কোনও কুমারীর প্রাণে প্রকৃতই আবেগ জন্মে, তবে অভিভাবকের তাড়নাতেই তার সব আবেগ নিভে যাবে এবং তিনি বাধ্য হ'য়েই বিবাহিত জীবন গ্রহণ কর্ব্বেন, একথা সত্য নয়।

শ্রীশ্রীবাবা।—বাস্তবিক তাই। যাঁর প্রাণে উচ্চাকাঙ্ক্ষার তীব্র অনল সত্য সত্যই জ্বলে, তাঁর আকাঙ্ক্ষাকে সপ্ত সমুদ্রের সলিল-সিঞ্চনেও নিভান যায় না।

বর্ত্তমানে দেশে নারীর চিরকৌমার্য্যের সামাজিক আনুকূল্য

প্রশ্নকর্ত্তা।—কিন্তু এস্থলে আমার একটী জিজ্ঞাস্য আছে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় নারীর চিরকৌমার্য্যের কোনও আনুকূল্য আছে কি?

শ্রীশ্রীবাবা।—মস্ত বড় আনুকূল্য রয়েছে তোমার এই বরপণপ্রথায়। যে পণের লাঞ্ছনায় অরক্ষণীয়া কন্যার পিতামাতা দুশ্চিন্তায় আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করেছেন, একটু দৃঢ়চেতা হ'লে মেয়েরা সে পণপ্রথাটাকেই নিজেদের সুযোগরূপে গ্রহণ কত্তে পারে। মেয়েদের ভিতরে দৃঢ়তা দেখ্‌লে অনেক পিতামাতার ভিতরেও দৃঢ়তা আপনি আস্‌বে। অপাত্রে, কুপাত্রে কন্যাদান কত্তে কোন্ পিতামাতার ইচ্ছে হয়? বিগতযৌবন, মাতাল, দুশ্চরিত্র বা উপদংশক্লিষ্ট বরের সাথে প্রাণের পুত্তলী কন্যাকে বিয়ে দিতে কে স্বেচ্ছায় সম্মত হয়? কন্যাদের ভিতরে একটু সৎসাহস থাক্‌লে এ দুর্দ্দিনে সহস্র সহস্র পিতামাতা কন্যাদের কৌমার্য্যের পরিপন্থী না হ'য়ে বরং পৃষ্ঠ-পোষক হবেন।

নারীর চিরকৌমার্য্যে বিপদ

প্রশ্নকর্ত্তা।—কিন্তু মেয়েদের কৌমার্য্যে ব্রতভ্রংশতার আশঙ্কা নাই কি?

শ্রীশ্রীবাবা।—আছে, কিন্তু দুটো একটা পাতিত্যের দৃষ্টান্তে প্রকৃত ব্রতনিষ্ঠদের মহিমা কমে না। তবে, স্বেচ্ছায় স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হবার দৃষ্টান্ত যেমন কাল-ক্রমে একটা প্রাণহীন সামাজিক আচারে পরিণত হ'য়ে শেষটায় অনিষ্টই কচ্ছিল, ঘরে ঘরে কুমারী থাক্‌বার চল হ'লে তেমনি একটা দুরন্ত রকমের অমঙ্গল ঘটা বিচিত্র নয়। তাই, চিরকুমারীদের পক্ষে পিতামাতার গৃহে বাস না ক'রে, বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে বাস ক'রে, জীবনকে সমাজ-সেবা ও ব্রহ্ম-সাধনার মধ্য দিয়ে সার্থক করার চেষ্টাই সঙ্গত। গৃহীদের নিত্য-সংস্পর্শে কুমার, কুমারী, সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর চিত্তমালিন্য অনেকস্থলেই অবশ্যম্ভাবী।

কুমারীর সমাজ-সেবা

প্রশ্নকর্ত্তা।—কিন্তু আশ্রমের মধ্যে থেকে এরা সমাজ-সেবা কিভাবে কর্ব্বেন? ব্রহ্মসাধনা আশ্রমে ব'সে চলে কিন্তু সমাজ-সেবা কত্তে হ'লে যে সমাজের সকলের সাথে খোলাখুলি ভাবে মিশ্‌তে হয়!

শ্রীশ্রীবাবা।—"সমাজসেবা" কথাটা ক্ষুদ্র পাঁচটী অক্ষরে নিবদ্ধ ব'লে ওর মানেও কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়! সমাজের প্রয়োজন অনন্ত, সুতরাং তার সেবার ভঙ্গীও অনন্ত। তার মধ্যে এমন সব ভঙ্গীও আছে, যাতে সমাজের সকলের সাথে মিশামিশি বর্জ্জন করাও প্রয়োজন হ'তে পারে। এই সকল কুমারীরা প্রত্যেকেই যে সন্ন্যাসীনী হবেন, কেউ যে আর ফিরে গার্হস্থ্য অবলম্বন কর্ব্বেন না, ধর্ম্ম-কর্ম্মের উপযুক্ত সহযোগী মিল্‌লেও কেউ যে বিবাহিত আর হবেন না, এমন একটা নির্দ্দিষ্ট ধারণা আগে থেকে পোষণ কল্লে চল্‌বে না। সুতরাং বিবাহপ্রার্থিনী কন্যাকে যেমন যত্ন ও সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করা গৃহী মাত্রেরই কর্ত্তব্য, আশ্রমের পরিচালিকারাও তেমন সতর্কতার সাথে বাইরের পুরুষের প্রভাব, দৃষ্টি ও সংশ্রব থেকে কুমারীদিগকে প্রয়োজন মত বাঁচিয়ে চল্‌বেন। কিন্তু তাঁদের হাতে সমাজসেবারও একটা অংশ তুলে দিতে হবে। সে অংশটা হচ্ছে, অল্পবয়স্ক পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ শিশুদের প্রতিপালন। নারীহৃদয়ের বিশিষ্টতা তাঁর মাতৃত্ব। সুশিক্ষিতা নারী কামের ক্ষুধায় পতি গ্রহণ করেন না, করেন মাতৃত্বের ক্ষুধায়। প্রকৃতই যাঁরা চিরকৌমার্য্যপ্রার্থিনী, তাঁরা এই অনাথ শিশুকে নিজ সন্তান জেনে এই নবোন্মেষিত মাতৃত্বের মাধুর্য্য-প্রভাবে সংসারের পিছন-টান থেকে মুক্ত হবেন। আর, যাঁকে পুনরায় সংসারে ফিরে যেতে হবে, গিয়ে স্বামী গ্রহণ কত্তে হবে, ঘর-কন্না কত্তে হবে, পুত্র-কন্যার জননী হ'তে হবে, তিনিও অনাথ শিশুর মা হ'য়ে তার সেবা-যত্ন ক'রে, তাকে লালন-পালন ক'রে মনুষ্যত্বের যে পূর্ণতা ও পালনীশক্তির যে পরিপুষ্টি নিয়ে যাবেন, তাতে গৃহীর গৃহ সুখের খনি হবে। তাই, এসব কুমারীদের প্রত্যেকের কোলে একটী ক'রে অনাথ শিশু দিয়ে সমাজ-সেবা করাতে হবে। এই সেবাটুকুর কর্ম্মক্ষেত্র কয়েক বিঘা জমির উপরে স্থাপিত আশ্রম বটে কিন্তু এর লাভ এবং এর পুণ্য সমগ্র সমাজে পৌছাবে।

অনাথ শিশুর প্রাচুর্য্য

প্রশ্নকর্ত্তা।—কিন্তু এত অনাথ শিশু পাওয়া যাবে কোথায়?

শ্রীশ্রীবাবা।—সর্ব্বত্র। খ্রীষ্টান মিশনারীরা এত অনাথ শিশু কোথায় পান? দুর্ভিক্ষে, জলপ্লাবনে, মহামারীতে, সাইক্লোনে দুর্দ্দশা-ক্লিষ্ট দেশে ছুটে যাও, হাজার হাজার মা-বাপ-মরা অনাথ শিশু পাবে। অনাথ নাই কোথায়? কল্‌কাতা, বোম্বে, মাদ্রাজের মহানগরীতে, কাশী, বৃন্দাবন, নবদ্বীপের তীর্থ-ভূমিতে, রাজ-পুতানার মরুভূমিতে, কাশ্মীরের নন্দনকাননে, কোথায় অনাথ শিশু পথের ধূলায় প'ড়ে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ কত্তে চেষ্টা না করে? অতদূরেই বা যাও কেন? তোমার সোণার বাংলার পানেই চেয়ে দেখ না, অনাথের আকাল কোথায়? সেবার খুলনার দুর্ভিক্ষে চার আনা মূল্যে মা তার শিশুপুত্রকে বিক্রী ক'রে উদরের ক্ষুধা মিটিয়েছে। আজই একখানা বিজ্ঞাপন পত্রিকাতে দিয়ে দেখ দেখি,—"বালক ও বালিকা চাই, বয়স—তিন মাস হইতে তিন বৎসর, চিরতরে স্বত্বত্যাগ ক'রে দিতে হবে" দেখবে, কত স্থান থেকে কত হাজার পত্র এসে হাজির হয়। কত দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট পিতামাতা তাঁদের দুঃখের বোঝা তোমার কাঁধে গছিয়ে দিতে চেষ্টা কর্ব্বেন।

সমাজে অনাথের স্থান

প্রশ্নকর্ত্তা।—কিন্তু আর এক জিজ্ঞাস্য, এ সব অনাথ ছেলেমেয়েরা বড় হ'লে পর সমাজে এদের স্থান কোথায় হবে?

শ্রীশ্রীবাবা।—সমাজের উচিত এদের আত্মসাৎ ক'রে ফেলা। কিন্তু তা যদি সম্ভব না হয়, তাহ'লে এরা একটা পৃথক সমাজ গ'ড়েই তাতে বাস কর্ব্বে। অনাথ ছিল ব'লেই যদি প্রচলিত সমাজে নিকৃষ্ট হ'য়ে, মাথা নীচু ক'রে থাক্‌তে হয়, তবে পৃথক সমাজ গ'ড়ে মাথা উচু ক'রে থাক্‌বার চেষ্টাই তাদের পক্ষে সঙ্গত হবে। কিন্তু পৃথক সমাজ গড়্‌বার কালে তাদের এই কথাটী মনে রাখ্‌তে হবে যে, এমন ব্যবস্থা করা চাই, যেন, নবগঠিত সমাজ-ভুক্ত একটী পুরুষ বা একটী নারীও স্বাধীনভাবে অন্নার্জ্জন ক'রে জীবিকা-সংস্থানের শক্তিতে দীন না থাকে এবং মানসিক অনুশীলনে, লেখাপড়ায়, চিন্তাশীলতায়, চরিত্রে, সংযমে, সদাচারে, পবিত্রতায় সমসাময়িক অপরাপর উন্নত সমাজগুলির শীর্ষদেশে থাক্‌বার জন্য আমৃত্যু চেষ্টা কত্তে কুণ্ঠিত না হয়।

নূতন সমাজ গঠনের সমস্যা

প্রশ্নকর্ত্তা।—কিন্তু এভাবে ভিন্ন সমাজ গড়্‌তে গেলেও যে আর এক সমস্যার উদ্ভব হয়। জাতিভেদের গলদেই হিন্দু সমাজের চরম দুরবস্থা এসেছে, পরস্পরের মধ্যে ঐক্য নাই, সহানুভূতি নাই, একের জন্য অপরের মমত্ব-বোধ নাই। তার উপরে আবার পৃথক্ পৃথক্ নূতন নূতন সমাজ যদি সৃষ্ট হ'তে থাকে, তবে ইতিহাসে বোধ হয় আমাদের কলঙ্কই বাড়্‌বে।

শ্রীশ্রীবাবা।—আচ্ছা, বল দেখি, এই যে শিখসমাজ হিন্দুর চাতুর্ব্বর্ণ্য মান্‌লে না, তাতে কি ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতাগুলি কলঙ্কে মলিন হ'য়েছে? হিন্দুর জাতিভেদকে মান্‌লে শিখ-জাতিটা তোমাদের সমাজে কোন্ স্থানটা পেত? যাদের ধর্ম্ম-সম্প্রদায় অব্রাহ্মণবংশীয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, বিধর্ম্মীকে যারা আপন ক'রে নিতে সাহস পায়, সামাজিকভাবে যারা নবদীক্ষিতের সাথে রক্তসম্বন্ধ স্থাপন কত্তে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠা বোধ করে না, তারা তোমাদের কাছে শূদ্রের অধিক সম্মান নিশ্চয়ই পেত না। আর, যদিও বা কিছু পেত তবে সেটা শুধু তাদের তরবারির ক্ষমতায় অর্থাৎ তোমাদের ভীরুতার সুযোগে। জাতিভেদের মহিমা-কীর্ত্তনে হিন্দু আজ এমন অন্ধ হ'য়ে পড়েছে যে, সে ভুলে গেছে, অধিকাংশ হিন্দুর বংশ-প্রবাহে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে নানাজাতির রক্ত এসে পড়েছেই। হিন্দু এবং মুসলমানের রক্তের যোগাযোগকে প্রকাশ্যভাবে স্বীকার ক'রে যে-শিখ পাঞ্জাবী হিন্দুদের কাছে কতকটা ঘৃণার পাত্র, সেই শিখের চাইতে হিন্দুর রক্তের বিচিত্রতা একটুকুও কম নয়। রক্ত কাউকে হিন্দু বা মুসলমান করে না, করে ধর্ম্মবিশ্বাসে। বাংলা দেশে কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ এলেন পাঁচজন, আজ তাঁদের বংশধর এত হ'ল কি ক'রে? পাঁচজন ব্রাহ্মণের বংশধরেরা অসম্ভব হারে বৃদ্ধি পেলেন কি ক'রে? এবং সেই সকল বংশধরেরা ব্রাহ্মণ ব'লেই বা পরিচিত হচ্ছেন কি ক'রে? কুলীন ব্রাহ্মণেরা শতকের হিসাবে বিয়ে করেছেন, বিয়ে ক'রে বরপণের টাকা টেঁকে গুঁজে দ্বিতীয়বার আর সে সকল স্ত্রীর মুখদর্শনের জন্যও শ্বশুর-গৃহে যান নি, সেই সকল স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রেরা ব্রাহ্মণ হলেন কি ক'রে? আবার তথাকথিত বাপদের মতই পণের টাকা আদায় ক'রে কৌলীন্যই বা ফুটালেন কি ক'রে? তুমি কি বল্‌বে যে, নিজের মধ্যে বর্ণ-

সাঙ্কর্য্যের যার অভাব নাই, সেই হিন্দু যদি বর্ণ-সাঙ্কর্য্যের জন্য অপর কাউকে ছোট ক'রে রাখ্‌তে চায়, তবে তাতেও সায় দিয়ে চল্‌তে হবে? হিন্দুদের মধ্যে বিভিন্ন সমাজের পারস্পরিক মিলনের প্রয়োজন আছে, কিন্তু মিলনের মানে স্বেচ্ছাচারের দাসত্ব-বরণ নয়। হিন্দুর বর্ত্তমান জাতিভেদ গুণ এবং কর্ম্মবিভাগের উপর ভিত্তি-মান্‌ নয়, সে দাঁড়িয়ে আছে লোকাচারের উপর। তাই, যারা মনে-প্রাণে বুঝ্‌তে পার্ব্বেন যে, ব্রহ্মকর্ম্মই ব্রাহ্মণের লক্ষণ, জন্ম নয়, তাঁরা প্রচলিত লোকাচার উপেক্ষা কর্ত্তে বাধ্য হবেনই। এবং এতে হিন্দুর যে অনিষ্ট হবে, তাও মনে করিনা। আর্য্য-সমাজ, ব্রাহ্ম-সমাজ বা রাধাস্বামী-সমাজের মত শিক্ষিত-প্রধান বহু বহু স্বাধীন সমাজ যখন হিন্দু-সমাজের চারিপাশে গজিয়ে উঠ্‌বে এবং শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রবর্ত্তিত বৈরাগীদের মত একমাত্র খোল-করতাল নিয়ে দিন না কাটিয়ে এসব সমাজ যখন সাধনে ভজনে, শ্রমে কর্ম্মে, শিক্ষায় দীক্ষায়, সংযমে চরিত্রে সর্ব্বতোমুখে সর্ব্বতোভাবে মহৎ হবার জন্য চেষ্টা কর্ব্বে, সেদিন হিন্দু সমাজই সব চেয়ে অধিক লাভবান্‌ হবেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবনচন্দ্রের বাঁশীর রবে বাংলার জাতিভেদ দূর কর্ত্তে চেয়েছিলেন, শ্রীক্ষেত্র তার প্রমাণ। কিন্তু তিনি জীবকে ধর্ম্ম দিয়েছিলেন, কর্ম্ম দেননি, প্রেম দিয়েছিলেন, জ্ঞান দেন নি। পরন্তু শ্রীগৌরাঙ্গেরই পদরজসেবী হয়ে তোমরা জীবকে ধর্ম্মও দেবে, কর্ম্মও দেবে, জ্ঞানও দেবে, প্রেমও দেবে।

বিচিত্র বার্ত্তা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ১৩৩৬ এর ২৬শে শ্রাবণের পর হইতে প্রায়ই শ্রীশ্রীবাবা দিবসের কোনও কোনও অংশে মৌনী থাকিতেছেন। সেই সময়ে শ্রীশ্রীবাবার মৌখিক উপদেশের পরিবর্ত্তে উপদেশ-প্রার্থীরা যে পাণ্ডুলিপি হইতে তাঁহার উপদেশ পাঠ করিতেন, সেই "আদর্শ ও অভিমত" নামক লিপিরও যতটুকু পাওয়া গিয়াছে, তাহা উপরে মুদ্রিত হইয়াছে। ১৩৩৩ সনের বিভিন্ন সময়ের কয়েকটী বিচ্ছিন্ন উক্তি "বিচিত্র-বার্ত্তা" নামে একটী পাণ্ডুলিপিতে গ্রথিত ছিল। তাহাও এই সময়ে কোনও কোনও জিজ্ঞাসুর কৌতূহল চরিতার্থ করিয়াছে। "বিচিত্র-বার্ত্তার" সংরক্ষিত উক্তিসমূহের মধ্যে যাহা অগ্নি, জল ও কীটের অত্যাচার সহিয়া শেষ

পর্য্যন্ত আমাদের হস্তে পৌঁছিয়াছে, তাহা নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল। উক্তির স্থান বা তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই।

নিজের যুগকে শ্রদ্ধা কর

নিজের যুগকে যারা শ্রদ্ধা কত্তে শেখে না, তাদের হাতে ভগবান্ কখনো ভবিষ্যৎ গড়্‌বার অধিকার তুলে দেয়েন না। সত্যযুগে জন্ম লাভ কর নাই ব'লে বৃথা আক্ষেপ করো না, বর্ত্তমান যুগকেই জগতের শ্রেষ্ঠ কল্যাণের জন্য ব্যবহার কত্তে হবে।

অপরাধের মধ্য দিয়া সবলতা

এমন পাপ কিছু থাকৃতে পারে না, যার জন্য ক্ষমা নাই,—অবশ্য, আলস্য বাদে। পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক-নাশনম্। এই পঞ্চকন্যার প্রত্যেকেই ছিলেন দ্বিচারিণী। কিন্তু অনাথ-শরণ ভগবান্ এঁদের ক্ষমা করেছেন, নিজের আশীর্ব্বাদ দিয়ে এঁদের শুদ্ধ ক'রে নিয়েছেন, এঁদের পাতিত্য, এঁদের অপরাধ, এঁদের দুষ্কৃতি নিজ হাতে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন, এঁদের নামকে হতাশের আশারূপে, অবসন্নের ভরসারূপে মহাপাতক-নাশক ও প্রাতঃস্মরণীয় ক'রে রেখেছেন।

তিনি পতিত-পাবন। অনুতাপের অশ্রুধারায় বক্ষ ভাসাও, আর, বিগতের অপরাধ তোমাকে কোন্ শিক্ষা দিল, কোন্ সবলতা দিল, তার হিসাব নাও।

অপরাধেও মানুষ সবল হয়। অনুতপ্ত অপরাধী জগতের অপরাধিকুলকে ভালবাস্‌তে পারে, প্রেম দিতে পারে। এটা তার একটা যোগ্যতা। এ যোগ্যতা লাভের জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দাও। তিনি যে পতিতপাবন, এটা অতি নির্ভুল। তোমাকে পাপে ডুবাবার ভিতরে শুধু তোমাকেই কোলে তুলে নেবার উদ্দেশ্য তাঁর ছিল, তা নয়, তোমার উত্থানের সাথে সাথে লক্ষকোটি পাপীর অভ্যুদয় লাভ হোক্, তোমার প্রণময় প্রেমের আকর্ষণে তারা পুণ্যের পথে ছুটে আসুক,—এখানেই তাঁর দয়া যেন কলেবর পরিগ্রহণ করেছে। তুমি জেগেছ, তাতে কি হ'য়েছে? সমগ্র জগৎ তোমার সাথে না জাগ্‌লে যে তোমার জাগরণ পূর্ণরূপে হয় না! তুমি যে সকলের! সবাই যে তোমার! একা মুক্তি নিয়ে কি হবে! সর্ব্বজীবকে মুক্তির আনন্দ আস্বাদন করাবে, তবে ত' তোমার মুক্তির বাহাদুরী!

নীরব কর্ম্ম ও হুজুগ

নীরব কর্ম্মীরা লুকিয়ে লুকিয়ে সংকাজ কত্তে যে আরামটুকু পান, যে স্বচ্ছন্দতাটুকু অনুভব করেন, প্রকাশ্যভাবে কাজ কত্তে সে আরামও পান না, সে স্বচ্ছন্দতাও অনুভব করেন না। এটা তাঁদের মানসিক কোনও দুর্ব্বলতা নয়। যেখানে কর্ম্মের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গেছে, নীরব কর্ম্মী সেখানে আত্মপ্রকাশ কত্তে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হন না। দেশে আজ ক্ষেত্র প্রস্তুত নেই ব'লেই হৈ-চৈ-টা বেশী হচ্ছে। ক্ষেত্র প্রস্তুত থাক্‌লে হৈচৈ সম্ভবও হ'ত না, এর আবশ্যকতাও পড়্‌ত না। যাদের দিয়ে কাজ আদায় ক'রে নিতে হবে, যেখানে তাদের স্বাভাবিক উত্তম অত্যন্ত অল্প থাকে, সেখানে কৃত্রিম উত্তমের সাহায্যে কাজ আদায় কর্‌বার মতলবেই হুজুগ সৃষ্টি কত্তে হয়। কিন্তু যেখানে উত্তম-উৎসাহ স্বাভাবিক সম্পদে পরিণত হয়েছে, সেখানে হুজুগের আবশ্যকতা পড়ে না। যে ক্ষেত্রে হুজুগের দ্বারা সৃষ্ট সাময়িক বা কৃত্রিম উত্তমের দ্বারা কাজ করাতে হয়, সে ক্ষেত্রে নেতৃত্বের বল্গা তাঁদেরই হাতে থাকে, যাঁরা হুজুগ সৃষ্টিতে সুনিপুণ।

মদ-গাঁজার মতন হুজুগেরও একটা মাদকতা আছে। এই মৌতাতে একবার ধর্‌লে শেষে হুজুগ ছাড়া কাজ চালানই অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। এজন্য অধিকাংশ কর্ম্মক্ষেত্রেই হুজুগকে যথাসাধ্য সংযত ক'রে রেখে চলা আবশ্যক। হুজুগের ফলে কর্ম্মী মিলে অনেক, কিন্তু তাদের মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত লেগে থাকার মত লোক কম থাকে এবং এই জন্যেই expert hand এর (নিপুণ কর্ম্মীর) অভাব প্রতি পদে অনুভব কত্তে হয়। হুজুগহীন কর্ম্মে কর্ম্মী মিলে কম, কিন্তু কর্ম্ম-প্রয়াসের বয়স যত বাড়্‌তে থাকে, expert hand-এর (নিপুণ কর্ম্মীর) সংখ্যাও তত বাড়্‌তে থাকে এবং মাত্র একশত নীরব সুনিপুণ কর্ম্মী যদি কোনও দিন কোনও কারণে হুজুগ করাকে আবশ্যক মনে করে, তাহ'লে এত বড় হুজুগ ও কর্ম্ম কোলাহল তারা সৃষ্টি কত্তে পারে, যা বহু-হুজুগের স্রষ্টা মস্তিষ্কবান্ পুরুষদেরও কল্পনার অতীত।

সন্ন্যাসী ও সংযত গৃহী

দেশে ব্রহ্মচর্য্য পালনের নিয়ম প্রচলিত থাকুক আর না থাকুক, একদল লোক চিরকালই সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন কর্ব্বেন। জীবসৃষ্টি যেমন অপরিহার্য্য নিয়ম,

সন্ন্যাসও তেমন একটা অপরিহার্য্য নিয়ম। যিনি যতই চেষ্টা করুন না কেন, গার্হস্থ্যের যেমন বিলোপ নাই, সন্ন্যাসেরও তেমন বিলোপ নাই। কখনো কখনো অনুপাতের হ্রাস-বৃদ্ধি হ'তে পারে, কিন্তু গার্হস্থ্য যতদিন থাক্‌বে, ঠিক্ তার পাশা-পাশি সন্ন্যাসও ততদিন থাক্‌বেই। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারকদের কাঁধে সন্ন্যাসের দায়িত্ব চাপাতে গেলে সেটা অবিচারই হবে। ব্রহ্মচর্য্য-প্রচার-আন্দোলনের সাথে সন্ন্যাস-প্রচারের কোনও সম্পর্ক আছে ব'লে ত' আমি মনে করি না। বর্ত্তমানে দেশে ব্রহ্মচর্য্যের যে বিরাট আন্দোলন জাগাতে হবে, অধিকাংশ স্থলে সন্ন্যাসীদিগকেই তার নেতৃত্ব কত্তে হবে, কারণ গৃহীর মুখে সংযমের কথা গার্হস্থ্যের বর্ত্তমান পঙ্কিল অবস্থার সকল ক্ষেত্রে ফলদায়ক হবে না। তবে, যাঁরা সংযত গৃহী, সাধক গৃহী, ভগবদ্‌ভক্ত গৃহী, তাঁদের কথা পৃথক্। তাঁদের আমি মানুষ মনে করি না, তাঁরা দেববিগ্রহ স্বরূপ, তাঁরা নররূপী লক্ষ্মীনারায়ণ।

প্রকৃত বান্ধব

যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভগবানকে ভালবাস্‌বার পথে আমি তোমার সহায়, ততক্ষণই আমি তোমার বান্ধব। আমার প্রতি আকর্ষণ যদি তোমাকে ভগবানের প্রতি আকর্ষণহীন করে, আমার প্রতি কর্ত্তব্য যদি তোমাকে তাঁর প্রতি কর্ত্তব্যে উদাসীন করে, তবে আমি তোমার শত্রু।

দুঃখের সার্থকতা

আমি তোমাকে বল্‌তে চাই না যে সুখ-দুঃখ মায়ামাত্র। আমি তোমাকে এই কথাই বল্‌ব যে, তোমার সম্যক্ পরিপূর্ণতার জন্য, তোমার জন্মকর্ম্মের সার্থকতা সম্পাদনের জন্য সুখ ও দুঃখের প্রয়োজন আছে। এই যে জগৎ কাঁদে, তা' তোমার সুপ্ত চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য, তোমার অমানুষ চিত্তকে মনুষ্যত্বের সাধনায় প্রেরণা দেবার জন্য,—স্বার্থচিন্তায়, পশুভাবে বিমূঢ় হ'য়ে রয়েছ, তোমার সেই মোহমুগ্ধতা ভেঙ্গে দেবার জন্য। আর, এই যে জগৎ হাসে, সে শুধু তোমাকে তার হাসিটীর সঙ্গে যোগ দিয়ে চিত্তের প্রসার বাড়িয়ে নেবার সুযোগ দেবার জন্য। তোমার সুখ-দুঃখ ও তোমার আত্মপ্রস্ফুটনের জন্যই। নিজে যদি দুঃখ না পাও, জগদ্বাসীর দুঃখের গভীরতা বুঝ্‌বে কি ক'রে? দুঃখ পেয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে যদি

না তোমার নিজের বুক চিরে ঝলকে ঝলকে রক্ত বে'র হ'ল, তবে তুমি জগদ্বাসীর কান্নার মর্ম্ম বুঝ্বে কেমন ক'রে ? এই জন্যই সর্ব্বপ্রকার দুঃখকে যে ভোগ করে নাই, নিরন্ন জঠরের যাতনা যে বোঝে নাই, নগ্ন কটীর লজ্জা যে অনুভব করে নাই, অনাবৃত অঙ্গে প্রচণ্ড রৌদ্র আর প্রখর শীত যে সহ্য করে নাই, ছত্রহীন শিরে বর্ষা-বাদলে যে ভিজে নাই, গর্ত্তে প'ড়ে যার পা ভাঙ্গে নাই, প্রিয়জনবিয়োগের গভীর বেদনার যে আস্বাদ পায় নাই, তার পক্ষে ঠিক্ ঠিক্ জগতের সেবক হওয়া প্রায়শই সম্ভব নয়। বিশ্ববাসীর দুঃখকষ্টের পরিমাণ যে কত বেশী, তীব্রতা যে কত অধিক, তা বুঝ্বার জন্য সকল প্রকার দুঃখ, সকল প্রকার বেদনা তোমাকে পেতেই হবে। আর, একটু আধটু সুখও যে মাঝে মাঝে পাও, তা শুধু তোমার দুঃখটার অনুভূতিকে সতেজ রাখবার জন্য। যেখানে দুঃখের পর দুঃখ, ব্যথার পর ব্যথা, কষ্টের পর কষ্ট নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তোমাকে উৎপীড়ন কচ্ছে, সেখানে দুঃখটা স'য়ে যায়, সে তার সমস্তখানি জ্বালার দাগ তোমার বুকের পাঁজরে ধরিয়ে দিতে পারে না। কাঁটা-ফোটার ব্যথা আর বজ্রপতনের ব্যথা সেখানে সমানই লাগে। এইজন্যই সুখানুভূতির আবশ্যকতা। কিন্তু জেনো, এ জগতে সুখটার চাইতে দুঃখটা অধিক সত্য, হাসিটার চাইতে কান্নাটা অধিক সত্য। যাহা সত্য, তাহাই শুভ। এজন্যই দুঃখী হ'য়েই জগতের দুঃখ-ত্রাতারা জন্মগ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, যে গৃহে সাময়িক সুখ-হেতু দুঃখের অনুভূতিটা সর্ব্বদাই টাট্কা ও সতেজ, তেমন মধ্যবিত্ত গৃহেই তাঁরা প্রায়শঃ ভূমিষ্ঠ হন।

শ্রম না করিয়া পারিশ্রমিক

শ্রম না ক'রে পারিশ্রমিক নেওয়ার লজ্জাকে সকলের চ'খের সামনে ধর; আলস্যের যে অপরাধ, তার প্রকৃত গুরুত্বটাকে এদের দিয়ে উপলব্ধি করিয়ে নাও। দেশের প্রকৃত কল্যাণ বাড়াব না অর্দ্ধ ছটাক, অথচ দেশসেবকের সম্মান পাব আঠারো আনা, এই ঘৃণিত মনোবৃত্তি থেকে দেশের কর্ম্মীদিগকে রক্ষা কর।

জাগ্রত মূষিক

সকলের জন্য একই কর্ম্ম-তালিকা করা সম্ভব হ'তে পারে না। সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তি জগতে নৈতিক কল্যাণ, শান্তি, নিঃস্বার্থপরতা প্রভৃতি বিস্তার ক'রে যাবেন।

এটাই তাঁর স্বভাব। রজঃপ্রধান ব্যক্তি নানাদিকে নূতন সৃষ্টিতে মন দেবেন। এটাই তাঁর স্বভাব। এই দুজনকে কোনও কর্ম্মতালিকা দেবার দরকার পড়ে না, এঁরা সজাগ লোক, নিজেদের রুচি ও যোগ্যতা বুঝে নিজেরাই নিজেদের পথ ও প্রণালী ঠিক ক'রে নেবেন। যারা তমঃপ্রধান, পরের উপর নির্ভর করাই তাদের স্বভাব। তাদেরই জন্য কর্ম্মতালিকা সৃষ্টি করার দরকার। কারণ, এরা সব নিদ্রিত কেশরী, জাগিয়ে দেবার জন্য, সিংহ না হউক, অন্ততঃপক্ষে জাগ্রত মূষিক দু-একটা চাই। আমি যদি এরকম সজাগ মূষিক একটা হ'তে পারি, তা' হ'লেই নিজের পক্ষে যথেষ্ট মনে করি। ঐ সেতুবন্ধের কাঠবিড়ালা আমার আদর্শ। রাবণারি শ্রীরামের চেয়ে ঐ কাঠবিড়ালীর মহিমা বেশী। মহাকবির কবিত্ব রামচন্দ্রকে যতখানি অমর করেছে, তূলির একটা তুচ্ছ পোঁচ ঐ কাঠবিড়ালীকে তার চেয়ে বেশী অমর ক'রে রেখেছে।

ত্যাগই অমৃত

ত্যাগই অমৃত, ত্যাগেই ভারতের অভ্যুদয়, ত্যাগেই ভারতের নবজন্ম পরিগ্রহ।

মত-প্রচারক বনাম শিক্ষক

কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট মতের প্রচারক হওয়া সহজ কিন্তু শিক্ষক হওয়া বড় কঠিন। কারণ, শিক্ষকের কাজ হচ্ছে ছাত্রের মনের পরদাটা সরিয়ে দিয়ে তার অন্তর্নিহিত শক্তিপুঞ্জকে প্রকাশিত ক'রে দেওয়া। এ কাজে মতামতের বাড়াবাড়ি নেই, এ কাজে ছাত্রের মনকে অধ্যয়ন করা এবং তার বিকাশ-পথের বাধাগুলিকে দূর ক'রে দেওয়াই প্রধান কথা।

প্রাণায়াম

"যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্"। প্রাণায়ামটা ভগবানের সাথে সাধকের যোগস্থাপনের একটা মস্ত বড় কৌশল। প্রাণায়াম ছাড়াও ভগবৎ-সাধনা হয়, যেমন ঘৃত ছাড়াও ভোজন হয়, ডাল-ভাত খেলেও পেট ভরে, দেহের শক্তি বাড়ে, কিন্তু ঘৃত খেলে দ্রুত বল বাড়ে। প্রাণায়াম হচ্ছে সাধন-জগতের ঘৃত, ভগবৎ-সাধনের "টনিক"। কিন্তু প্রাণায়ামের রকমারী আছে। যার জন্য যে প্রণালী নয়, সে

সেইটী অভ্যাস কল্লে'ই বিপদ। ভেজাল ঘী যেমন অপকারী, কুনির্ব্বাচিত প্রাণায়ামও তেমন অপকারী। কুনির্ব্বাচিত প্রাণায়াম দৈহিক দুর্ল্লক্ষণ ও মানসিক দুর্নিমিত্তের জনক।

কথার তাজমহল

ভগবান্ সাকার কি নিরাকার, তা' নির্দ্ধারণ কর্ব্বার জন্য বিচার-তর্কেরচুল-চেরা লড়াই দিয়ে প্রয়োজন কি ? সাধন কর এবং সাধন-বলে সত্যকে প্রত্যক্ষ কর, গোল আপনি মিটবে। কথার তাজমহল রচনা ক'রে হবে আত্ম-বঞ্চনা আর পর-বিভ্রম। ভগবানকে খুঁজে বের কর,—বাগ্‌বিতণ্ডার পথে নয়, সাধনের পথে। বাক্য-নিপুণতাকে জ্ঞানমার্গ ব'লে ভ্রম ক'রো না। সাধন-বলে সত্যকে আস্বাদন করার নামই জ্ঞান-যোগ। জ্ঞানই বেসুরা প্রাণ-রাগিণীকে সুরলয়-সমন্বিত করে।

ভগবান্‌কে ভোলার দুঃখ

ভগবানকে না পাওয়ার কষ্টের চাইতে তাঁকে ভুলে থাকার কষ্ট যখন শতগুণ বেশী মনে হবে, তখন বুঝ্‌ব ভালবাসা হয়েছে। প্রেমিক ভগবানকেও ছেড়ে দিতে পারে কিন্তু তাঁর স্মৃতিটীকে ত্যাগ কত্তে পারে না। সংসারের সুখ অনিত্য, এই আছে, এই নাই, তার লোভে ভগবানকে ভুলে থাকা প্রেমিকের কাছে বড় কঠিন শাস্তি। ইন্দ্রিয়ের তেজ অহরহ ভোগপথে ক্ষয় পাচ্ছে,—তার প্ররোচনায় ভগবানকে বিস্মৃত হওয়া বড় প্রচণ্ড দণ্ড। যত দীর্ঘকালই জীবন ধারণ কর না কেন, মৃত্যুর গৃহে অতিথি সবাইকে একদিন হ'তেই হবে, যমরাজের দশন-পেষণে চূর্ণীকৃত হ'তেই হবে। কিন্তু ভগবানকে যে ভালবাসে, সে একটী আর্ত্তনাদও না ক'রে হাসিমুখে মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে চলে যায়। ভগবানকে যারা ভুলে থাকে, তারা সেই পেষণের যন্ত্রণায় শুধু ত্রাহি ত্রাহি ক'রে কেঁদেই মরে।

ভগবানকে কে পায় ?

ভগবানের দিকে যখন মন যেতে চায়, তখন প্রেয় এসে শ্রেয়ের সঙ্গে লড়াই জুড়ে দেয়, অসার ভোগলালসা এসে সারাৎসার পরমপদার্থের প্রতি রতিকে নষ্ট কত্তে চায়। অনিত্য কাম্যবস্তু সকল, আশুপ্রীতিকর সুখ-সমূহ নিত্যামৃতরসের প্রতি চিত্তকে বিরূপ ও পরম সুখের প্রতি পরাঙ্মুখ কত্তে চেষ্টা পায়। তখন সব ছেড়ে যে শুধু ভগবানকেই নিয়ে মাটী কামড়ে প'ড়ে থাকতে পারে, তাকেই বলি

বুদ্ধিমান্। প্রলোভন আর ভয়, এই দুটী হচ্ছে ভগবৎ-প্রেমের বাধা। নিন্দা-ভয়, বাধা-ভয় ও মৃত্যুভয় যে জয় করেছে, অভয়-স্বরূপ পরমাত্মাকে সেই পায়। ধনের প্রলোভন, রূপের প্রলোভন, কর্তৃত্বের প্রলোভন যে জয় কর্ত্তে পারে, জ্যোতির্ম্ময়, আনন্দময়, নিত্যনির্ম্মল পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার সেই লাভ করে।

অবিদ্যার প্রভাব

জগদ্ব্রহ্মাণ্ডময় অবিদ্যারই রাজত্ব চলেছে। অবিদ্যা জীবকে তার স্বরূপ ভুলিয়ে রাখ্ছে, ভগবানের কথা বিস্মৃত করিয়ে দিচ্ছে। অবিদ্যা জীবকে আত্মসুখী, ক্ষণসুখী ও অসারসুখী কচ্ছে, ব্রহ্মসুখ, নিত্যসুখ ও সারসুখে বঞ্চিত কচ্ছে। অবিদ্যার বসে জীব কর্ম্ম কচ্ছে আর নিজেকেই কর্ত্তা ব'লে অভিমান কচ্ছে। অবিদ্যার বশে জীব নিজেকে জ্ঞানী ব'লে ভ্রম কচ্ছে, আর, প্রাণপণে খালি অজ্ঞানেরই উপাসনা কচ্ছে। অবিদ্যা-বশীভূত মানব জ্বর-বিকারের চাঞ্চল্যকে উৎসাহ আর ক্ষণস্থায়ী উচ্ছ্বাসকে ব্রহ্মতেজ ব'লে ভ্রান্ত হচ্ছে।

শ্রদ্ধাগমের লক্ষণ

তাঁর প্রসঙ্গ, তাঁর আলোচনা শুনতে যখন কর্ণকুহর মধুময় বোধ হবে, জান্তে হবে, শ্রদ্ধা এসেছে। সতত-নীরব জিহ্বা তাঁর কথা কইতে যখন বজ্রহুঙ্কার কর্ব্বে, বুঝ্তে হবে, শ্রদ্ধা এসেছে। তাঁকে প্রত্যক্ষ দর্শন যে করা যায়, এই কথার প্রত্যয় যখন দৃঢ় হবে, চক্ষু যখন সর্ব্ববস্তুতে তাঁকেই খুঁজে বেড়াবে, দেখ্তে না পেলেও সে হতাশ হবে না, জান্বে, শ্রদ্ধা এসেছে। যদিও শ্রম কখনো ব্যর্থ হয় না, তবু জেনো, শ্রদ্ধাবানের শ্রমের ফল শ্রদ্ধাহীনের শ্রমের শতগুণ।

সাধনে ব্যাকুলতা

হায়, হায়, জীবন ত' বৃথাই ব'য়ে গেল, কিছুই ত' এখনো কর্ল্লাম না, কত সুযোগ কত অনুকূল অবস্থা যে উপেক্ষায় উধাও হয়ে গেল, একটাকেও কাজে আন্লাম না, নিমেষের পর নিমেষ, দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, আর, বর্ষের পর বর্ষ শুধু আলস্যই কর্ল্লাম, আর লভ্যহীন, মঙ্গলহীন, উদ্দেশ্যহীন বাজে কাজেই কাল কাটালাম,—এইরূপ চিন্তা দ্বারা যতক্ষণ না জর্জ্জরিত হচ্ছে, ততক্ষণ

ঠিক্ ঠিক্ সাধন হয় না। জ্বালায় হৃৎপিণ্ড যতক্ষণ না দগ্ধ হচ্ছে, ততক্ষণ সাধনে মন বসে না। চখের জলে যতক্ষণ না বক্ষ ভেসে যাচ্ছে, ততক্ষণ সাধন হয় না, ততক্ষণ সাধন নীরস থাকে। তবু, এই নীরস অবস্থাতেও সাধন ছেড়ে দিও না। যেদিন সতিকার ব্যাকুলতা আস্‌বে, সেদিন যেন শত মত আর শত পথ এসে বিভ্রান্ত না ক'রে দেয়, তার জন্য ব্যাকুলতাহীন জীবনেও সাধনের অভ্যাসকে বজায় রাখ্‌তে হবে।

ব্যাকুলতার মানে আন্তরিক উন্মত্ততা বাইরের উন্মত্ততা, নয়। স্বচ্ছন্দচারী পশুরাজকে পিঞ্জরে বেঁধে রাখলে সে যেমন অধীর হয়, ভগবানের জন্য অন্তরে তেমন অধীর হ'তে হবে। স্তন্যপানরত ক্ষুধার্ত্ত শিশুকে মায়ের কোল থেকে জোর ক'রে টেনে নিলে যেমন হয়, ভগবানের জন্য তেমন অস্থির হ'তে হবে। জীবন্ত মানুষটাকে তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেল্লে সে যেমন ছট্‌ফট্ করে, ভগবানের জন্য তেমন ছট্‌ফট্ কত্তে হবে। তাঁর বিরহে সুখস্বাদু খাদ্য পানীয় বিস্বাদ বোধ হবে, পুষ্পশয্যা কণ্টকশয্যার যন্ত্রণা দেবে, মলয়ানিল অগ্নিদেবের ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাস ব'লে মনে হবে,—এর নাম ব্যাকুলতা। বাইরের ব্যবহারে এই ব্যাকুলতা সিন্ধুকে-পোরা ধন-রত্নের মত লুকিয়ে রাখ্‌তে হবে, কিন্তু তাঁর জন্য অন্তর পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে।

এই ব্যাকুলতা লাভের উপায়,—মহতের অহেতুকী কৃপা, ভক্তের পদরেণু। দ্বিতীয় উপায়,—জীবনের অনিত্যতা স্মরণ এবং নরজন্মের দুর্ল্লভতা সম্বন্ধে অনুক্ষণ চিন্তা। শেষ উপায়,—নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা সহকারে ভগবানের পরমমঙ্গলময় নামের সাধন।

নামে নিষ্ঠা

কথা কইতে কইতে সহসা সকল কথা স্তব্ধ হ'য়ে যাবে, অনাহত নাম সকল ধ্বনিকে ছাপিয়ে দিয়ে নিরন্তর উচ্চারিত হ'তে থাক্‌বে,—এর নাম নামে নিষ্ঠা। ছবি দেখ্‌তে দেখ্‌তে দৃষ্টিশক্তি স্তব্ধ হ'য়ে যাবে, ব্রহ্মাণ্ডময় দৃষ্ট হবে শুধু জ্যোতির্ম্ময় নামের প্রতীক, এর নাম নামে নিষ্ঠা। শ্বাস-প্রশ্বাস চল্‌বে অবিরাম নামের হুঙ্কার বহন ক'রে, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে একটা শ্বাসও বন্ধ্যা যাবে না,—এর নাম

নামে নিষ্ঠা। শরীরের প্রতি রোমকূপ থেকে নামের ধ্বনি যেন সঙ্গীতের ঐক্য-তানের মত প্রাণমন মাতিয়ে অনুভূত হবে,—একে বলে নামে নিষ্ঠা। হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেকটী স্পন্দনে, শিরায় উপশিরায় প্রত্যেকটী রক্তবিন্দুর স্পন্দনে শুধু নামেরই অনুভূতি আস্‌তে থাকবে,—এর নাম নামে নিষ্ঠা। কফ, কাসি, থুথু ফেল্‌বার সময়টাও নামের সঙ্গ পেয়ে পবিত্র হবে, মলমূত্র পরিত্যাগের সময়টাও নাম তার প্রেমময় সৌরভে জগৎ আমোদিত কর্বে, —তবে বলি নামে নিষ্ঠা। স্কন্ধের উপরে শত্রুর উদ্যত অসি, সেই অসির বিঘূর্ণনেও নাম শুন্‌তে হবে। বক্ষের সম্মুখে শত্রুর উদ্যত কামান, সেই কামান-গর্জ্জনেও নাম শুন্‌তে হবে। তালে তালে মার্চ্চ ক'রে পদভারে মেদিনী কাঁপিয়ে রণবাহিনী যাচ্ছে, সেই পদধ্বনিতেও নাম শুন্‌তে হবে। ভূমিকম্পে ধরণী বিদীর্ণা হচ্ছে, তাতেও নামই শুনতে হবে! ঝঞ্ঝার আক্রোশে সৃষ্টি উৎখাত হ'য়ে যাচ্ছে, তাতেও নাম শুন্‌তে হবে। আবাল্যের আশ্রয়-দাতা চিরদিনের বাস-কুটীর আগুনে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে, অগ্নির সেই লেলিহান রসনার ক্ষুধার্ত্ত হুহু শব্দের মধ্যেও নামই শুন্‌তে হবে।—একেই বলি নামে নিষ্ঠা।

নারীর সুশিক্ষা

তোমরাই যদি ছোট হ'য়ে না থাক্‌বে, তবে থাক্‌বে কে? স্ত্রীলোকদিগকে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত ক'রে, তাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের পন্থা-গুলিকে রুদ্ধ ক'রে দিয়ে যে দুষ্কৃতি সঞ্চয় করেছ, তার ঝাল কি প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া মর্‌বে? নারীকে ছোট ক'রে রাখার পাপে তোমাদের আরো অনেক ভুগ্‌তে হবে।

কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলেরই উন্নতি এক পথে,—সত্যের পথে, সুবিচারের পথে, ন্যায় ও ধর্ম্মের পথে। ধর্ম্মের অঙ্গ, সভ্যতার অঙ্গ, ভদ্রতার অঙ্গ ভেবে নারী জাতির জন্য যে কারাকক্ষ রচনা তোমরা করেছ, তাই দেখেই বিধাতা তোমাদের জন্য আবার বৃহত্তর কারাকক্ষের সৃষ্টি করেছেন। তোমরা যে পরমুখাপেক্ষী তার কারণ, তোমাদের নারীরা তোমাদের ঘরে রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি পায়নি, পেয়েছে কাঙ্গালিনীর সাজ।

যে নিজে মূর্খ, সে আবার অপরের কৃতিত্বের মূল্য বুঝ্‌বে কি? তোমাদের নিজেদের শিক্ষার ব্যবস্থাই ত' তোমরা কত্তে চাইছ না। নামের লোভে, যশের লোভে বা নেতৃত্বের লোভে দুটো নৈশ-বিদ্যালয় খুল্‌লেই দেশের সেবা হ'য়ে যায় না। একমন একপ্রাণ হ'য়ে তোমরা নিজেদিগকে উৎসর্গ কচ্ছ কি? না, ফন্দি-বাজি ক'রে খবরের কাগজে জয়ঢাক পিটাচ্ছ? তোমরা স্বার্থপরতা ত্যাগ ক'রেছ কি? কাপুরুষতা পরিহার করেছ কি? আলস্য ও কর্ম্ম-বিমুখতাকে ঝাঁটা-বিদায় করেছ কি? তোমাদের সে চরিত্র-বল কি আছে, যা থাকাতে অর্জ্জুন উর্ব্বশীকে প্রত্যাখ্যান কত্তে পেরেছিলেন? এইরূপ সুদৃঢ় চরিত্রের বল নিয়ে যদি কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়, তবেই কাজ কত্তে পার্‌বে।

স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতির শিক্ষাকে সমান যত্নে চালাতে হবে। সমান অর্থবল, সমান জনবল ও সমান চরিত্রবল নিয়ে দুই দল কর্ম্মীকে সমভাবে কাজ ক'রে যেতে হবে। তোমাদের দিতে হবে নূতন চিন্তা, নূতন আশা, নূতন আকাঙ্ক্ষা। তোমাদের দিতে হবে মানুষের মনে নিজের অসীমত্ব সম্বন্ধে অনন্ত বিশ্বাস।

প্রচলিত ধর্ম্মমত অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ধর্ম্মমত যদি দিতে পার, দিও। প্রচলিত সমাজ-বিধি অপেক্ষা উচ্চতর সমাজ-বিধি যদি চালাতে পার, চালিও। কিন্তু মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম তার নিজ শক্তিতে বিশ্বাস, নিজের ব্রহ্মত্বে বিশ্বাস। এইটুকু যদি দিতে পার, তা হ'লেই সব-কিছু দেওয়া হ'য়ে যাবে। পুরুষেরা নিজেদের পুরুষত্বে বিশ্বাস করুক, নারীরা নিজেদের নারীত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবতী হোক্‌। আত্ম-শ্রদ্ধাই নারীর সতীত্বের গোড়ার কথা।

আত্মশ্রদ্ধাই মনের বল জন্মায়। মনের বল যার নাই, তাকে জোর ক'রে পিঞ্জরে পূরে রাখ্‌লেই সে সতী হ'তে পারে না। নারীকে সেই মনের বল দাও, যাতে সে তার সতীত্বকে সর্ব্বত্র রক্ষা কত্তে পারে। তাকে সৎসাহসের বর্ম্ম দাও। জোর ক'রে কাউকে সতী করা যায় না। নিজের স্বভাবেই নারীরা ধর্ম্মানুরাগিণী হোন, সতীত্বপরায়ণা হোন। সুশিক্ষা তাঁদের স্বভাবকে প্রস্ফুটিত করুক।

নাম কখনও নিষ্ফল হয় না

ভগবৎসাধনে যে শ্রমটুকু কচ্ছ, মনে ক'রো না, তার এক কণাও বৃথা যাচ্ছে।

যতবার ভক্তিভরে ভগবানের নাম স্মরণ কচ্ছ, তত কণা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তোমার কর্ম্মশক্তির তেজ বৃদ্ধি কচ্ছে। তুমি তার খোঁজ না রাখ্‌তে পার, কিন্তু নাম কখনো নিষ্ফল হয় না।

ভাগবদাশ্রয়ী হও

ষোড়শী স্ত্রীকে বক্ষে নিয়ে স্বামী নিদ্রাগত হোক্, বাধা নেই, কিন্তু ধমনীর প্রতি রক্তস্পন্দনে ভাগবত-ঝঙ্কার উঠ্‌তে থাকুক। জীবমাত্রই ভাগবত-রসের আশ্রয়ে জীবন পরিচালিত করুক।

মহতের বাণীর কদর্থবোধ

মহাপুরুষদের মধ্যে একশ্রেণীর আছেন, তাঁরা ভক্তদিগকে অসত্যের প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য ব'লে যান,—"পূর্ণ সত্য নিয়ে আমি এসেছি, এর পরে অনেক চোর সাধুর নিশান উড়িয়ে আস্‌বে, তাদের বিশ্বাস করিস্ না, তারা সব ভণ্ড।" আবার অপর একশ্রেণীর মহাপুরুষ নিজেকে অবতারত্ব থেকে বাঁচাবার জন্য ব'লে যান,—"আমার পরে আরো মহাত্মা আস্‌ছেন, ভগবানের সাক্ষাৎ কৃপা নিয়ে তাঁরা অবতীর্ণ হবেন, সমগ্র জগৎ তাঁদের মান্য কর্ব্বে।" কিন্তু ভক্তদল এই উভয় শ্রেণীর মহাপুরুষদেরই কথার মর্ম্মকে অগ্রাহ্য ক'রে তাঁদের মুখের ভাষাটা অবলম্বন ক'রে নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক অবতারবাদ প্রচারে চেষ্টা করে। ফলং আত্মকলহ, ভেদ, বিসম্বাদ, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ।

যৌগিক পরিভ্রমণ; মন্ত্রদর্শন

যৌগিক পরিভ্রমণটা লিঙ্গমূল থেকে কেন আরম্ভ হ'ল, এ অতি সঙ্গত প্রশ্ন। ভোগসুখী জীবের মন সাধারণতঃ কাম-চিন্তায়ই বিভোর। তাই তার স্বাভাবিক টান থাকে কামেন্দ্রিয়ের দিকে। কামেন্দ্রিয় থেকে মনটাকে তুলে নিতে হ'লে প্রথমে তাকে কামেন্দ্রিয়ে স্থির করাই হ'ল কৌশল। কঠিন কাজ সহজে করার উপায়কেই কৌশল বলে।

যৌগিক কৌশলগুলির মধ্যে কতকগুলি অধ্যবসায়ী যোগীর জীবনব্যাপী পরীক্ষার ফল বা যোগীদের পুরুষ-পরম্পরা গত বহুযুগব্যাপী পরীক্ষার ফল। যেমন, চেষ্টাকৃত প্রাণায়াম, যাতে মাত্রা রেখে পূরক, রেচক, কুম্ভকাদির অনুষ্ঠান কত্তে

হয়। আবার কতকগুলি জিনিষ বিনা চেষ্টা বা প্রার্থনায় শুদ্ধচেতা তপস্বীর নিস্তরঙ্গ মনে ফুটে উঠ্‌ল, যেমন, স্বাভাবিক বা কেবলী প্রাণায়াম এবং অধিকাংশ বীজমন্ত্র।

বীজমন্ত্রগুলি একদল চতুর পুরোহিতের স্বকপোলকল্পিত অর্থহীন অক্ষর নয়। বৈদিক মন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য যে সব দিগ্‌গজেরা তান্ত্রিক মন্ত্রাদিকে স্বার্থান্ধ ব্রাহ্মণের শয়তানী ব'লে বর্ণনা করেছেন, তাঁরাও যতখানি জ্ঞানী, তান্ত্রিক মন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য যাঁরা একাক্ষর মহাবীজ প্রণবের নিন্দা করেছেন, তাঁরাও ততখানি পণ্ডিত। কল্পনার ফলে মন্ত্রাদির আবিষ্কার হয় না, সত্য নাম স্বয়ম্প্রকাশ। ঘোর দুর্য্যোগাচ্ছন্ন অমাবস্যার রাত্রিতে বিদ্যুৎ যেমন অসাধারণ জ্যোতি নিয়ে প্রকাশিত হয়, শুদ্ধচেতা সাধকের নিকট সময়-বিশেষে মন্ত্রও সে ভাবেই আবির্ভূত হন।

মন্ত্র অধিকাংশ সময়ই সাধকের নিকট তার ব্যাকুলতার চরম সীমায় এসে প্রকাশ পায়। কিন্তু এ'কে তার সিদ্ধাবস্থা মনে করা চল্‌বে না। মন্ত্রদর্শনের পরে সেই মন্ত্রের সাধন তাকে কত্তে হয়,—তবে সিদ্ধাবস্থা। সাধন ছাড়া সিদ্ধি নাই।

জগতের অধিকাংশ মন্ত্রদ্রষ্টা পুরুষেরই কোনো গুরু ছিল না। যথা,—গায়ত্রীর দ্রষ্টা ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র। কিন্তু মন্ত্র-দর্শনের পরেও অনেকে গুরু স্বীকার করেছেন। মন্ত্রদ্রষ্টার গুরু শিষ্যকে নূতন কোনও মন্ত্র দান করেন না, তাঁর মন্ত্রই তাঁকে শুনান। যে স্থলে গুরু অন্য মন্ত্র দেন, সেখানে শিষ্য গুরুদত্ত মন্ত্র অগ্রাহ্য ক'রে দৃষ্ট মন্ত্রেরই সাধন ক'রে সিদ্ধত্ব লাভ করেছেন, জগতে এরকম দৃষ্টান্তও আছে।

মন্ত্রদর্শন কোনও পূর্ব্ব-সংস্কারের ফল নয়। মন্ত্রদর্শন হয় নি, অথচ অনেকে মন্ত্রদর্শন হ'ল ব'লে ভ্রম কত্তে পারে। সে স্থলে পরীক্ষা হচ্ছে,—মন্ত্রদর্শন-কালে পঞ্চেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ঐ মন্ত্রকে অবলম্বন ক'রে যুগপৎ হয়েছিল কি না। তখন নামের প্রোজ্জ্বল-সুন্দর রূপ নয়নে ফোটে, নামের মোহন-গম্ভীর নাদ শ্রবণে পশে, নামের অপরূপ স্পর্শ সর্ব্বাঙ্গে অনুভূত হয়, নামের মধ্য হ'তে জগদ্দুর্ল্লভ অতুলনীয় সৌরভ নিঃসৃত হ'য়ে ত্রিভুবন আমোদিত ক'রে, রসনায় অমৃতাস্বাদ অনুভূত হয়।

গুরুমুখে দীক্ষামূলে নাম পেয়ে সে নামের সাধন কত্তে কত্তেও সেই নামের স্বরূপ এভাবেই উপলব্ধি হয়।

অনেকে স্বপ্নেও নাম পান কিন্তু তাকে ঠিক্ মন্ত্র-দর্শন বলে না। স্বপ্নে প্রাপ্ত নাম অনেক সময় পূর্ব্বসংস্কারেরই ক্রিয়া। কিন্তু মন্ত্রদর্শন সাধকের পূর্ণ জাগরণের মধ্যে হয়,—যোগজ নিদ্রার মধ্যেই এক আশ্চর্য্য জাগৃতি আছে, তাতে মন্ত্র-দর্শন হয়।

জপকালীন তন্দ্রা

জপের সময়ে তন্দ্রা আসা তত দোষের নয়, যত দোষের ব'লে মনে মনে ভয় পাচ্ছ। প্রথম সাধকের পক্ষে জপে ব'সে তন্দ্রা না আসাই বরং দোষের। জপ কত্তে কত্তে যখন তন্দ্রা আস্‌বে, তখনই জপ ছেড়ে দিও না। তন্দ্রায় ঢুল্‌তে ঢুল্‌তে এমন একটা সময় আস্‌বে, যখন আপনিই তন্দ্রাটা ছেড়ে যাবে। তখনই নাম জপ কর্ব্বার প্রকৃষ্টতম সময়। এই সময়টার শ্রেষ্ঠ ব্যবহার করা চাই। তন্দ্রা আলস্য বা তামসিকতারই নামান্তর। কারণ তন্দ্রায় দেহ ত' শিথিল হয়ই, বুদ্ধি এবং মনও জড়তা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তন্দ্রা দেখেও যে ভয় পায় না বা হাল ছেড়ে দেয় না, তার তন্দ্রা কিছুকাল পরে আপনি ঘুচে যায় এবং একটা অনির্ব্বচনীয় অতন্দ্রিত জাগ্রদবস্থা লাভ হয়। সেই সময় সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড স্থির, নিস্তব্ধ, প্রশান্ত ব'লে মনে হয়, কাণের কাছে ঢাক পিটালেও গ্রাহ্যে আসে না বা মনশ্চাঞ্চল্যের কারণ হয় না। সেই প্রশান্তির সুযোগে দৃঢ়-বিক্রম সহকারে যে অবিশ্রান্ত জপ চালায়, সেই প্রকৃত বুদ্ধিমান্।

প্রথম সাধকের তন্দ্রার সময়টা দীর্ঘই হয়। কিন্তু ক্রমশঃ অভ্যাসের দ্বারা এই তন্দ্রিত অবস্থার দৈর্ঘ্য কমে এবং অতন্দ্রিত অবস্থা দ্রুত আসে। প্রথম সময়ে অতন্দ্রিত অবস্থাও দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না, ক্রমশঃ অভ্যাসের দ্বারা তার দৈর্ঘ্য বাড়ে।

বক্তৃতা, চরিত্র ও নেতা

লক্ষ লক্ষ বক্তৃতা যা কত্তে পারে না, মানুষের চরিত্রবল তার শতগুণ প্রভাব বিস্তার করে। নেতাদের যুক্তিবলে যত লোক তাঁদের বাধ্য হয়, চরিত্রবল তার

সহস্রগুণ লোককে বশীভূত করে। যাঁর যুক্তি স্পষ্ট বুঝি না, তাঁরও চরিত্র-বলের কাছে সন্দিগ্ধ মনের সকল অবিশ্বাস দূর হ'য়ে যায়। এই জন্যেই চরিত্রবল থাকাই নেতৃত্বলাভের প্রধানতম যোগ্যতা। যে-কেহ মানবের মনকে নীচতা হ'তে উচ্চতায় টেনে নেন, তিনিই নেতা। এক ভগবান্, তাঁর কত রূপ জানো? কৃষ্ণরূপে তিনি মুরলীধর, বিষ্ণুরূপে তিনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, সরস্বতীরূপে তিনি বীণাবাদিনী, দুর্গারূপে তিনি দশপ্রহরণধারিণী। তেম্‌নি বিভিন্ন কর্ম্মপন্থাকে উপায় বা অস্ত্ররূপে ধারণ ক'রে বিভিন্ন নেতার আবির্ভাব হচ্ছে। মুরলী, বীণা, শঙ্খচক্র বা দশপ্রহরণের পার্থক্য যেমন কৃষ্ণ, বিষ্ণু, সরস্বতী বা ভগবতীর দেবত্ব নষ্ট করে নি, কর্ম্মপন্থার পার্থক্যও যেন তেমন নেতাদের দেবত্ব নষ্ট না করে, তাঁদের চরিত্রের শুভ্রতাকে কলঙ্কিত না করে, তাঁদের সত্যানুরাগকে ধ্বংশ না করে, তাঁদের পবিত্রতাকে বিপর্য্যস্ত হ'তে না দেয়। রাজনীতির ক্ষেত্রেই হোক্, আর যে ক্ষেত্রেই হোক্, নেতাদেরই সর্ব্বাঙ্গে যদি থাকে বিষ্ঠার প্রলেপ, জাতির সাধারণ লোকদের অবস্থা কি হবে, ভেবে দেখ দেখি?

সমাজের শত্রু

কোনো একটা শ্রেণীবিশেষকে সমাজের শত্রু ব'লে গালি দেওয়া সঙ্গত নয়। কারণ, ষোল আনা শত্রু কোনো শ্রেণীই নয়। ষোল আনা শত্রু যে, তার অস্তিত্বই অসম্ভব। প্রত্যেক শ্রেণীই এক হিসাবে সমাজের শত্রু, অপর হিসাবে সমাজের বন্ধু। প্রকৃত সমাজ-সংস্কারক তার শত্রুতার দিক্‌টা কমিয়ে বন্ধুতার দিক্‌টা বাড়াতে চেষ্টা কর্ব্বেন। ধনীরা এক হিসাবে সমাজের শত্রু। সমস্ত দরিদ্রের ধন এসে তাদের সিন্ধুকে জমা হচ্ছে, তাঁরা ইচ্ছা কল্লেই সে অর্থ এমন ভাবে ব্যয় কত্তে পারেন, যাতে তাঁদেরও ইহ-পরকালের কল্যাণ হয়, দরিদ্রেরও দুঃখ ঘোচে। আবার দরিদ্রেরা এই হিসাবে সমাজের শত্রু যে, শুভাকাঙ্ক্ষীরা সহস্র চেষ্টা কর্ল্লেও তাদের অধিকাংশকে শ্রমশীল, আত্মোন্নতিতে উৎসাহী এবং জ্ঞানার্জ্জনে উৎসুক কত্তে পারে না। অবিবেচনার জন্য ধনীরা সমাজের শত্রু, আবার অজ্ঞানতার জন্য দরিদ্রেরা সমাজের শত্রু। গুরু-পুরোহিতেরা সমাজের শত্রু এই হিসাবে যে, তাঁরা এসে মাঝখানে জুটে পড়াতে যজমান ভগবানের সঙ্গে নিজের প্রত্যক্ষ

যোগ-সাধনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অধিকাংশ সময়ে উদাসীন। আর, যজমান সমাজের শত্রু এই হিসাবে যে, গুরু-পুরোহিত শ্রেণীর মধ্যে মাঝে মাঝে দিব্য প্রতিভা নিয়ে কেউ কেউ যখন আবির্ভূত হন যজমান-শ্রেণীকে যথার্থ মঙ্গল প্রদান কত্তে, প্রচলিত অজ্ঞানের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে, সৎপথ দেখাতে, তখন তারা কথায় কর্ণপাত করে না, তাদের হয় মদিনায় তাড়া করে, নয় ক্রুশে বিদ্ধ করে, নয় মাথায় কলসীর কাণা ভাঙ্গে। পুলিশ এই হিসাবে সমাজের শত্রু যে, সে চোর ধর্‌তে গিয়ে সাধুকেও তাড়া করে, উৎপীড়িত করে। আবার আইন-ভঙ্গকারী এই হিসাবে সমাজের শত্রু যে, সমাজের হিতকল্পেও যখন তারা কোনো অন্যায় আইনের প্রতিরোধ কত্তে অগ্রসর হয়, তখন তাদের কাজের জন্য অনেক নিরপরাধ লোকও উৎপীড়িত হয়। সমষ্টিকে সংশোধন করা কঠিন কথা,—এজন্য ব্যষ্টিকে ধ'রেই সংশোধনী নীতি ব্যাপকভাবে চালান আবশ্যক।

আপনার-জন কে ?

কেউ আমার ইষ্ট-নাম গ্রহণ কল্লেই আমরা তাকে আপনার-জন ব'লে স্বীকার করি, কিন্তু আমার ইষ্ট-নাম পেলেই কি তোরা আপন হ'লি. যদি নাম তোদের জীবনকে আমূল পরিবর্ত্তিত ক'রে না দিল ? তুই আমার আপন কখন ? যখন তোর ভিতরে আমি আমাকে দেখ্‌ব, আমার জ্ঞানকে, তপস্যাকে. ব্রত-সাধনাকে, সিদ্ধিকে তোর ভিতরে উপলব্ধি কর্ব্ব। তুই আমার তখনই আপন, যখন আমার ত্রিলোক-কল্যাণী ইচ্ছা তোর ভিতরে কাজ কর্ব্বে, আমার চেষ্টা তোর ভিতরে গিয়ে বিস্তার পাবে। আমি তোর আপন কখন ? যখন তুই তোকে, তোর জ্ঞানকে, তোর তপস্যাকে, তোর অস্তিত্বকে আমার ভিতরে দেখ্‌বি, যখন তোর ইচ্ছা, তোর সঙ্কল্প, তোর চেষ্টা আমার ভিতরে রূপ পাবে। বাহ্যতঃ তুই আর আমি ত' দুই জন। কিন্তু নামের সাধন তোমাকে আর আমাকে এক ক'রে দেবে। তাই সমনামী বা সহনামীকে আপনার-জন বলি।

গুরু-ঋণ শোধ

মাতৃঋণ, পিতৃঋণ, গুরুঋণ কেউ শোধ কত্তে পারে না। তাই ব'লে কি কৃতজ্ঞতাও দেখাব না ? এই কৃতজ্ঞতা দেখাবার জন্যেই বার্দ্ধক্যে পিতামাতাকে

প্রাণান্ত যত্নে প্রতিপালন কত্তে হয়, মৃত্যুর পরে পিণ্ডোদকাদি দিয়ে তাঁদের তুষ্টিকামনা কত্তে হয়। গুরুদক্ষিণা দানের চেষ্টাও এই কৃতজ্ঞতার রূপান্তর।

এক এক গুরু এক এক প্রকারের দক্ষিণা পেয়ে খুসী হন বা শিষ্যকে কৃতজ্ঞ ব'লে মনে করেন। কারো দক্ষিণা রত্ন, কারো কাঞ্চন, কারো ভূমি, কারো বস্ত্র, কারো ধান্য, কারো গবাদি পশু। কিন্তু আমি তোদের নিকটে এর একটীও চাই না। আমি চাই শিষ্যের যতটুকু শক্তি আছে, ততটুকু দিয়েই জগতের অস্থিমজ্জাক্ষয়কারী অব্রহ্মচর্য্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা।

অভিক্ষার অর্থ

অভিক্ষাকে ব্রতরূপে গ্রহণ কত্তে গিয়ে এই কথাটী মনে রাখ্‌তে হবে যে, এই ব্রত স্বাবলম্বন-সাধনার ব্রত, কিন্তু অহঙ্কার-বৃদ্ধির, দর্পদম্ভ-বৃদ্ধির ব্রত নয়। অভিক্ষা যদি কারো প্রতি তোমার অবজ্ঞা আনে, তবে জান্‌বে, তুমি অভিক্ষার spirit (মর্ম্ম) বুঝ নাই। অভিক্ষার মানে হ'ল—"আমি যতটুকু শ্রম কর্ব্ব, তার স্বাভাবিক ফলটুকুর অতিরিক্ত প্রত্যাশা কর্ব্ব না।" অভিক্ষার প্রাণ হ'ল ভগবানে বিশ্বাস। মহৎ কাজেই যদি নেমে থাকি, ভগবানের কি চোখ নাই, তিনি কি কাণা না অন্ধ? সময়মত যখন যা প্রয়োজন, তিনি দেবেনই,—আমার উপর পরিশ্রমের ভার পড়েছে, শ্রমই আমাকে ক'রে যেতে হবে, কারো কাছে আমি অর্থ চাইব না।

শাস্ত্র-পাঠের উদ্দেশ্য ও নিয়ম

মনুষ্য-জন্মের সার্থকতা ভগবানকে ভালবাসায়। ভালবাস্‌তে পারাই তাঁকে পাওয়া, ভালবাসাই তাঁকে জানা, ভালবাসাই তাঁতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং নিজেকে তাতে প্রতিষ্ঠিত করা। বেদ, পুরাণ, গীতা, ভাগবত কণ্ঠস্থ কল্লেই জীবন সার্থক হয় না, যদি তাঁর প্রতি না প্রেম উপজে। নিরক্ষর মূর্খ থে'কেও জীবন সার্থক হয়, যদি এক কণা বিশুদ্ধ প্রেম হৃদয়-কোণে স্পর্শ দেয়। মনোহর বাক্য ও ভাবগর্ভ কবিতাবলির রচনা বা আবৃত্তি মানুষকে সার্থকতা দেয় না, যদি প্রাণে প্রেম না আসে।

অবশ্য বেদ, পুরাণ, গীতা, ভাগবত প্রভৃতির পাঠকে অনাবশ্যক বল্‌ছি না,

প্রাচীনকালের কুসংস্কারগ্রস্ত একদল বৃদ্ধ গঞ্জিকাসেবীর উর্ব্বর মস্তিষ্কের অলস কল্পনা ব'লে উড়িয়ে দিতেও বল্‌ছি না। শাস্ত্রও পড়্‌তে হবে, শাস্ত্রের মর্ম্মও জান্‌তে হবে, কারণ এ সবে ভগবৎ-প্রেমিক ভগবদ্দর্শী মহাত্মাদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিই নানা রূপে নানা রসে নানা ভঙ্গীতে প্রকাশিত হ'য়েছে। শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে পাঠ কর্ল্লে সকল রূপকের আবরণ ছিন্ন হ'য়ে যায়, সিদ্ধপুরুষদের সিদ্ধবাণী পাঠকের সমক্ষে উন্মুক্ত হয়, তার প্রাণের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে নিষ্কলুষ দিব্য প্রেমের মোহন মুরলী বাজ্‌তে থাকে। পাণ্ডিত্য-প্রয়াসীর চিত্ত শাস্ত্র পাঠে যেমনই শুধু বাক্যের ভারবর্দ্ধন করে, শ্রদ্ধাবান্ সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তির চিত্তে তেমনি জ্ঞান-রাজ্যের দিব্য লীলার আরম্ভ হয়।

পণ্ডিত যদি হ'তে চাও, যেমন ভাবে খুসী তেমন ভাবে শাস্ত্র পড়, আট্‌কাবে না। কিন্তু সত্য জ্ঞানে যদি প্রতিষ্ঠিত হ'তে চাও, ভগবৎ-প্রেম লাভ ক'রে ধন্য যদি হ'তে চাও, তাহ'লে শাস্ত্র-পাঠকে একটা ব্রতস্বরূপ গ্রহণ কত্তে হবে। শাস্ত্রের প্রতি, শাস্ত্র-প্রণেতার প্রতি, শাস্ত্র-ব্যাখ্যাকারদের প্রতি এবং শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিদের প্রতি সমালোচনা-বুদ্ধি পরিত্যাগ ক'রে প্রথমতঃ অন্তরে এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত ক'রে নিতে হবে যে, এর ভিতরে সত্য আছে এবং সেই সত্য আমাকে, বাক্য-বিচারের শক্তি দ্বারা নয়, একাগ্র সাধনের দ্বারা আয়ত্ত কত্তে হবে। শ্রদ্ধাহীন হ'য়ে বা বিরুদ্ধ বুদ্ধি নিয়ে যারা শাস্ত্রপাঠ করে, সমগ্র জীবন সমুদ্র-মন্থন ক'রেও তারা একটা ঝিনুক বা ভাঙ্গা শঙ্খ সংগ্রহ কত্তে পারে না, অমৃত ত' দূরের কথা। শাস্ত্রপাঠকারীকে নিয়মিত পাঠ কত্তে হয়, একটী দিনও যাতে শাস্ত্রানুশীলন বাদ না পড়ে, তার চেষ্টা কত্তে হয়। পাঠকালে শুদ্ধ, শান্ত, বিতর্কবুদ্ধিহীন, অজিগীষু এবং একাগ্র হ'তে হয়।

শাস্ত্রের শ্লোকের সরল ব্যাখ্যাই যেখানে সংশয়-চ্ছেদন করে, সেখানে কূট অর্থ বর্জ্জন কত্তে হয়। উদার ও সর্ব্ব ধর্ম্মমতালম্বীদের প্রতি অবিরোধী ব্যাখ্যা যেখানে সম্ভব, সেখানে সঙ্কীর্ণ ব্যাখ্যা পরিত্যাগ কত্তে হয়। যেখানে বিভিন্ন শাস্ত্র-বচনের মধ্যে বিরোধ লক্ষিত হয়, সেখানে বিরোধের মীমাংসক অন্য কোন suggestion (ইঙ্গিত) ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে বিশ্বাস ক'রে আপাততঃ তর্ক ছেড়ে দিয়ে অগ্রসর

হ'তে হয়। অর্থাৎ শাস্ত্রের উপদেশকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত positive ভাবে নিজ জীবনের উপরে নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ কত্তে পার, ততক্ষণই তুমি লাভবান্। যেখানে তা পেরে ওঠ না, সেখানে শাস্ত্র-বাক্য ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত সেই বিচারের তোমার প্রয়োজন নেই। শাস্ত্রবাক্যের যতটুকু তোমার সাধন-প্রাপ্ত প্রত্যক্ষের তালে তালে পা ফেল্‌ছে, ততটুকু তোমার পক্ষে অকাট্য। শাস্ত্র-বাক্যের যে অংশ তোমাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি লাভে প্রেরণা দিচ্ছে, সে অংশ তোমার নয়নের মণি-স্বরূপ। বাকী অংশ ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত, তা বলা অনধিকার-চর্চ্চা। বল্‌তে পার, তুমি তা বুঝ্‌তে পার নি বা ঐটুকু তোমার জন্য নয়।

মনে রাখ, দীর্ঘ জীবন লাভই তোমার উদ্দেশ্য নয়, সত্য জীবন চাই। অর্থ সম্পদ লাভই তোমার উদ্দেশ্য নয়, জ্ঞান-সমৃদ্ধ, প্রেম-সমৃদ্ধ পবিত্র জীবন চাই। মান, যশ, কীর্ত্তি ও প্রতিভা-সমন্বিত সর্ব্বজনপূজিত খ্যাতিমান্ জীবন লাভই তোমার উদ্দেশ্য নয়, ভগবৎ-পাদপদ্মে অকপটে আত্ম-সমর্পণই তোমার উদ্দেশ্য। এই মহৎ উদ্দেশ্যের সংসাধনকল্পে সম্বল সংগ্রহ করাই শাস্ত্রপাঠের একমাত্র উদ্দেশ্য।

নারীর দেবীত্ব ও তাহার বিকাশের উপায়

নারীরও একটা মর্য্যাদা আছে, গৌরব আছে। সে মর্য্যাদা তার মানুষত্বে নয়, তার দেবত্বে। নারী যখন স্নেহ করে—নিজের স্বার্থে নয়, পরসুখার্থে, তখন সে দেবী। নারী যখন ক্লেশ স্বীকার করে—নিজ-সুখার্থে নয়, পরসুখার্থে, তখন সে দেবী। নারী যখন বুকের মাঝে চিতার আগুন জ্বালে—নিজসুখার্থে নয়, পরসুখার্থে, তখন সে দেবী। আর যখন সে নিজের সুখের জন্য পাগল হয়, নিজের সুখের অভাবে কাতর হয়, তখন সে দেবী নয়, মানবী। মানবীত্ব নারীর গৌরব নয়,—নারীর প্রকৃত গৌরবের মূর্ত্তি ফুটে ওঠে তখন, যখন সে দেবী হয়।

এই দেবীত্বের দুয়ার খোল্‌বার উপায় হচ্ছে ভগবানের নাম। যে যত ভগবানকে ডাকে, ভগবানের জন্য উতালা হয়, তার তত স্বার্থবুদ্ধি কমে, হীনতা, নীচতার অবসান হয়, পরদুঃখে প্রাণ গলে, হৃদয়ের প্রসার বৃদ্ধি পায়। যে যত ভগবানের দিকে অগ্রসর হ'তে চেষ্টা করে, তার তত ক্ষুদ্র সুখের কামনা, নীচ

ভোগের বাসনা, হীন চরিতার্থতার লোভ ক্ষয় পেতে থাকে, তার চরিত্র তত উজ্জ্বল হয়, তার চিত্ত তত দীপ্তিশালী হয়, তার সংযমের শক্তি তত বাড়ে।

জনক ঋষির আবির্ভাব বিনা তপস্যায় অসম্ভব

আমি যথার্থ সন্ন্যাসীর শক্তিতে অতিশয় আস্থাবান্, সংযত গৃহীর শক্তিতেও আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। কিন্তু দেশে আদর্শ সংযত গৃহী জন্মাবার আয়োজন না ক'রে গার্হস্থ্যের মহিমা-কীর্ত্তনে কোনও লাভ হবে না। বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিয়ত কায়মনোবাক্যে কামসেবা ক'রে, নিয়ত বীর্য্যক্ষয় ক'রে, নিয়ত কদাচারে লিপ্ত থেকে হঠাৎ বিয়ের মন্ত্র পড়্তে না পড়্তেই দেশের নন্দদুলালেরা একেবারে রাজর্ষি জনক হ'য়ে পড়্বেন, এমন অসম্ভব কল্পনা আমি করি না।

জীবনের বীরত্ব

চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করার মধ্যে কোনও বিশেষ বীরত্ব নেই। কিন্তু এই জীবনটাকে পবিত্র রাখাই এক বিপুল বীরত্ব।

বিবাহ ও আর্য্যপথ

বিবাহিত হ'য়ে তারপরে আত্মজীবন-গঠন আর্য্যপথ নয়। জীবনটাকে সর্ব্বপ্রকারে কঠোর সংগ্রামের উপযুক্ত ক'রে গ'ড়ে তুলে তারপরে বিবাহই হচ্ছে আর্য্য-পথ।

দীক্ষামন্ত্রের বৈপ্লবিক শক্তি

এক একটা রাষ্ট্র-বিপ্লব ভারতে যে পরিবর্ত্তন এনেছে, এক একটা দীক্ষা-মন্ত্র তার শতগুণ অধিক আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন আন্তে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু তার ইতিহাস কখনো লেখা হয় নি।

মানুষের ভগবান্

যাকে মানুষ তার সবখানি দিয়ে ভালবাস্তে পারে, সেই তার ভগবান্, এখন সে ভালবাসার বস্তুটী ইট, কাঠ, মানুষ, গরু, দেবতা বা দেশ যাই হোক্ না।

সমাজ-সংস্কার ও জাতিভেদ

সামাজিক জীবন যারা যাপন কর্ব্বে, তাদের পক্ষে, কল্যাণ-বিরোধী না হ'লে সমাজের চলিত নিয়ম মেনে চলাই সঙ্গত, অথবা নিয়ম অতিক্রম ক'রে চল্তে

হ'লেও আস্তে আস্তে অগ্রসর হওয়াই উচিত। নইলে নিজের সাথে সমগ্র সমাজকে উন্নতির পথে টেনে নেওয়া যায় না।

নিজ স্বাধীন বুদ্ধি যাকে অন্যায় ব'লে বুঝ্‌তে পাচ্ছে, তাকে বর্জ্জন করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু এই বর্জ্জনে, প্রেরণাটা আস্‌ছে কোথা হ'তে, তাও দেখ্‌তে হবে। যদি সমাজের কল্যাণকামনা থেকে অন্যায়-বর্জ্জনের বুদ্ধি এসে থাকে, তবে সমাজেরই কল্যাণের জন্য, বর্জ্জনটা কি শনৈঃ শনৈঃ হবে না একদিনে হবে, তাও ভাব্‌তে হবে। সমাজের উন্নতি যার কাম্য হবে, তার পক্ষে সমাজের মধ্যে থেকে কাজ করার চেষ্টাটাই সহজে সফল হয়। সমাজকে ত্যাগ ক'রে গেলে সমাজও তোমাকে ত্যাগ কত্তে পারে বা তোমার উপদেশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হ'তে পারে।

সমাজের সংস্কার খুব বড় কথা। এত বড় কথা যে, যার সকল স্বার্থচিন্তা দূর হয় নি, লোকের নিকটে প্রত্যাশা-পরায়ণতা যার ধ্বংস হয়নি, তার কাছে মূলসূত্র ধরা পড়ে না। একটা অল্পবুদ্ধিমান্ নিঃস্বার্থ ব্যক্তি একটা মহাবুদ্ধিমান্ স্বার্থপর ব্যক্তির চাইতে সমাজ-সংস্কার কার্য্যের অধিকতর যোগ্য। কারণ, সমাজের প্রকৃত দুঃখের উদ্ভব বুদ্ধির অভাব থেকে নয়, একমাত্র অবিচারই এই দুঃখের মূল। অবিচার স্বার্থপরতা থেকেই অধিক জন্মায়। ভুল বুঝে জগতে যে কয়জন লোক অবিচার করে, তার চাইতে লক্ষকোটিগুণ বেশী লোক বুদ্ধির বলে সব বুঝে-সুঝেও একমাত্র স্বার্থ হাসিল করার উদ্দেশ্যে অবিচার করে। এই অবিচার দূর করার নামই সমাজ-সংস্কার।

বর্ত্তমান জাতিভেদে সেই স্বার্থজ অবিচার অত্যন্ত অধিক। তাই সমাজ-সংস্কারকের পক্ষে জাতিভেদের বিরুদ্ধে অভিযান করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু জাতিভেদ ভাঙ্গ্‌তে গিয়ে যদি সমাজ-সংস্কারকেরা হিন্দু-সমাজের দ্বারা বর্জ্জিত নূতন জাতিতে পরিণত হন, তাহ'লে জাতিভেদ ত' দূর হল না, বরং বাড়্‌ল।

নূতন জাতি সৃষ্টি কঠিন হ'লেও অসম্ভব নয়। স্বল্পসংখ্যক স্বার্থবুদ্ধিহীন অকপট কর্ম্মী যদি নেতাগিরির লোভ পরিত্যাগ ক'রে নিজেদের সকল শক্তি একত্র ও কেন্দ্রীকৃত করে, তাহ'লে চক্ষের পলকে নূতন জাতির পত্তন করা যায়। কাশ্মীর-কান্দাহার, ব্রহ্ম-বঙ্গদেশ, তিব্বত-ভুটান, বোম্বাই-মাদ্রাজ প্রভৃতির

শ্রেষ্ঠ দেহ, শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্ক, শ্রেষ্ঠ মন ও শ্রেষ্ঠ সাধনা পুঞ্জিত ক'রে নূতন জাতি সৃষ্টি আমি অসম্ভব মনে করি না। কিন্তু এই নবজাতির জাতিত্বের ধারাকে যদি নৈতিক পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত রাখার বংশানুক্রমিক ব্যবস্থা না কত্তে পার, তাহ'লে এ'দ্বারা দেশকে খুব বেশী লাভবান করা যাবে না। ভারতের বর্ত্তমান মুসলমান জাতিটা ত' হিন্দুসমাজের সকল শ্রেণী থেকে নির্ব্বিচারে-গৃহীত ব্যক্তিদেরই বংশধরদের সম্মিলন! হিন্দুর বংশধরেরাই মুসলমান জাতিতে রূপান্তরিত হ'য়ে একটা অখণ্ড বস্তুতে পরিণত হ'য়েছে,—কে ব্রাহ্মণের বংশধর আর কে চণ্ডালের বংশধর, চিন্‌বার উপায় নেই। কিন্তু এই অভিনব জাতিত্ব মানুষ হিসাবে তাদের কি মঙ্গল দিয়েছে, তাও হিসাব কর। জেলখানার কয়েদিদের তালিকা দেখ্‌লেই সব বুঝ্‌বে। জাতিভেদ-বিচ্ছিন্ন বাইশ কোটি হিন্দু যতখানি অপরাধ * করে, যতখানি জেল খাটে, যতখানি ঘানি টানে, জাতিভেদহীন আট কোটি মুসলমান সংখ্যায় প্রায় এক তৃতীয়াংশ হ'য়েও তার চেয়ে বেশী অপরাধ করে কেন, বেশী জেল খাটে কেন, বেশী ঘানি টানে কেন? জাতিভেদ দূর হ'লেই দেশের মঙ্গল হয় না, যদি জাতির অপরাধ-প্রবণতা কমাবার কোনো ধারাবাহিক ও পদ্ধতিপদ্ধ সুব্যবস্থা না থাকে।

স্বদেশপ্রেম থাক্‌লেই দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া যায়, সামাজিক জাতিভেদ তার বাধা হয় না। প্রেমটাই প্রধান কথা। দেশ মানে দেশের মানুষ, দেশের পশু, দেশের বৃক্ষ, দেশের লতা। দেশ কথাটার সব চাইতে বড় মানে—তোমার স্বদেশ-ভক্ত আত্মা।

আবার যত নূতন সম্প্রদায়েরই সৃষ্টি হোক্, তাতে দেশের ক্ষতি হয় না, যদি সম্প্রদায়গুলির মূল লক্ষ্য দেশপ্রীতির বিরোধী না হয় এবং সম্প্রদায়ের আভ্যন্তরাণ পবিত্রতাকে অটুটভাবে রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা থাকে। দেশকে যদি ভালবাস আর সাম্প্রদায়িক সমাজের মধ্যে চারিত্রিক পবিত্রতাকে রক্ষার জন্য যদি গোড়া থেকেই বদ্ধপরিকর হ'য়ে থাক, তবে তোমরা একটা কেন, শত-সহস্র নূতন সম্প্রদায় গড় না, ক্ষতি নেই।

---

* এস্থলে রাজনৈতিক অপরাধের কথা বলা হইতেছে না। কারণ, চরিত্রবান্ সমাজ হইতেই রাজনৈতিক বন্দিদের সংখ্যাবৃদ্ধি সাধারণতঃ দেখা গিয়া থাকে। সম্পাদক

তোমরা সত্যের উপাসক, মিথ্যার বর্জ্জন-কারী। তাই তোমরা কিছুতেই জন্মগত জাতিভেদের অবিচার সহ্য কত্তে পার না। অথচ হিন্দু-সমাজের বৈরী হ'লেও তোমাদের চল্‌বে না। এই স্থলে তোমাদের কিছু কৌশল অবলম্বন কত্তে হবে।

কৌশল মানে কর্ম্মের পটুত্ব। কৌশল মানে Deplomacy নয়। চালবাজি দিয়ে বড় কাজ হয় না, বড় কাজের জন্য অকপট সত্যের পথই পথ, মিথ্যা ও কাপট্যের পথ বিপথ। বুদ্ধির বলে এই কৌশলকে তোমরা লাভ কর্ব্বে না, সাধনের বলেই তা লব্ধ হবে। অসাধক মহাপণ্ডিতের চেয়ে এ ক্ষেত্রে অপণ্ডিত সাধক ব্যক্তি অনেক বেশী কৃতিত্ব দেখাতে পার্ব্বেন।

স্ত্রীজাতির উন্নতিও এক মস্ত বড় কথা। স্ত্রী-জাতিকে অমানুষ থাক্‌তে দিলে চল্‌বে না। স্ত্রী-জাতির মধ্যে এমন শিক্ষার বিস্তার কত্তে হবে যেন ধীরে ধীরে বর্ত্তমান পুরুষদের মত-পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে দাঁড়ায়।

তোমাদের কন্যাদিগকে অস্ত্রবিদ্যা, ব্যায়াম, অশ্বারোহণ, বিপদে আত্মরক্ষা, আততায়ি-শাসন প্রভৃতির সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিক্ষা কুমারী-আশ্রম হ'তেই দিয়ে ঠিক অনুরূপ সুশিক্ষিত সাধক যুবকের সাথে বিবাহের ব্যবস্থা করা দরকার হবে। যদি এমন যোগ্য যুবক না মিলে, তাহ'লে বালিকা বরং সমগ্র জীবন কুমারী থাক্‌বেন, তবু অযোগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ কর্ব্বেন না।

দেশের নিঃসন্তানা বাল-বিধবাদের মধ্যে যাঁরা পুনর্ব্বিবাহে ইচ্ছুকা নন, তাঁদের উপযুক্ত ভাবে সুশিক্ষিতা ক'রে দেশব্যাপী স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের কাজে লাগিয়ে দিতে হবে। এঁদের উদ্দেশ্যই হবে নারীর আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা।

বহু পিতামাতা আছেন, যাঁরা বহু সন্তানের ব্যয় বহন কত্তে পারেন না বা সন্তান ইচ্ছা করেন না, কেউ নিতে চাইলে চিরতরে দিয়ে দেন। এমন সন্তান-গুলিকে সংগ্রহ ক'রে এনে তাদের দ্বারা সময়ের গতি বুঝে কোনও কোনও শ্রেণীর লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি করা অসম্ভব নয়। এই stepটা খুব difficult হ'তে পারে, এই মাত্র।

নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায়ে বহু পুরুষ কন্যাশুল্কের অভাবে আজীবন, কেউ বা চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, অবিবাহিত থাক্‌তে বাধ্য হয়। ধর্ম্মের বলে এদের সবাইকে আত্মসাৎ ক'রে এবং শিক্ষার বলে এদের ভিতরে মনুষ্যত্বের প্রকাশ-সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দিয়ে তারপরে আর্থিক সাহায্য দিয়ে বা উপযুক্তা পাত্রী সংগ্রহ ক'রে দিয়ে এদের ক্ষয়িষ্ণুতা নিবারণ কত্তে হবে।

ব্রহ্মদেশে এরকম একটী জাতির সৃষ্টি হ'য়েছে। জাতিটির পরিচয় কায়স্থ ব'লে, কিন্তু না মিশেছে এমন জাত নেই। হিন্দুর পূজা-পার্ব্বন, গুরু-পুরোহিত সব এরা বজায় রেখেছে।

বাংলা দেশে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আর পাঁচ জন ক্ষত্রিয় এসেছিলেন কান্যকুব্জ থেকে। লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ-কায়স্থ জন্মাল কি ক'রে? ব্রহ্মেও সেই ভাবে নূতন হিন্দু-সমাজ সৃষ্টি হয়েছে।

বিবাহ ব্যতীত সন্তান জন্মালে তাকেই বলে বর্ণসঙ্কর। ভিন্ন জাতীয় বর-কন্যার যদি বিবাহ শাস্ত্র-মতে হয়, তা হ'লে সে বিবাহ-জাত সন্তানকে শাস্ত্রকারেরা বর্ণসঙ্কর বলেন নি। বর্ণসঙ্কর কথাটার প্রকৃত মানে জারজ অর্থাৎ স্বামী ব্যতীত অপরের ঔরসে জাত। স্বামীর ঔরসে জাত সন্তান হ'লে তাকে বর্ণসঙ্কর বলে না,—স্বামিস্ত্রীর জন্মগত জাতিত্বে আকাশ পাতাল পার্থক্য থাক্‌লেও না।

বড় বড় পণ্ডিতের বড় বড় ভুল! ব্রাহ্মণ ভৃগুর ঔরসে আর ক্ষত্রিয়া রেণুকার গর্ভে জমদগ্নির জন্ম, তাঁকে কেউ বর্ণসঙ্কর বলেন নি। অর্জ্জুন যে গীতার প্রথম অধ্যায়ে বর্ণসঙ্করের ভয় করেছিলেন, সেটা তাঁর "কুলস্ত্রী দূষিতা হবে" এই আশ-ঙ্কার পরে। স্ত্রীরা অসতী না হ'লে বর্ণসঙ্কর জন্মে না, অর্থাৎ 'বর্ণসঙ্কর' কথাটা জারজ কথাটার প্রতিশব্দ। পতি ব্যতীত মিলন হ'লে সবর্ণজাত সন্তানও বর্ণসঙ্কর হয়।

পুপুন্‌কী আশ্রম
২৩শে কার্ত্তিক, ১৩৩৬

প্রণবে সর্ব্বমন্ত্রের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য

আশ্রমাগত কোনও ভদ্রলোক মন্ত্রজপ সম্বন্ধে উপদেশ চাহিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শত শত মন্ত্র চেখে বেড়িয়ে কি লাভ হবে বাবা? একটি মন্ত্রকে সারাৎসার ব'লে আলিঙ্গন কর।

জিজ্ঞাসু।—নানা মুনির নানা মত। আমি কার মতানুসারে চল্‌ব? কেউ বল্‌ছেন হ্রীং জপতে, কেউ বল্‌ছেন ক্লীং জপতে, কেউ বল্‌ছেন নমঃ শিবায় জপতে।

শ্রীশ্রীবাবা।—যেটিতে রুচি যায়, সেটাই জপ। জপ্‌তে জপ্‌তে একদিন পূর্ণ সত্যের দর্শন ও পূর্ণ আনন্দের আস্বাদ পাবেই পাবে।

জিজ্ঞাসু।—আমার মন দোদুল্যমান। এক এক মন্ত্রের সঙ্গে এক এক প্রকারের দর্শন-শাস্ত্র। সে সব তুলনা কত্তে গেলে যুক্তির খেই হারিয়ে ফেলি, বুদ্ধি স্তব্ধ হয়ে যায়, নিজেকে একটা আহাম্মক ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। বহু মতের আর বহু পথের বিরোধের মাঝখানে প'ড়ে আমি হতভম্ব হয়ে গেছি।

শ্রীশ্রীবাবা।—তাহ'লে বাবা প্রণব জপ কর। প্রণবের ভিতরে সর্ব্বমন্ত্রের অবস্থিতি; প্রণব থেকেই সকল মন্ত্রের উৎপত্তি, প্রণবেই সকল মন্ত্রের পর্য্যবসান। সুতরাং সকল দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষকে অক্লেশে অতিক্রম কত্তে হ'লে, প্রণব-মন্ত্র ধর। একমাত্র প্রণব জপে জগতের সকল মন্ত্র জপ করা হয়। প্রণবই সর্ব্বমন্ত্রের প্রাণ, প্রণব সর্ব্বমন্ত্রের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য।

প্রণবের প্রামাণ্য

জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিলেন,—প্রণব যে সর্ব্বমন্ত্রের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য, তার প্রমাণ কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সাধন ক'রে এগিয়ে যাও, প্রমাণ হাতে হাতে পাবে। সাধন-জগতের কথার প্রমাণ যুক্তি দিয়ে দেওয়া যায় না, যুক্তি দিয়ে ধরাও যায় না, সাধন ক'রেই সে প্রমাণ নিতে হয়। প্রণবের সাধন কত্তে কত্তে ক্রমশঃ তুমি দেখবে যে, হ্রীং, ক্লীং শ্রীং প্রভৃতি যত মন্ত্র জগতে পূজিত হ'য়েছেন, সব মন্ত্রের ধ্বনি, রূপ, বর্ণ, দর্শন-শাস্ত্র সব আপনা আপনি তোমার অনুভূতিতে ও আস্বাদনে আস্‌ছে এবং একটা আস্‌ছে, একটা যাচ্ছে, ঐরকম কত্তে কত্তে এমন এক স্থানে এসে পৌছেছ, যেখানে গিয়ে মত-পথের বিরোধগুলি আর বিরোধ ব'লেই অনুভূত হয় না। সাধন ক'রে প্রমাণ নাও।

ভবিষ্যৎ ভারতে প্রণবের স্থান

জিজ্ঞাসুকে নানা প্রয়োজনীয় উপদেশ দানের পরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভবিষ্যৎ ভারতে নানা সাম্প্রদায়িক মন্ত্রের স্থানে মন্ত্ররাজ প্রণব নিজের স্থান বিনা যুদ্ধে ক'রে নেবেন। লড়াই দিয়ে নয়, স্বভাবের শক্তিতে প্রণব এ দিগ্বিজয় কর্ব্বেন। ভবিষ্যৎ ভারতের লক্ষ লক্ষ মন্দিরে মহামন্ত্র প্রণব নিত্যপূজার বেদীতে নিজের মহিমায় নিজে আসীন হবেন। কোনও দেবমূর্ত্তির সাথে তাঁকে সংঘর্ষে যেতে হবে না।

কলিকাতা

২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬

বাঙ্গালী ও বিহারী

আজ রবিবার। কতিপয় অনুরাগী যুবক শ্রীশ্রীবাবার উপদেশ শ্রবণের জন্য সমাগত হইয়াছেন। কথায় কথায় বিহারীদের বাঙ্গালী-বিদ্বেষের কথা উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এ বিদ্বেষের উৎপত্তিস্থল সরকারী চাকুরীতে প্রতিযোগিতা। শিক্ষিত বাঙ্গালীরা গিয়ে সরকারী চাকুরী-নক্‌ড়ী দখল কত্তে আরম্ভ করার পর বিহারী শিক্ষিত লোকদের অন্তর্দ্দাহ স্বাভাবিক।

শ্রীযুক্ত ব- বলিলেন,—কিন্তু বাংলা দেশে ত' কত বিহারী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী এসে চাকরী নিচ্ছেন। কৈ আমরা ত' তার জন্য অন্তর্দ্দাহ অনুভব করি না। নিজের প্রদেশে থাক্‌লে যাঁর হয়ত জীবনে কোনই উন্নতি হ'ত না, এমন লোককে খুঁজে এনে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা দিতে স্যার আশুতোষ কার্পণ্য করেন নি, কিম্বা কোনো বাঙ্গালী তাতে আপত্তিও উত্থাপন করেন নি।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমাদের এ মনোবৃত্তি খুব প্রশংসার। তোমাদের উদারতা আছে, ভাবুকতা আছে, নাই সঙ্কল্পগত দৃঢ়তা আর সঙ্ঘবদ্ধতা। আগের দুটী গুণের সাথে যদি শেষের দুটী গুণ যুক্ত হয়, তাহলে তোমাদের সাহিত্য ভারতে যেমন অদ্বিতীয়, তোমাদের সমাজও তেমন ভারতে অদ্বিতীয় হতে পাত্ত।

বৃহত্তর বাংলার নৈতিক প্রয়োজন

শ্রীযুক্ত ব—জিজ্ঞাসা করিলেন,— এ দুটী গুণ কি বাঙ্গালীর ভিতরে বিকশিত করা যায় না?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যায়, এবং বৃহত্তর বাংলা সৃষ্টির চেষ্টা তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়। আত্ম-কলহ-রত বাঙ্গালী দূরদূরান্তরে গিয়ে মানব-সেবার ব্রত নিয়ে বসুক, তার কলহ-নিপুণতা আপনি কমে যাবে। এতকাল বহু বাঙ্গালী বাংলার বাইরে গিয়ে বাস করেছেন সত্য, কিন্তু তা' হ'য়েছে প্রধানতঃ রুটীর খোঁজে। দেশে রুটী কম মিলে, তাই তোমরা প্রবাসে গিয়েছ; কিন্তু যে প্রবাসে গিয়েছ, তাকেই যদি স্বদেশ ব'লে গ্রহণ কর, বঙ্গদেশেরই একটা প্রবদ্ধিত অংশ ব'লে জ্ঞান কর এবং নিজ পুত্র-পৌত্রাদির জন্য রুটীর সংস্থানেই মাত্র কাল না কাটিয়ে প্রদেশ, জাতি ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সর্ব্বমানবের কুশলের পথ প্রশস্ত কর্ব্বার জন্যও যদি অকপটে শ্রম কর, তাহ'লে এরই ফলে তোমাদের সঙ্কল্পগত দৃঢ়তা ও সঙ্ঘবদ্ধতা এসে যাবে। বৃহত্তর বাংলার সৃষ্টি তোমার নিজের মঙ্গলের জন্যই প্রয়োজন। অবাঙ্গালীর প্রদেশে সেবাব্রত নিয়ে বিনীত পূজারীর বেশে অর্চ্চনার থালি সাজিয়ে যখন তুমি যাবে, তখন তুমি তোমার সোণার বাংলাকে এত ভাল ক'রে চিন্‌বে যে, এই আত্ম-পরিচয় থেকেই তোমার আত্মশ্রদ্ধা ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা জাগ্‌বে।

বাঙ্গালীর আত্মবিশ্বাস

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—অবশ্য, বাঙ্গালীর আত্মশ্রদ্ধা বল্‌তে অ-বাঙ্গালীর প্রতি অশ্রদ্ধা বুঝো না। বাঙ্গালী যদি অন্য প্রদেশের লোককে নিজের চাইতে নিকৃষ্ট মনে করে. তাহ'লে সে ভুল কর্ব্বে, অপরাধ কর্ব্বে। অপরাধ এই জন্য যে, অপরকে নিকৃষ্ট ভাব্‌তে গেলেই সে পর হ'য়ে যায়! ভুল এই জন্যে যে, সে যদি ভিন্ন প্রদেশ-বাসীর সদ্‌গুণগুলিকে পূজা কর্ত্তে না শিখে, ভিন্ন-প্রদেশ-বাসীকেও প্রেম দিয়ে আপন ক'রে না নিতে পারে, তাহ'লে বৃহত্তর বাংলা ব'লে যে একটা কল্পনা অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে জেগেছে, তা কখনই আর বাস্তব রূপ ধারণ কর্ব্বে না।

বাঙ্গালী মনীষীর দৃষ্টি সর্ব্বদাই সর্ব্ব-ভারতীয়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভারতের নবজাগরণ সম্পাদনের যে পবিত্র ভার বিধাতা বাঙ্গালীর স্কন্ধে ন্যস্ত ক'রেছিলেন, শেষ পর্য্যন্ত সে দায়িত্ব বাঙ্গালী নিজ স্কন্ধে রাখ্‌তে পারে নি। এই সেদিন রাজা রামমোহন রুদ্রকণ্ঠে যে ভৈরব রাগ

গেয়ে গেলেন, তা শুধু বাঙ্গালীর ঘুম ভাঙ্গাবার জন্যে নয়, তা' জাগিয়েছে নিখিল ভারতকে। একদা ভারতের ঋষি উদাত্ত কণ্ঠে গেয়েছিলেন,—" এক সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি,—তিনি এক, নানা জনে নানা ভাবে তাঁর বিষয় বর্ণনা করে", কিন্তু খণ্ড সত্যে আত্মহারা জাতি সুদূর অতীতের সেই মহাঋক্ ভুলতে ভুলতে এসে যখন মতে-পথে কলহের লেঠেলী বিদ্যার অনুশীলন নিয়ে মাতামাতি কচ্ছিল, তখন দক্ষিণেশ্বরের মাতৃপূজক নব-যুগ-ঋষি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর উপলব্ধির মহাসমুদ্র মন্থন ক'রে মহামৃত আহরণ কল্লেন, আর অপক্ষপাত চিত্তে দেবাসুরে সমভাবে বণ্টন ক'রে দিলেন যে—"যত মত, তত পথ।" তাঁর এই বাণীও শুধু বাঙ্গালীর জন্যই নয়,—নিখিল ভারতবাসীর জন্য। বাঙ্গলার বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য-চর্চ্চা করলেন, উপন্যাস লিখ্লেন, প্রবন্ধ রচনা করলেন, একাধারে ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমালোচনা, রসরচনা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ সাহিত্যের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন কল্লেন, সমাজকে দিলেন আদর্শ, ব্যক্তিকে দিলেন ভাবুকতা, কিন্তু এখানেই তাঁর প্রতিভার অবদান শেষ হ'য়ে গেল না। লক্ষ লক্ষ বছর পরেও যে মহাবস্তু ভারত-সন্তানের জপ-মন্ত্র হ'য়ে থাকবে, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র রাজবেশ পরিহার ক'রে দীনতম "সন্তানে"র তপো-মনোবৃত্তি নিয়ে "আনন্দমঠে" দেশমাতৃকার পাদপীঠতলে নতজানু হ'য়ে সেই মাতৃবন্দনা গাইলেন,—"বন্দে মাতরম্", আর দেখ্তে না দেখ্তে সে মহামন্ত্র অশ্বিনীকুমার, কৃষ্ণকুমার, সুরেন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, আবদুর রসুল. লিয়াকৎ হোসেন, আনন্দমোহন, মনোরঞ্জন, চিত্তরঞ্জন, হরদয়াল প্রভৃতি শত সহস্র সন্তানের কণ্ঠে ত্রিংশৎ-কোটি-হৃদয়-মন্থনকারী ঘনরোল প্রতিধ্বনি তুল্ল। বঙ্কিমচন্দ্রের এ অক্ষয় অবদানও শুধু বাঙ্গালীর জন্যই নয়, নিখিল ভারতেরই জন্য। বাঙ্গলার বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ প্রতীচীর উপরে প্রাচ্যের অতুল আধ্যাত্মিক সম্পদ নিয়ে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হ'লেন, ইহসুখ স্থূলসত্ত্ব পশ্চিমের জড়বাদী মস্তিষ্কে অধ্যাত্ম-চেতনার বিদ্যুৎ-সঞ্চার কল্লেন, যুক্তির ঝটিকাবর্ত্তে আটলান্টিকের তীরে তীরে তুমুল আলোড়ন উত্থাপিত ক'রে বিজয়ীর বেশে স্বদেশে ফিরে এসে ভারতকে শুনালেন,—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, পাপ্যবরান্ নিবোধত"। সে বজ্রবাণী শুধু বাঙ্গালাকেই

জাগায় নি, সে বাণী সমগ্র ভারতকেই সেবা ধর্ম্মে দীক্ষিত করেছে, সমগ্র ভারতকেই নিজ মেরুদণ্ডের সবলতায় বিশ্বাস স্থাপন কত্তে প্রেরণা দিয়েছে। এই সেদিন এই বাংলাতেই সর্ব্বপ্রথম জাতীয়তার বেদীমূলে দাঁড়িয়ে ঋত্বিক সুরেন্দ্রনাথ জাতীয় আত্মচেতনা উদ্বোধনের মহামন্ত্র উচ্চারণ কল্লেন, settled fact কে unsettled কল্লেন, ভাঙ্গা বাংলাকে জোড়া দিলেন, যা' অসম্ভব তাকে যে সম্ভব করা যায় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন কল্লেন, আর আজ তা'ই কত বৈচিত্র্য নিয়ে কত নূতনত্ব ধ'রে দিকে দিকে প্রসারিত হচ্ছে। তিনি কল্লেন বীজ বপন, আর তাই শাখায় প্রশাখায় পত্রে পল্লবে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। তাঁরও বজ্রকণ্ঠ শুধু বাঙ্গলার স্বাধীনতার দাবীকে ঘোষণা করেনি, তাঁর চিন্তা ও চেষ্টা নিখিল ভারতেরই কুশল প্রার্থনা ক'রেছিল। বাঙ্গালী তার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের ভিতর দিয়ে সকল সময়ে নিখিল ভারতের কুশল কামনা ক'রেছে, বাঙ্গালী ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ত্রিংশৎ কোটী ভারতবাসীর কথা ভেবেই বন্দেমাতরম্ লিখেছিলেন, বাঙ্গালী কবি হেমচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, রবীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলাল নিখিল ভারতবাসীর পানে তাকিয়েই মেঘমন্দ্রে দীপক রাগে স্বাদেশিকতার সঙ্গীত সুরু ক'রেছিলেন। বাঙ্গালী মনীষীর দৃষ্টি সর্ব্বদাই সর্ব্ব-ভারতীয়, প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণতা তার সাহিত্যেও নেই, আচরণেও নেই।

প্রাদেশিক কলহ কেন সম্ভব হইল ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন, তবু দেখ, ভারতের নবজাগরণ সম্পাদনের পবিত্র দায়িত্ব ক্রমশঃ বাঙ্গালীর স্কন্ধ থেকে সরে সরে যাচ্ছে। ভারতের বাইরে যত দেশে যত বিশ্ববিদ্যালয় আছে, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভারতীয় অধ্যাপকদের সংখ্যা খতিয়ে দেখতে গেলে সুস্পষ্ট পাবে যে তন্মধ্যে প্রতি ছয় জনে পাঁচ জন ক্ষুদ্র বাংলার সন্তান, একজন মাত্র বাকী বিশাল ভারতবর্ষের প্রতিনিধি। মাড়োয়ারীরা যেমন প্রদেশমাত্রেই ধর্ম্মশালা স্থাপন ক'রে কীর্ত্তি অর্জ্জন করেছেন, বাঙ্গালীও তার প্রতিভার যাদুদণ্ড স্পর্শে ভারতের প্রান্ত থেকে প্রান্তান্তরে জ্ঞানস্ফূরণে, শিক্ষার প্রসারে নিজ শক্তি ও কৃতিত্বকে প্রমাণিত ক'রেছে। কিন্তু তবু ক্রমশঃ বাঙ্গালীর হাত থেকে ভারত-সেবার নেতৃত্ব

যেন খসে পড়ছে। কেন জানো ? তোমাদের একটি দারুণ ভ্রান্তির দরুণ তোমরা তোমাদের তিনটী প্রতিবেশীকে পর হ'তে দিয়েছ। আসামে গিয়েছ, উড়িষ্যায় গিয়েছ, বিহারে গিয়েছ, কিন্তু এই তিনটী প্রদেশের ভাষার সঙ্গে তোমাদের মাতৃভাষার অতি নিকট সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও তাদের ভাষাকে তোমাদের ভাষার আরো নিকট করার জন্যে কিম্বা তোমাদের ভাষাকে তাদের ভাষার আরো নিকট করার জন্যে কোনো চেষ্টা করনি। উড়িয়া, আসামী ও মৈথিল এই তিনটি ভাষার সাথে বাংলা ভাষার নৈকট্য অতি অধিক। পূর্বিয়া হিন্দী ও পছ্মা হিন্দীর নৈকট্য তত অধিক নয়। দ্বারভাঙ্গা, মজফরপুর, সারণ, ভাগলপুর, এমন কি পাটনা জেলার পল্লীগ্রামের লোকের কথা কান পেতে শুনে দে'খো। মনে হবে পূর্ব্ববঙ্গেরই কোনো জেলার গ্রাম্য লোকের কথা শুন্‌ছ। উড়িয়া, আসামী, মৈথিল ও বাংলা যে একের প্রতি অপরে তৎসম ভাষা, এই সাংস্কৃতিক সত্যকে তোমরা জেনে শুনেও মর্য্যাদা দাও নি। টেকচাঁদের "হুতুম প্যাঁচার নকসা" থেকে সুরু ক'রে রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে", প্রমথনাথের "চারইয়ারী কথা" পর্য্যন্ত তোমরা কেবল চেষ্টা দেখেছ যে, লিখ্য ভাষার সিংহাসন থেকে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্রকে তাড়িয়ে দিয়ে কল্‌কাতার অলি-গলির ভাষাকে বসিয়ে দেওয়া যায় কি না। কম প্রতিভা আর কম পরিশ্রম তাতে খরচ কর নি। বক্তৃতার ভাষা রূপে যা আপ্‌না আপনি নিজের স্থান ক'রে নিত, তাকে পদস্থ আর অপদস্থ করার জন্য ছোট বড় সবাই মিলে পঞ্চাশটি বছর বাংলা সাহিত্যের মেছো হাটে কাদা ছোঁড়াছুড়ি করেছ। কিন্তু উড়িয়ার কাছ থেকে কতটা নিয়ে তাকে কতটা দিতে পারা যায় এবং দুই ভাষার ভিন্ন অস্তিত্ব লোপ ক'রে কি ভাবে একটা ভাষা করা যায়, তার চেষ্টা করনি। অসমীয়ার কাছ থেকে কতটা নিয়ে তাকে কতটা দিতে পারা যায় এবং দুই ভাষার ভিন্ন অস্তিত্বকে উভয় প্রদেশবাসীর প্রাণের প্রীতির মাঝখানে একটা শল্যের মত থাকতে না দিয়ে আলিঙ্গনকে প্রগাঢ় করা যায়, তার চেষ্টা দেখনি। মৈথিল কবির "ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী, সুজনক কুদিন দিন দুই চারি"কে অনায়াসে এনে নিজের মাতৃ-সাহিত্যের অঙ্কে বসিয়ে শ্রদ্ধার পূজা প্রদান ক'রেছ, অথচ মৈথিলীকে বঙ্গ

ভাষা থেকে নূতন ক'রে কতটা দিতে পার যায় আর বঙ্গভাষাতে মৈথিলী-ভাষা থেকে নূতন ক'রে কতটা এনে হজম করা যায়, তার চেষ্টা কর নি। কল্‌কাতার কথ্য ভাষা আর বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের লিখ্য ভাষার মধ্যে অনর্থক একটা ফৌজদারী উপস্থিত ক'রে চুনোপুটি থেকে রাঘব বোয়াল পর্য্যন্ত সবাই মিলে দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও বার্ষিক পত্রিকাগুলিকে লাঠালাঠির মাঠে পরিণত ক'রে বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহারের একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে সকলকে স্তম্ভিত করেছ, কিন্তু কাজের কাজটীর কথা তোমাদের কারো মনে পড়েনি। পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বেই যে কার্য্যটী করা সঙ্গত ছিল, আজ পর্য্যন্ত সেই বিষয়টীতে তোমাদের কারো মনে একটা ক্ষীণ চিন্তার উদ্রেক পর্য্যন্ত হয় নি। এই প্রতিবেশীদের সাথে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তোমাদের এই যে অন্ধত্ব, তারই দরুণ বাঙ্গালী-বিহারী সমস্যা, বাঙ্গালী-আসামী সমস্যা এবং খুব নিস্তেজ ভাবে হ'লেও বাঙ্গালী-উড়িয়া সমস্যার উদ্ভব হ'য়েছে।

প্রকৃত বাঙ্গালী ও বাঙ্গালীর প্রেতাত্মা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—রোগ নিরাময় কত্তে হ'লে রোগের মূল কারণকে খুঁজে বের কত্তে হয়। যদি প্রতিবেশী প্রদেশের লোকেরা তোমাদের চাকরী-নকড়ী দেখেই ঈর্ষ্যাকাতর হ'য়ে থাক, তোমরা চাক্‌রী-নকড়ীর দিক্ থেকে দৃষ্টি কমিয়ে ব্যবসায় ধর। তোমরা ব্যবসায় ধর্‌লেও যদি তাদের ঈর্ষ্যা আসে, তাদের দেশে গিয়ে কৃষি ধর। তোমরা কৃষিতে হাত দিলেও যদি তাদের ঈর্ষ্যা আসে, তাহ'লে অবশ্য তোমরা কাউকে খুসী করার জন্যই উপবাসী থাক্‌তে পার না। তখন বরং চাকুরী, ব্যবসায় ও কৃষি সবই কর্ব্বে, কিন্তু চাক্‌রী, ব্যবসায় বা কৃষিকে লক্ষ্য না ক'রে ঐগুলিকে জীব-সেবার উপলক্ষ্য কর। তোমার অধিকাংশ অর্জ্জন জীবের সেবায় ব্যয়িত হোক্, তোমার পুত্র ও কন্যা জীবের সেবার জন্য জীবন-গঠনের শিক্ষা অর্জ্জন করুক, তোমার আত্মীয়-বান্ধব প্রত্যেকেও কোনও না কোনও একটা জীবসেবামূলক কাজের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত রাখ্‌তে বাধ্য হোক। যে জীবসেবী নয়, তাকে বাঙ্গালী ব'লে স্বীকার কত্তে কুণ্ঠা বোধ ক'রো। বিদ্যাসাগরের জাত, বিবেকানন্দের জাত শুধু নিজের জন্য জীবন ধারণ কত্তে পারে না।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জাত, মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর জাত শুধু নিজের উদরের দিকে তাকিয়ে চল্‌তে পারে না। এঁদের জীবনের দৃষ্টান্তকে দেখ। বিদ্যাসাগর সর্ব্বস্ব পরকে দিয়েছিলেন, বিবেকানন্দ বেলুড় মঠ বিক্রী ক'রে ফেলে দুর্ভিক্ষের সময়ে আর্ত্তত্রাণ কার্য্য কত্তে চেয়েছিলেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন লক্ষ লক্ষ লোককে স্বোপার্জ্জিত অর্থ বিলিয়েছিলেন, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র এক কোটি টাকার উপর শুধু শিক্ষা-বিস্তারের জন্যই দান করেছেন, অন্যান্য দান ত' বলাই বাহুল্য। লোকে পৈত্রিক সম্পত্তি উজাড় করে রেস খে'লে, জুয়াবাজি ক'রে, মদ খেয়ে আর মেয়ে মানুষের সখে,—ইনি বিপুল সম্পত্তি বল্‌তে গেলে বাতাসের সাথে মিশিয়ে দিলেন শুধু পরোপকারের জন্যে। যাঁদের চরিত্রে এঁদের চরিত্রের ছায়া আছে, মাত্র তাঁদেরই বাঙ্গালী ব'লে স্বীকার ক'রো। অপরেরা বাঙ্গালীর প্রেতাত্মা মাত্র। রায় বাহাদুর আর সি, আই, ই হ'য়ে—বাংলার বাইরে শুধু বাঙ্গালীর প্রেতাত্মারাই বাস করুক, একথা কার কাম্য হ'তে পারে? গরীবের চালেই থাক আর নগণ্য হ'য়েই থাক, থাকো আদর্শ বাঙ্গালীর মত, বঙ্গমাতার প্রকৃত গৌরবের মত, তাস-পাশার আড্ডা জমিয়ে নয়, খাঁটি বাঙ্গালীর মত সেবাব্রত নিয়ে,—এই হচ্ছে কাম্য এবং এতেই হবে সকল প্রাদেশিকতার সম্যক্ প্রতীকার।

রাষ্ট্র ভাষার যোগ্যতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—* আজকাল রাষ্ট্র-ভাষা ব'লে একটা কথা ক্রমশঃ অস্পষ্ট থেকে স্পষ্ট হবার চেষ্টা কচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে যে, যতক্ষণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা না আস্‌ছে, ততক্ষণ রাষ্ট্র-ভাষা কথাটা একটা কথার কথা মাত্র। আর, কেউ কেউ যে মনে কচ্ছেন, হাটে বাজারে সওদা করবার পক্ষে যে ভাষা সকলের উপযোগী, তাই হবে ভারতের রাষ্ট্র-ভাষা, এ সম্বন্ধেও আমি খুব একটা সমর্থন শোনাতে পাচ্ছি না। ভারত যখন স্বাধীন হবে, তখন এক প্রদেশের উচ্চতম শাসন-প্রতিষ্ঠান অপর প্রদেশের উচ্চতম শাসন-প্রতিষ্ঠানের কাছে নিজেদের কোনও কূটনৈতিক জটিল বক্তব্য বল্‌বার সময়ে কোন্ ভাষার ব্যবহার কর্ব্বেন, তারই

* এই অংশটুকুর তারিখ-সঙ্গতি করিতে না পারায় প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় এখানে যুক্ত হইয়াছে। ইহা পরবর্ত্তী কোনও সময়ের কথোপকথন বলিয়া অনুমিত। অঃ সং সঃ।

উপরে নির্ভর কর্ব্বে যে ভারতের রাষ্ট্রভাষা কি হবে। সেদিন এক প্রদেশের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী তাঁর বৈজ্ঞানিক নবাবিষ্কারকে অন্য প্রদেশের বিজ্ঞানীদের সমাজে আদৃত কর্ব্বার জন্য যে ভাষায় নিজের তথ্য প্রচার কর্ব্বেন, তা'রই উপরে নির্ভর কর্বে যে, ভারতের রাষ্ট্র-ভাষা কি হবে। সেদিন এক প্রদেশের প্রজ্ঞানী তাঁর অভিনব দার্শনিক যুক্তি ও সিদ্ধান্ত সমূহকে ভিন্ন প্রদেশের প্রজ্ঞানীদের নিকটে প্রচারিত কর্ব্বার জন্য যে ভাষার ব্যবহার কর্ব্বেন, তারই উপরে নির্ভর করবে যে, ভারতের রাষ্ট্রভাষা কি হবে। কয়েক জন বুদ্ধিমান লোক মিলে বাজার-চলতি একটা ভাষার সৃষ্টি কর্লেই তা দ্বারা রাষ্ট্রভাষা হবার যোগ্যতা সঞ্চিত হয় না। ভাষার ভিতরে শ্রেষ্ঠভাবকে বহন করার ক্ষমতা থাকা চাই, ভাষার ভিতর দিয়ে ভাসাভাসা যতখানি কথা বলা হয়েছে, শব্দের আভাস, দ্যোতনা, ব্যঞ্জনা, অভিব্যক্তি প্রতিপ্রকাশ তার চেয়ে শতগুণ হওয়া চাই। মিলটন বা শেকসপীয়ারের কাব্য, হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের দর্শনজ্ঞান, স্যর আইজাক নিউটনের বিজ্ঞান যে ভাষার ভিতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছে, সেই ভাষাই ডিজরেলী, বার্ক বা গ্লাডষ্টোনের রাষ্ট্র-নীতির তত্ত্ব বহনে সক্ষম হবে। বাজার-চল্তি ভাষার মধ্যে রাষ্ট্রভাষা হবার সে যোগ্যতা কোথায়? সুতরাং রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের দরুণ তোমাদের উদ্বিগ্ন হবার কিছু আছে ব'লে আমি মনে করি না।

বঙ্গভাষার সর্ব্ব-ভারতীয় সংস্কার

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু তোমাদের কর্ত্তব্য রয়েছে সুপ্রচুর। বাংলা বুলিকে "বলি" দেবার প্রয়োজন নেই, বাংলা বুলিকে "বলী" করা প্রয়োজন। প্রাকৃত ভাষা থেকে জন্ম নিয়েও বাংলা ভাষা সংস্কৃত থেকে তার শত করা সত্তরটী শব্দ গ্রহণ করেছে। এর ফলে সে ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র-নিবহের সাথে একটা সহজ যোগ রক্ষা কত্তে সমর্থ হয়েছে। একটা বাঙ্গালীর ছেলে যত্ন থাকলে ছয় মাসে সংস্কৃত ভাষায় অধিকার অর্জ্জন করে, আভাস, ব্যঞ্জনা, দ্যোতনা, অভিব্যক্তি, প্রকাশ, বিকাশ,—এই এতগুলি প্রায় সমর্থবাচী শব্দের ভিতরে রসানুভূতিগত পার্থক্য ও বৈচিত্র্য কতটুকু তা বুঝ্তে তার দুবছর লাগে না। ভারতের আদি সাহিত্য সংস্কৃতে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সংস্কৃতে, মূল দর্শন শাস্ত্রগুলি সংস্কৃতে,—তত্ত্ব এবং

মতবাদের প্রচার-প্রসার সংস্কৃতে,—এই বিরাট সত্যকে বঙ্গভাষা অস্বীকার করে নি। যেই মাতৃক্রোড়ে ভারতীয় সভ্যতার বনিয়াদ গঠিত হয়েছে, সেই মাতৃ-অঙ্গ থেকে বঙ্গভাষা দূরে স'রে যেতে সম্মত হয় নি। এটী বঙ্গভাষার এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় গিয়ে খুব ভালো বাংলায় কথা বল,—ভারতের সকল স্থানের সকল সাধু, মহান্ত, জ্ঞানী, পণ্ডিত, আচার্য্য ও উপদেষ্টারা তোমার ক্রিয়াপদগুলি বাদে আর সব কথাই বুঝতে পারবেন। যাঁরা ব'লে থাকেন যে, সংস্কৃত হচ্ছে মৃত ভাষা, তাঁরা অনেকেই খেয়াল ক'রে কখনো দেখেন নি যে, সংস্কৃত ভাষার মৃত্যু নেই, অমর দেবভাষা যুগের উপযোগী নবতর রূপধারণ ক'রে বঙ্গভাষা নাম নিয়েছেন। যাঁরা বাংলা ভাষাকে আস্তাকুঁড়ের ভাষারূপে পরিগণিত কর্ব্বার চেষ্টা ক'রেছেন, তাঁদের অজ্ঞাতসারে তাঁদের নিজেদের ভাষাই সংস্কৃতের কাছে অত্যধিক ঋণী হ'য়ে গেছে। প্রাকৃত বাংলা সংস্কৃতকে ভাবব্যঞ্জনার সহায়রূপে যেমন ভাবে অঙ্গীকার ক'রে বলীয়সী হয়েছে, তেমনি ক'রে সকল প্রদেশের সকল ভাষা থেকে শব্দ, ভঙ্গিমা, বাগ্‌ধারা গ্রহণ ক'রে আর ও পুষ্টি আর ও কান্তি সঞ্চয় করুক। যখন প্রদেশে প্রদেশে অনর্থমূল ঈর্য্যার ঝঞ্ঝা আর বিদ্বেষের চিত্তদাহ চলেছে, তখন তোমরা ধীর চিত্তে নীলকণ্ঠ মহাদেবের ন্যায় সেই গরল জীর্ণ ক'রে যাও, আর সেবাবৃত্তির ভিতর দিয়ে বঙ্গভাষার পরিপুষ্টি সাধন কর। উড়িয়া, আসামী, মৈথিলী, হিন্দী, গুজরাটি, পাঞ্জাবী, তামিল, তেলেগু, মারাঠী, কোঙ্কণী, গাড়োয়ালী, সাঁওতালী প্রভৃতি গণ্য নগণ্য সকল সাহিত্য থেকে শব্দ চয়ন কর, বাগ্-বৈদগ্ধ্য গ্রহণ কর। এতে বঙ্গভাষার যে অপরূপ শ্রী ও সম্পদ ফুটে উঠবে, তাই হবে তোমাদের বৃহত্তর বাংলার সত্যিকারের বনিয়াদ। ক্লাবঘর নয়, সঙ্গীত-শালা নয়, সাহিত্য-সভা নয়,—পন্থা হচ্ছে এইটী। ক্লাব প্রভৃতি কত্তে চাও কর; কিন্তু সেগুলি গৌণ,—এইটীই মুখ্য; সেগুলি উপলক্ষ্য,—এইটীই লক্ষ্য।

ভলাপুক, এস্‌পারেণ্টো ও বাংলা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আগেকার দিনে অর্থাৎ মধ্যযুগে ইয়ুরোপে সকল দেশের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের প্রধান ভাষা ছিল ল্যাটিন। লেখা-পড়া জানে ব'লে পরিচয় দিতে হ'লেই লোক্‌কে ল্যাটীন শিখ্‌তে হ'ত। কিন্তু ক্রমশঃ ল্যাটিনের সে

প্রভাব খর্ব্ব হ'ল। ইংরিজি, জার্ম্মেণ, ফরাসী প্রভৃতি বহু ভাষা নিজ নিজ বিশেষত্ব নিয়ে সাহিত্যিকতায় মণ্ডিত হ'য়ে আত্মপ্রকাশ কর্ল্লে। প্রত্যেক জাতির শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, শ্রেষ্ঠ সমাজ-সংস্কারক, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-প্রচারক ল্যাটিনের ব্যবহার ছেড়ে দিয়ে নিজ নিজ মাতৃ-ভাষার গৌরব ও গরিমা বর্দ্ধন কত্তে লাগ্‌লেন। ফল দাঁড়াল এই যে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সন্ধি-বিগ্রহাদি ঘট্‌লে তার দলিলপত্র ফরাসী ভাষায় লিখিত হ'তে লাগল, কিন্তু এক দেশের জ্ঞানীরা অপর দেশের জ্ঞানীদের কথা বুঝতে অক্ষম হ'তে লাগ্‌লেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এক জার্ম্মাণ পুরোহিত, নাম তাঁর, জোহান মার্টিন শ্লেয়ার (Schleyer) ভলাপুক্ Volapuk নামে এক সর্ব্বজনীন ভাষা সৃষ্টি কর্ল্লেন। শত শত লোকে সে ভাষা শিখ্‌তে আরম্ভ কর্ল্লেন এবং যখন মনে হতে লাগ্‌ল যে, সর্ব্বজাতির সর্ব্বসাধারণের এই ভাষাটীকে গ্রহণ কত্তে আর দেরী নেই, ঠিক সেই সময়ে "ভলাপুক্"-প্রচারকারী নেতাদের ভিতরে লেগে গেল মতানৈক্যের লড়াই। দেখতে না দেখ্‌তে জল-বুদ্‌বুদের মত এ নূতন ভাষা শূন্যে মিলিয়ে গেল। ইতিমধ্যে রাশিয়ান এক চিকিৎসক, ডাক্তার জ্যামেন্‌হফ্ (Dr. Zamenhof) এস্‌পারেণ্টো নামে আর একটী সর্ব্বজনীন ভাষা প্রচার কচ্ছিলেন। ইয়ো-রোপের সবগুলি ভাষা থেকে তিনি বেছে বেছে এমন শব্দ ও ধ্বনি গ্রহণ কর্ল্লেন, যেগুলি সব ভাষাতেই সমান। প্রত্যেক ভাষার অসাম্য ও বৈচিত্র্যটুকু বাদ দিয়ে দিয়ে একটী সর্ব্ব-সামান্য ভাষার কাঠামো তিনি গ'ড়ে তুল্‌লেন। দেড় বছর বয়সের খুকীর মত কোন রকমে এ ভাষা ইয়ুরোপে চল্‌তে সুরু ক'রেছে। কিন্তু বঙ্গভাষাকে এ দুটী ভাষার একটীরও পন্থা অনুসরণ কর্ল্লে চল্‌বে না। 'ভলাপুক' যেমন ভোটের জোরে চল্‌ল, আর ভোটাভুটির মারামারি সুরু হ'তেই মর্‌ল, বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ তা হ'লে চল্‌বে না। এ ভাষা কারো ভোটের মুখপানে যেন তাকিয়ে না চলে, কারো ভোটের উপরে যেন এর নিশ্বাস বা প্রশ্বাস নির্ভর না করে, এর জীবন-মৃত্যু যেন এর নিজের হাতেই থাকে। আবার সকল ভাষার সামান্য শব্দগুলি চয়ন ক'রে নিয়ে বঙ্গভাষা নিজেকে সীমাবদ্ধও কত্তে পারে না। বঙ্গভাষাকে বাইরে থেকে লক্ষ লক্ষ শব্দ চয়ন কত্তে হবে, কিন্তু নিজের একটী শব্দকেও সে

পংক্তিভ্রষ্ট কর্ব্বে না। "খোশ মেজাজী" আর "আমুদে" কি একই অর্থ প্রকাশ করে? "হামদর্দ্দী" আর "সহানুভূতি" কি একই অর্থ প্রকাশ করে? পুষ্টি সঞ্চয়ের চেষ্টায় নেমে তোমরা স্পষ্ট দেখ্‌তে পাবে যে, বাংলা একটী শব্দের তামিল প্রতিশব্দটী ঠিক্ সেই অর্থ টুকুই প্রকাশ করে না, তার একটু পৃথক্ ব্যঞ্জনা আছে, অপর একটী বাংলা শব্দের গুজরাটী প্রতিশব্দটীও ঠিক্ সেই অর্থ টুকুই প্রকাশ করে না, তারও একটু পৃথক্ ব্যঞ্জনা রয়েছে। ভারতীয় এক ভাষার শব্দের অপর ভাষার প্রতিশব্দ প্রকৃতই প্রতিশব্দ নয়, কতকটা অতি-চাক্রিক (over lapping) ও বটে। সুতরাং বঙ্গভাষার পরিপুষ্টির জন্যে সেই সকল সমার্থবাচক অতিচাক্রিক শব্দ তামিল, তেলেগু, কানাড়ী, মারাঠী, গুরুমুখী, সিন্ধি প্রভৃতি সব ভাষা থেকেই যতটা হজম ক'রে ক'রে নেওয়া যায়, নিতেই হবে। বাজার-সওদা খরিদের তাগিদে নয়, উন্নততর ভাব এবং মহত্তর অর্থ প্রকাশের তাগিদে, সাহিত্যের ভিতরে নবতর চিন্তা-সম্পদের সংযোজনার তাগিদে এ কাজ কত্তে হবে।

পুপুন্‌কী আশ্রম
১১ই মাঘ, ১৩৩৬

নাম

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা কলিকাতা ও বারাণসীতে দুইটী ভক্ত যুবকের নিকট সংক্ষেপে দুইখানা পত্র লিখিলেন, যথা, [১]

"যখনি হইবে চিত্ত চঞ্চল অধীর,
নামে সমর্পিয়া প্রাণ হইও সুস্থির।
আত্ম-অবিশ্বাস যদি করে আক্রমণ,
নামের সহায়ে কর কেশরি-গর্জ্জন।
হতাশার অন্ধকার যদি আসে ঘিরে,
নামের প্রদীপ জ্বালো হৃদয়-মন্দিরে।
নাম যে পরম বন্ধু, অক্ষমের বল,
নাম অনাথের নাথ, শেষের সম্বল।"

[২]

"পথ, লক্ষ্য শতবার ভুল হ'তে পারে,
বুদ্ধিমান্ তাই ব'লে নাম কভু ছাড়ে?
করুক অবাধ্য মন শত কোলাহল,
তুমি জান,—নাম তব অমোঘ সম্বল।"

পুপুন্কী আশ্রম
১২ই মাঘ, ১৩৫৬

পরীক্ষা, আত্মবিশ্বাস, নামজপ ও জ্যোতিঃ

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা কলিকাতা-কালীঘাট নিবাসী জনৈক সাধক যুবককে এক পত্র লিখিলেন। তার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা,—

"চতুর্দ্দিকে গর্জ্জে যদি সহস্র সংশয়,
মধুময় নাম তব পরম অভয়।

"পরীক্ষা দেওয়াটাকে একটা বিপদ বা দুর্য্যোগ বলিয়া মনে না করিয়া সুযোগ বলিয়া গ্রহণ কর। জীবনের প্রতি পাদবিক্ষেপে তোমার নৈতিক শক্তি আধ্যাত্মিক বল, মনুষ্যত্বের প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের দৃঢ়তা পরীক্ষা করিবার জন্য কত শত অপ্রত্যাশিত ঘটনাপুঞ্জ আসিয়া দেখা দিবে। সকল পরীক্ষাতেই তোমাকে স্ফীত বক্ষে আগুয়ান্ এবং উন্নতশিরে উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

"রুদ্ররণ তোরে যদি করে রে আহ্বান,
দুর্ব্বলের আঁখিনীরে
ভাসাইয়া দিবি কিরে
অভ্রভেদী বীর-বীর্য্য আত্মার সম্মান?

"নিজেকে মস্তিস্কহীন অকর্ম্মণ্য আর ভাবিও না। অভ্যাস-বশে মন যদি নিজেকে ছোট বলিয়া ভাবিতে বসিয়া পড়ে, তবে তাকে কাণে ধরিয়া টানিয়া সচেতন করিবে। কাণমলা যে আত্ম-অবিশ্বাসের মহৌষধ।

"ধ্যান কর অবিরত নিজ মহিমার,
ব্রহ্মময়ী মহাশক্তি জননী তোমার।
তোমার ইন্দ্রিয়চয়ে তাঁর অনুভূতি
প্রস্ফুটিত করি' দিবে অখণ্ডের জ্যোতি।

"নামজপে বসিয়া ভ্রূমধ্যে জ্যোতির্দ্দর্শন মনঃসংযোগের একটা লক্ষণ। জেলা বোর্ডের রাস্তার পাশে যেমন এক মাইল পরে পরে একটা করিয়া মাইলষ্টোন্ থাকে, সাধনের পথেও এই রকম কতক পরে পরে এক একটা করিয়া নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যে দাঁড়াইয়া থাকে, সে ঠকে। এই সব দেখিয়া যে উৎসাহিত হইয়া আরও বেগে ও অধিকতর দৃঢ়তা সহকারে পথ চলিতেই থাকে, সে নিত্য নূতন ঐশ্বর্য্য সমূহের প্রকাশ দেখিতে পায়। উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য সমূহ লাভ করিবার পরে অনেক সাধক থামিয়া যান কিন্তু সিদ্ধ-সাধক ঐশ্বর্য্যসমূহ করায়ত্ত করিবার পরেও থামেন না, তিনি তাঁর অফুরন্ত পথ ক্রমাগত চলিতেই থাকেন, কোনও কিছু পাইবার লোভবশতঃ নয়, নিজের স্বভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়াই তিনি ঐশ্বর্য্য-জগতের পরপারে এক অমৃতময় রস-সাগরের তরঙ্গের পর তরঙ্গ যুগযুগ ব্যাপিয়া বুক পাতিয়া গ্রহণ করেন।

"পাঠশালে পড়াশুনা ভাল করিয়া করিলে যেমন বার্ষিক সভার দিনে পারিতোষিক পাওয়া যায়, জ্যোতিরাদি দর্শনও ঠিক সেই রকমেরই ব্যাপার। কিন্তু বৎসরে এক দিন পারিতোষিক পাওয়াই ত' আর জীবনের পরম-পুরুষার্থ নহে! এই পারিতোষিকের মূল্য যার জীবনে প্রতিদিনকার ঘটনায় রক্ষিত হয়, সে-ই না যথার্থ পুরস্কারযোগ্য ছাত্র! ঠিক্ তেমনই জীবনের প্রত্যেকটী দিনে, দিনের প্রত্যেকটী পলে ও অনুপলে সেই নিত্য-স্বরূপ পরব্রহ্মের পরমজ্যোতিঃ কি মুদ্রিত নেত্রে কি উন্মীলিত চক্ষে দর্শন করিতে পারার যোগ্যতা লাভেরই না ইঙ্গিত তুমি আজ জপকালীন জ্যোতির্দ্দর্শনে পাইতেছ! সেই যোগ্যতা তোমার নাম-নিষ্ঠা হইতেই ক্রমশঃ সঞ্জাত ও উপচিত হইতে থাকিবে।

"নামে লাগাইয়া রাখ বুদ্ধি, মন, প্রাণ,
আপনি জাগ্রত হবে দীপ্ত ব্রহ্মজ্ঞান।

"ব্রহ্মদর্শন করা আর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা একই কথা। উপলব্ধিই জ্ঞান এবং জ্ঞানই দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন প্রভৃতির ভাষাতে সাধকের নিকটে ধরা দেয়। জপকালে বায়স্কোপের ছবির মত যাহা দেখিতেছ, তাহা ইন্দ্রিয়ানুভূতির ভাষায় অতীন্দ্রিয় জ্ঞান।

"রূপাভিনিবেশহীন নামজপ-কালে স্বতঃই যদি কোনও মূর্ত্তি সমক্ষে উপস্থিত হন, তবে জানিতে হইবে, ইনি অনাদরণীয় নহেন। তোমার সাধনে ইচ্ছাপূর্ব্বক রূপধ্যান আবশ্যকীয় নহে কিন্তু কোনও রূপ সাধকের প্রয়াস ব্যতীত স্বয়মেব স্ফূর্ত্তি পাইলে তাহাতে অভিনিবেশ দোষাবহ নহে। যেখানে রূপের স্বতঃ প্রকাশ নাই, কিন্তু সাধকের রূপাভিনিবেশে রুচি প্রবল, সেখানেও রূপ-ধ্যান নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু অবিরত নাম-সেবা অব্যাহত রাখিয়াই রূপাভিনিবেশ চলিবে, ইহা ভুলিও না।"

দাম্পত্য একনিষ্ঠা

রাজসাহী-নিবাসী জনৈক বিবাহিত যুবকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"দৈবক্রমে একটী বিকৃত-মস্তিষ্ক, বিকলাঙ্গ বা পুরুষোচিত শক্তি-বর্জ্জিত স্বামীর সহিত বিবাহ ঘটিয়া গেলে সতী নারী তাহাকে যেমন ত্যাগ করে না, দৈবক্রমে ঐরূপ বিকৃতাঙ্গী নারীর সহিত বিবাহ ঘটিয়া গেলে চরিত্রবান্ স্বামীরও উচিত নহে তাহাকে পরিত্যাগ করা। আদর্শের দিক্ হইতে এই ব্যবস্থা-সাম্যের প্রয়োজন আছে। কারণ ইহা দ্বারা পুরুষ-চরিত্র উন্নত, বলিষ্ঠ ও দৃঢ় হইবে। যক্ষারোগ-গ্রস্ত স্বামীকে বিবাহ করিয়াও পুরুষান্তর গ্রহণ করেন নাই কিম্বা তাহাকে পরিত্যাগের কল্পনা মাত্র মনে স্থান দেন নাই, এমন অনামান্য দৃঢ়তা ও সংযম-শক্তির আধার বহু মহীয়সী ললনা ভারতের মাটীতে জন্মিয়াছেন এবং নিজেদের জন্মদ্বারা ভারতের বাতাসকে পবিত্রতর, মাটিকে পুণ্যতর, জলকে শুদ্ধতর করিয়াছেন। এইরূপ সংযম-শক্তি-সম্পন্ন পুরুষের জন্ম আজ নবযুগের দাবী। পুরুষের পত্নীত্যাগের দৃষ্টান্তে নারীর পতিত্যাগের যে সমর্থন আজ সর্ব্বত্র শুনা যাইতেছে, তাহা নারীর প্রতি পুরুষের দীর্ঘকালের অবিচারের প্রতিবাদ মাত্র। ইহা নবযুগের দাবী নহে।"

পুপুন্‌কী আশ্রম
১৩ই মাঘ ১৩৩৬

নাম-সেবা ও শ্বাস-প্রশ্বাস

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা ঢাকা-নিবাসিনী এক সাধিকা মহিলার নিকট লিখিলেন,—

"নামকে কোনও অবস্থাতেই ভুলিবি না। পবিত্র বা অপবিত্র, স্নাত বা অস্নাত, কর্ম্ম-নিরত বা বিশ্রাম-নিমগ্ন সর্ব্বাবস্থাতেই নামের সেবা করিতে থাকিবি। হাতের কাজ হাতে চলিবে, নামের সেবা মনে মনে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকিবে। সংসার ত্যাগ না করিয়াও নিত্যযোগযুক্ত হইয়া থাকিবার ইহা শ্রেষ্ঠ কৌশল।

"শ্বাস-প্রশ্বাসকে লইয়া কুস্তি-কসরৎ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই মা। শ্বাস-প্রশ্বাস বিধাতার দান, যখন পরমাত্মা তাহাকে যে ভাবে চালাইবেন, ধীরে বা দ্রুত, অল্পকালব্যাপী বা বিলম্বিতভাবে সে তার নিজের নিয়মে নিজেই চলুক, তার স্বচ্ছন্দ গতির উপর তুমি হাত দিও না। তোমার কর্ত্তব্য শুধু প্রত্যেকটী শ্বাসে আর প্রশ্বাসে একটী করিয়া নামের বীজ বপন করিয়া যাওয়া। তোমার দায়িত্ব শুধু প্রত্যেকটী বীজ বপনকালে এ নাম কাহার নাম তদ্বিষয়ে সজাগ থাকা। তোমার শ্বাস ও প্রশ্বাসের মধ্যে অবস্থান করিয়া শ্রীভগবান নিজের সাধন নিজেই করিতেছেন,—তুমি তাঁর সেই বিচিত্র সাধন-লীলা অনুরাগ সহকারে শুধু দর্শন করিয়া যাও।"

সাধকের সঙ্কেত

ত্রিপুরা জেলা নিবাসী জনৈক ভক্তের নিকট শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"জমি যদি সরস হয়, চাষ ছাড়াও বীজ বুনিলে ফসল হয়। জমি যদি নীরস হয়, ভালমত চাষ করিয়া বীজ বুনিলে ফসল হয়। সরস জমিতে চাষের পরে বীজ বুনিলে অতি উত্তম ফসল হয়। নীরস জমিতে যদি চাষ না পড়ে, তবে বীজ বুনিলেও ফসলের আশা কম। শ্বাস-প্রশ্বাসই সাধনের ভূমি। ভক্তি, বিশ্বাস ও অনুরোগ সেই ভূমির সরসতা। নিয়মিত অভ্যাসই চাষ। ভগবানের নামই বীজ।"

গর্ভবতীর প্রতি কর্ত্তব্য

ময়মনসিংহ-নিবাসী জনৈক বিবাহিত ভক্তের নিকটে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"তোমার সহধর্ম্মিণী গর্ভবতী। তোমার সকল মহতী চিন্তাকে কর্ম্মে পরিণত করিবার যথোপযুক্ত আয়োজনের ইহাই সুযোগ। আমার স্নেহের মাকে তুমি তোমার শ্রেষ্ঠ চিন্তাগুলিকে উপহার দিতে থাক, ভাবুকতায় নিজের প্রাণ গলাইয়া তাঁর হৃদয়-বীণার তারে তারে একই সুরের ঝঙ্কার তুলিতে থাক, ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ়তা-সহকারে তাঁহার মনের মধ্যে ইস্পাতের ন্যায় তীক্ষ্ণবীর্য্য ভাবগুলি প্রবিষ্ট করিয়া দিতে থাক,—যে চিন্তাগুলি তোমাকে ব্যাকুল করিতেছে, তাহা তাঁহার হৃদয়-সমুদ্রেও তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ আলোড়ন উপস্থিত করুক। তবে একটী দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে, ভাবগুলির সহিত তাঁহার পরিচয় যেন আকস্মিকভাবে না হয়, বিশৃঙ্খলভাবে না হয়, মনকে সহাইয়া সহাইয়া তাঁহার চিন্তা-প্রণালীর সামঞ্জস্যকে অটুট রাখিয়া ভাবগুলি পরিবেশন করিবে।—গর্ভাবস্থায় এই সামঞ্জস্য ও ধীরতার প্রয়োজন যথেষ্টই আছে।

"এইভাবে তোমাদের কর্ম্মাকাঙ্ক্ষা তোমাদের সন্তানে বিসর্পিত হইবে এবং মহৎ কার্য্য করিবার যোগ্য, মহৎ জীবনযাপন করিবার উপযুক্ত, পুত্র বা কন্যা আবির্ভূত হইবে। গৃহী যখন নিজ উচ্চ চিন্তাকে সন্তানের মধ্যে গর্ভবাসকালেই সংক্রামিত করিয়া দিতে পারে, সেই সময়ই সে তার দাম্পত্য জীবনের সত্যতাকে প্রমাণিত করে। মৈথুন-মিলনকেই দাম্পত্যজীবন বলি না, সার্থক দাম্পত্য জীবনে ভবিষ্যদ্‌বংশীয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা-সংক্রমণই প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। সন্তান গর্ভস্থ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তোমরা যে সকল সত্য চিন্তা করিয়াছ, সন্তান তাহার সুপ্রভাব ত' পাইয়াছেই, এখন পুনরায় তাহার মাতা যে সত্য চিন্তা করিবেন, সন্তান তাহাও অতিশয় অল্পায়াসে নিজ জীবনে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিতে পারিবে। যে মহৎ কার্য্য তোমার দ্বারা হইবার নহে কিন্তু হইতে পারিলে ভাল ছিল, মাতার একাগ্র চিন্তা সন্তানের দ্বারা সেই মহৎ কার্য্যের সম্ভাবনা-সমূহকে জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ করিবে। শিক্ষার বলে সন্তানের জীবন গঠন করিয়া দিব বুদ্ধি মূর্খের। প্রকৃত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সন্তান গর্ভে প্রবিষ্ট না হইবার

সন্তানের জন্য যাহা করিবার করিতে থাকেন এবং গর্ভাবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন।

"গর্ভাবস্থায় স্বভাবতঃই মাতার মন দিবারাত্রি সজ্ঞানে ও অজ্ঞানে জঠরেই থাকে। চিরদিন যাহার ভ্রূমধ্যসেবী হইয়া নামজপের অভ্যাস, তাহারও মন এই সময়ে জঠরের দিকে দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া যাইতে চাহে। ইহা দেহের স্বাভাবিক ধর্ম্মের আকর্ষণ। এই স্থলে গর্ভবতীর কর্ত্তব্য নিজ জঠরেই মনঃস্থির করিয়া শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম জপিয়া যাওয়া। নামে বেষ্টিত করিয়া দেবমূর্ত্তি, মহাপুরুষমূর্ত্তি প্রভৃতিও এই সময়ে জরায়ু-মধ্যে বা নাভিমূলে ধ্যান করিতে হইবে; বীরেন্দ্রকেশরী বা সিদ্ধ পুরুষের জীবনী-পাঠের পরে জঠরেই সেই সব মহাত্মাদের কথা চিন্তন করিতে হইবে। আমার স্নেহের মাকে তুমি এই বিষয়ে বিশেষ উৎসাহিতা করিও। যখন নামজপ বা ধ্যানাদি করিবেন না, তখন যেন স্নেহের মা নিজ জঠরে মন রাখিয়া নিয়ত এই সঙ্কল্পই করিতে থাকেন,—'ওঁ জগন্মঙ্গলাহং ভবামি—আমি জগতের কল্যাণকারিণী হইতেছি।'—"

স্বামি-পরিত্যক্তার প্রতি

ঢাকা-জেলা নিবাসিনী জনৈকা পতি-পরিত্যক্তা সাধ্বী মহিলার পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"পুষ্পের মত নিষ্পাপা পত্নীকেও অগ্রাহ্য করিয়া ভ্রান্ত পথে বিচরণ করিবার মত পুরুষ এ জগতে সহস্র সহস্র জন্মিয়াছে এবং জন্মিতেছে। সীতা-সাবিত্রীতুল্যা সতী-সাধ্বীর বক্ষে ইহারা শেল বিদ্ধ করিয়া আমোদের নেশায় আলেয়ার পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়ায়। 'এইরূপ উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত, অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া তোমার আজ পথ কি',—ইহাই ছিল মা তোমার সেদিনকার প্রশ্ন।

"উত্তর দিয়াছিলাম,—'শ্রীভগবানকেই তোমার পরম-প্রেমাস্পদ জানিয়া মনে প্রাণে তাঁহারই চরণে আত্ম-সমর্পণ কর মা, তাঁহাকেই প্রাণনাথ বলিয়া হৃদয়-মন্দিরে অর্চ্চনা কর, তাঁরই নয়নে নয়ন রাখিয়া, তাঁরই বক্ষে বক্ষ পাতিয়া তাঁরই নিত্যপ্রেমরসাভিসিঞ্চিত শাশ্বত আলিঙ্গন-পাশে নিজেকে বদ্ধ করিয়া চিরপ্রেমময় নবজন্মলাভে বদ্ধপরিকর হও।'

"আজও মা সেই কথাটারই পুনরাবৃত্তি করিতেছি। বিবাহের পূর্ব্বে তুমি যেমন কুমারী ছিলে, প্রত্যয় জাগাও, আজও তুমি সেই কুমারীই রহিয়াছ। তোমার এই কৌমার্য্য শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মস্পর্শের ব্যাকুলতা লইয়া প্রতীক্ষা করুক। তোমাকে বুকে তুলিয়া লইবার, তোমাকে সোহাগভরে ভালবাসিবার অধিকার একমাত্র শ্রীভগবানের। শ্রীভগবান তোমার দয়িত, তোমার হৃদয়েশ্বর, তোমার স্বামী। শ্রীভগবান তোমার সুখদুঃখের কেন্দ্র, তোমার ভাব-অভাবের মূল, তোমার মিলন ও বিরহের অদ্বিতীয় অবলম্বন। প্রত্যেকটী শ্বাসে ও প্রশ্বাসে শ্রীভগবানের সহিত হৃদয়ের যোগ সম্পাদন করিতে থাক, তাঁর মহানাম আজ অবিরাম অহর্নিশ জপিতে থাক।

"একদিন তোমার স্বামী তোমার কাছে প্রেম-ভিখারী হইয়া ফিরিয়া আসিবে, চতুর্দ্দিকের সহস্র প্রতারণায় প্রবঞ্চিত হইয়া তোমার কাছে অকপট ভালবাসার আশায় আশ্রয়প্রার্থী হইবে। সেইদিন মা তোমাকে তোমার স্বামীর বিষাক্ত দেহমনকে পবিত্রতার সুধা-সিঞ্চনে নির্ব্বিষ, নিরাময় ও নিষ্কলুষ করিয়া লইতে হইবে। সেইদিন তোমার নিকটে তার শুদ্ধি হইবে। আজ তুমি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ শ্রীভগবানের সহিত প্রেম-বিনিময় করিয়া, প্রাণ-বিনিময় করিয়া, দেহ, মন, হৃদয় বিনিময় করিয়া শান্তি-সান্ত্বনা-দাত্রী মহাশক্তিতে রূপান্তর লাভ কর। স্বামিবিরহে আর অশ্রুবিসর্জ্জন করিও না মা, অসত্যের অন্ধকার হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য আজ সর্ব্বাগ্রে নিজে জ্যোতির্ম্ময়ী জগজ্জননীর পুণ্যপ্রতিভা-দীপ্তা শ্রীমূর্ত্তি ধারণ কর।"

পুপুন্‌কী আশ্রম
১১ই ফাল্গুন, ১৩৩৬

বার্ষিক উৎসব

বিগত ১লা, ২রা ও ৩রা ফাল্গুন আশ্রমের বার্ষিক উৎসব গিয়াছে। উৎসবের ব্যাপারে এইবার একটী বিষয় বিশেষভাবেই প্রমাণিত দেখা গেল যে, যে-কোনও কুচক্রী লোক ইচ্ছা করিলেই কোন কোন জেলার বিহারীদের মধ্যে বাঙ্গালী-বিদ্বেষ অতি সহজে সৃষ্টি করিতে পারে। আলোচ্য বৎসরে মানভূম জেলা হইতে

আশ্রমের সাহায্য-কল্পে অযাচিতভাবে মাত্র ৫৬৵৫ পাওয়া গিয়াছে, প্রার্থনা দ্বারা কিছু সংগৃহীত হওয়া ত আশ্রমের ব্রতবিরুদ্ধই। শ্রীশ্রীবাবার শ্রীহস্ত-লিখিত যে সকল পুস্তক বঙ্গদেশে মুদ্রিত, প্রকাশিত ও বিক্রীত হইয়া থাকে তাহার আয় মিলিয়া মোট ৪৭৯৷৷০ আশ্রম-পরিচালনার জন্য বাংলা হইতেই আসিয়াছে। আশ্রম হইতে এই বৎসরে মানভূম জেলার বিপন্ন ব্যক্তিদিগকে আপদ-বিপদে সাহায্যের জন্য নগদ ২৭৲ এবং পল্লীতে পল্লীতে কৃষি-বীজ বিতরণের জন্য ৫১৸৵০ খরচ হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে কৃষির উৎসাহ সৃষ্টির জন্য আশ্রম-জাত ৫৭৴০ মণ তরকারী এবং ২০,০০০ চারাগাছ সর্ব্বত্র বিতরিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে মানভুম জেলার কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র রোগী আশ্রম হইতে বিনা-মূল্যে চিকিৎসিত হইয়াছে এবং মানভূমবাসীই চতুর্দ্দশটী বিদ্যার্থী বিনা বেতনে বিদ্যার্জ্জন করিয়াছে। গুরুতর শ্রম, অন্নাভাব, জলাভাব প্রভৃতি কারণে আশ্রমের পাঁচজন কর্ম্মী এই বৎসর অতিশয় সঙ্কটাপন্ন পীড়াগ্রস্ত হন এবং অর্থাভাব-নিবন্ধন আজও কাহারও কাহারও স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও শ্রীশ্রীবাবা এবং তাঁহার কর্ম্মী শিষ্যগণ বাঙ্গালী,—ইহা যে গুরুতর অপরাধ! বিগত বর্ষে বার্ষিক উৎসবের সময়ে চতুষ্পার্শের গ্রামবাসীরা স্বেচ্ছায় যথেষ্ট তণ্ডুল দিয়া সহায়তা করিয়াছিলেন, উৎসবের প্রয়োজন কুলাইয়াও অতিরিক্ত ৭৴০ মণ চাউল বেশী ছিল। এবার কোথাও হইতে এক মুষ্টি তণ্ডুল আসিল না। স্থানীয় ডোমিসাইল্‌ড্ বাঙ্গালী শ্রীযুক্ত গোষ্ঠ বিহারী হালদার পুপুন্‌কী গ্রামের এক হৃদয়বান্ দরিদ্র গৃহস্থ। তিনি শ্রীশ্রীবাবার অজ্ঞাতসারেই গ্রামে গ্রামে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া আসিলেন, সকলে অষ্টরম্ভা দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিল। তখন শ্রীযুক্ত গোষ্ঠ বিহারী নিজ কুটুম্বদের নিকট হইতে এবং নিজের গৃহ হইতে যাহা সংগ্রহ সম্ভব হইল আনিয়া শ্রীশ্রীবাবার পদপ্রান্তে রাখিয়া বলিলেন,—"স্বামীজী, উপায়? এবার লোক-সমাগম বেশী হইবে, অথচ সংগ্রহ নাই কিছুই।"

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—"ভগবানে বিশ্বাসেরই অপর নাম অভিক্ষা-ব্রত তোমরা আর লোকের বাড়ীতে দৌড়াদৌড়ি ক'রো না।"

কিন্তু ২৯শে মাঘ (উৎসবের পূর্ব্ব দিন) সন্ধ্যার সময়ে গান্ধা হইতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিশ্র দুই খানা গরুর গাড়ী লইয়া আশ্রমে পৌছিলেন। বলিলেন;—"যোগেন দা পাঠিয়েছেন।" গাড়ী হইতে প্রচুর চাউল, চিড়া, অড়হরের ডাল, আলু, গুড় প্রভৃতি যেন হাসিতে হাসিতে বাহির হইতে লাগিল। আশ্রমকর্ম্মী ও আশ্রম-হিতৈষীদের উদ্বেগ দূর হইল।

জনৈক ব্রহ্মচারী বলিলেন,—ভবিষ্যতে যখন আশ্রমের ইতিহাস রচিত হবে, তখন এই গোষ্ঠ হালদার আর যোগেন মিশিরের স্মৃতি সোণার অক্ষরে রক্ষিত হবে।

শ্রীশ্রীবাবার অন্যতম গৃহী শিষ্য শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ ভট্টাচার্য্যের রেডিও-সঙ্গীতের সরঞ্জাম লইয়া আশ্রমে পৌছিবার কথা ২৮শে মাঘ। কিন্তু তিনি সময় মত রওনা হইতে পারিলেন না। ফলে বাঙ্গালী-বিদ্বেষী বন্ধুরা আশ্রম-সভায় লোকসমাগম কমাইবার জন্য গোপনে গোপনে জোর প্রচার-কার্য্য চালাইতে লাগিলেন! ১লা ফাল্গুন নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র আতথী এবং আশ্রমহিতৈষী শ্রীযুক্ত করুণাময় চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ধীরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের সঙ্গেই এক-সাথে দুর্গানাথ বাবু কলিকাতা হইতে আসিলেন। কিন্তু ইহার ফলে ১লা ফাল্গুনের প্রাতঃকালীন রেডিও-সঙ্গীত কেহ শ্রবণ করিতে পাইল না। ফলে শ্রীশ্রীবাবার বাঙ্গালীত্বের প্রতি বাঙ্গালী-বিদ্বেষের নূতন ভক্তদের আরও একটী বেশী দোষ আরোপ করার সুবিধা হইল।

যাহা হউক, সভারম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত আতথী মহাশয় সভাপতি বৃত হইবার পরে শ্রীশ্রীবাবা অতি সংক্ষেপে আশ্রমের কার্য্য-বিবরণী বলিয়া গেলেন। কিন্তু এই কার্য্য-বিবরণীটুকু বলিবার সময়েই তাঁর প্রত্যেকটী শব্দ যেন মন্ত্রের মত বা বজ্রের মত গিয়া শ্রোতাদের অন্তরে ক্রিয়া করিতে লাগিল। শ্রীশ্রীবাবার স্বল্পকাল স্থায়ী বক্তৃতায় সাহায্যের প্রার্থনা ছিল না, কাহারও প্রতি অনুযোগ ছিল না, কিন্তু শ্রীশ্রীবাবার বক্তৃতা শেষ হইবার পরে সভাস্থলে শতাধিক মুদ্রা তাঁহারাই আশ্রমকে দান করিয়া গেলেন, যাঁহারা শ্রীশ্রীবাবা বাঙ্গালী বলিয়া তাঁহার এই পরার্থ-সাধনাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছিলেন। জনতার এইরূপ আকস্মিক মত-পরিবর্ত্তন দর্শনে একজন বন্ধু শ্রীশ্রীবাবাকে তাঁহার অপূর্ব্ব বাগ্মিতার জন্য

প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আশ্রমের চতুর্দ্দিকেই অসংখ্য হাতের লেখা [motto] মন্ত্র-বাণী টানান ছিল। শ্রীশ্রীবাবা তাহারই একটীর প্রতি অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন, লেখা রহিয়াছে,—"তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।"

চিকশিয়া গ্রামের দুইটী লোক পরস্পর আলোচনা করিতেছিলেন,—না চাহি-তেই লোকে যাহাকে এ ভাবে দান করে, সে চাহিলে না জানি কিই করিতে পারিত। শ্রীশ্রীবাবা আর একটী mottoর প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন, লেখা রহিয়াছে,—"ভিক্ষার্থীই পরাধীন।"

অ-দীক্ষিতের সাধন-নিষ্ঠা

যাহা হউক, বার্ষিক উৎসব সমাপনের পরে শ্রীশ্রীবাবা একবার পশ্চিমে যাইতে ইচ্ছুক হইলেন। অদ্য চাশ ডাকঘরে আসিয়া কতকগুলি জরুরী পত্রের জবাব লিখিয়া ও ডাক লইয়া আসিলেন। কারণ, কল্যই তিনি রওনা হইবেন। বহু পত্রের মধ্যে একখানা পত্রের কিয়দংশ নিম্নে লিখিত হইল। যথা,—

"অনেক ক্ষেত্রে নাম জপিতে জপিতে আপনিই তাহার অর্থ ও শক্তির স্ফুরণ ঘটে। অনেক স্থলে সিদ্ধগুরুর মুখ হইতে শ্রবণের ফলে মন্ত্রের শক্তি আপনা-আপনি প্রকটিত হয়। অনেক সময়ে কৌশল-বিশেষের সহায়তায় মন্ত্রের চৈতন্য সম্পাদিত হয়। পূর্ব্বোক্ত তিনটী অবস্থার মধ্যে কাহারও জীবনে একটী, কাহারও জীবনে দুইটী, কাহারও জীবনে বা তিনটীরই প্রয়োজন ঘটে। কিন্তু যাহার ১। অধ্যবসায়, ২। সিদ্ধগুরুর বাক্যলাভ বা ৩। কৌশল-বিশেষের সহায়তা এই তিনটীরই একাধিকের একযোগে প্রয়োজন হয়, তাহারও হতাশ হবার কারণ নাই। যেহেতু, একটীকে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিলে অপর দুইটী উপযুক্ত সময়ে আপনি আত্ম-প্রকাশ করে। সিদ্ধগুরুর কৃপা পাও নাই বলিয়া যদি তোমার মন্ত্র-শক্তির প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়া থাকে, তবে জানিও, অধ্যবসায় সহকারে বর্ত্তমান নাম জপিতে জপিতেই একদিন সিদ্ধগুরুর কৃপা সহজ-লভ্য হইবে। আর, প্রকৃত জপ-কৌশলের অপ্রাপ্তি-নিবন্ধনই যদি তোমার মন বশে না আসিয়া থাকে, তবে জানিও, অধ্যবসায় সহকারে ঐ নাম জপিতে জপিতেই ভগবান তোমাকে সকল

সুকৌশল জুটাইয়া দিবেন। তুমি বিন্দুমাত্রও ভয় করিও না। নির্ভয় থাক। তোমার যাহা যাহা প্রয়োজন, এই নামই তাহা তোমার করতলগত করিবেন। গুসদ্রুর বাণী বা প্রকৃষ্টতর মন্ত্র বা উন্নততর কৌশল যাহারই অভাবে তোমার কল্যাণ ব্যাহত হউক না কেন, এই নাম জপিতে জপিতে তোমার তাহা অচিরে লাভ হইবে। মনে করিও না, এই শ্রম তোমার পণ্ডশ্রম হইতেছে। এখন যে শ্রমটুকু বর্ত্তমান সাধন লইয়া করিবে, তাহা তোমাকে প্রকৃষ্টতর সাধনের যোগ্যতা দান করিবে। তুমি কোনও সন্দেহ বা আলস্য না করিয়া ঐ নামেই শ্রদ্ধা রাখিয়া প্রাণপণে তাহার সেবা কর। এখনও দীক্ষা পাও নাই বলিয়া সাধনে হেলা করিও না। অদীক্ষিতের সকল সাধন বৃথায় যায় বলিয়া সর্ব্বদা যে জনশ্রুতি শুনিতে পাও, তাহা লোককে দীক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছে। সম্প্রদায়ী না হইলে সাধন হয় না বলিয়া যে সকল কথা বহু লোকের মুখে শুনিতেছ, সেই সকল কথা অন্য সদুদ্দেশ্যে রচিত হইলেও নিজ নিজ সম্প্রদায়ের পরিসর বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই রচিত হইতেছে। সুতরাং সেই দিকে মনোযোগ না দিয়া নিজের অভিমতানুযায়ী নামের সেবাই চূড়ান্ত বিক্রমে করিতে থাক। বাকী পথ তোমার জন্য সময় মত আপনি খুলিয়া যাইবে। ইহা ধ্রুব সত্য জানিও।”

পুপুনকী আশ্রম
২রা চৈত্র ১৩৩৬

মৌন-সঙ্কল্প

ফাল্গুন মাসটা শ্রীশ্রীবাবা মধ্য-ভারতে মাইহার, সাতনা, অজয়গড় এবং পরে বারাণসী ধামে কাটাইয়া অদ্য আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আশ্রমে পৌঁছিয়াই তিনি প্রকাশ করিলেন যে, শীঘ্রই তিনি সম্বৎসর কালের জন্য মৌনাবলম্বন করিবেন। বাংলা ১৩৩২ সালেই এই মৌনাবলম্বনের তারিখটা নির্দ্দিষ্ট করা ছিল।

একজন ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—মৌনী কেন হবেন বাবা ?

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—বেশী কাজ অল্প সময়ে সেরে নেবার জন্য।

পুপুন্‌কী আশ্রম
৮ই চৈত্র ১৩৩৬

আশ্রমের দুরন্ত জলাভাব বিদূরণের জন্য কূপখননের চেষ্টা অনেক দিন হয় সুরু হইয়াছে। আশ্রমের দ্বারা উপকৃত কোনও কোনও সজ্জন কখনও কখনও এই কূপটী সম্পূর্ণ করিবার জন্য স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া অগ্রসর হইয়াছেন, আবার দুই চারি দিন পরে হাল ছাড়িয়া সরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আশ্রমের ছাত্র শ্রীমান্ পঞ্চানন হালদারকে সহ শ্রীশ্রীবাবা স্বহস্তে কূপ খননের যে প্রয়াসে আজ দু বৎসরাধিক কাল হইল লাগিয়াছেন, তাহা পরিহার করেন নাই। আশ্রমের কর্ম্মীরা দিনের পর দিন কূপটীর পিছনে পড়িয়া আছেন। ছয় ফুট খুঁড়িবার পরেই পাথর বাহির হইয়াছে, বারো ফুট নীচে বেশ শক্ত রকমেরই পাথর দেখা গেল। একুশ ফুট নীচে এমন একখানা পাথর বাহির হইল, যাহা মাত্র এক ফুট পুরু কিন্তু খনন করিতে সাতটী পূর্ণবলশালী কর্ম্মীর আঠারো দিন লাগিল। এই ভাবে সম্প্রতি কূপটীর বায়ান্ন ফুট খনন হইয়াছে। গোড়া হইতে ইটের গাথুনি সুরু হইয়াছে। পুপুন্‌কী গ্রামের শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ নায়েককে লইয়া শ্রীশ্রীবাবা নীচে নামিয়া গাথুনি বাঁধিতেছেন। একজন রাজমিস্ত্রী সঙ্গে সহায়তা করিতেছে।

এমন সময়ে অসতর্কতা বশতঃ উপর হইতে একখানা ইষ্টক এমন ভাবে পড়িল যে আর অর্দ্ধ ইঞ্চি সরিয়া পড়িলে শ্রীশ্রীবাবার মস্তক আহত হইত।

শ্রীযুত কালাচাঁদ নায়েক—হাঁ হাঁ—করিয়া উঠিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভয়ের কিছুই নেই বাবা এই যে ভগবানের আশীর্ব্বাদ।

পুপুন্‌কী আশ্রম
৯ই চৈত্র, ১৩৩৬

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবার নিকটে তাঁহার ভক্তগণ সর্ব্ববিষয়ে যে স্বাধীনতা পাইয়া থাকেন, তাহা অনেক সময়ে আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছে। ধরিয়া বাঁধিয়া কাহাকেও দিয়া স্বমত মানাইয়া লওয়ার দৃষ্টান্ত বোধ হয় তাঁহার জীবনে এক বারও কেহ দেখে নাই। সম্প্রতি শ্রীশ্রীবাবার ভক্তদের মধ্যে একটা অতি উৎকট

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ভাব লক্ষ্য করিয়া তিনি কবিতাকারে একটী পত্র লিখিলেন এবং কাহারও কাহারও নিকট প্রেরণ করিলেন। যথা,—

শুভাশীর্ভাজনেষু,—

ব্যাকুল বক্ষ চাহিবে যখন
তপ্ত শোণিত দান,
একি সম্ভব, তখনও তুই
আমারে করিবি ধ্যান?
চিত্ত চাহিলে বজ্রপাত,
ধ্বংশই তোর জগন্নাথ
মৃত্যু তখন পরম তীর্থ'
প্রলয় তখন প্রাণ।

তখন যে তোরে ছুটে যেতে হবে
অজানা আঁধার পথে,
পিছনের টানে টলিলে তখন
চলিবে না কোন মতে,,
বন্ধু কে পিছে করে আহ্বান,
তার দিকে দে'য়া চলিবেনা কান,
ভুলিতে হইবে সঙ্গী তোমার
আছে কেহ ত্রিজগতে।

গর্জ্জনময়ী অমানিশীথিনী
যবে ঝঞ্ঝায় নাচে,
সে সময় কিরে দেখা যায়, কেবা
আছে দূরে, কেবা কাছে?
শত বার ফেলি দীর্ঘশ্বাস
হারাবি নিজের দৃঢ় বিশ্বাস,
ছুটাছুটি তুই করিবি তখন
শত যুক্তির পাছে?

আমি বলি, তুই আমারে যখন
দেখিবি পথের বাধা,
তখনি আমারে করি' পরিহার
ঘুচা বুদ্ধির ধাঁধা ;
ঘুচা মরমের শত বন্ধন,
ঘুচা অবলার মত ক্রন্দন,
বাজা তুই তোর আপনার বাঁশি
যে সুরে আছে সে সাধা।

খরতরবারি দেখি শিরোপরি
চিত্তে নাহি ক' ভয়,
মৃত্যু তাহার চরণ-ভিখারী,
অমর সেই ত হয় !
সে অমর তুই হ'তে চাস্ কিরে ?
মোর পানে কেন চাস্ ফিরে ফিরে ?
বুঝেছিস যদি সৃজিয়াছি আমি
পথ-কণ্টক-চয়,
মোর তরে মায়া-মমতা রাখা ত'
বীরের উচিত নয় !

সবল হস্তে কেটে ফেল আগে
মোর উন্নত শির,
স্নান ক'রে মোর তপ্ত রুধিরে
বুদ্ধিরে কর স্থির,
হ'তে হবে তোরে বীত-সংশয়,
তবে ত' জীবনে লভিবি বিজয়,
তবে ত' ঘুচাবি যুগ সঞ্চিত
গ্লানি-রাশি ধরণীর !

একদা আমার স্নেহের মাধুরী
তোদের চিত্তলোক
ক'রেছিল স্নেহে প্রেমে মাতোয়ারা,
বিমল, বিগত-শোক ;
তার ধুয়া ধরি' তোরা চিরদিন
আমারি চরণে হ'য়ে রবি লীন ?
বিবেক বলিছে আমারে ছাড়িতে ?
বিবেকেরি জয় হোক্ !
আমি যে তোদের চাহিনা বাঁধিতে
আমার কর্ম্ম-সাথে,
বলিব না, মোর কাঁধে কাঁধ দিতে,
হাত দিতে মোর হাতে;
যে পথে তোমার নিজ কল্যাণ,
তারি দিকে কর সবলে প্রয়ান,
বিদায়ের দিনে হাসি মুখে আজ
আশীষ দানিব মাথে,—
যত দূরে যাও, কুশল কামনা
করিব সাঁঝে ও প্রাতে।

ইতি—
নিত্যাশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

প্রকৃত প্রেমিক

এই পত্রের মূল দেখিয়া একজন জিজ্ঞাসু অত্যধিক বিস্ময় প্রকাশ করিলে শ্রীশ্রীবাবা পত্রখানার এক কোণে পেন্সিল দিয়া লিখিয়া দিলেন,—"The giver of Freedom is the true Lover" (স্বাধীনতা প্রদাতাই প্রকৃত প্রেমদাতা।)

মৌন-ব্রতারম্ভ

চৈত্রের শেষভাগে শ্রীশ্রীবাবা কলিকাতা আসিয়াছেন। প্রায় সহস্রাধিক ধর্ম্মার্থী যুবক এই স্বল্প-সময়-মধ্যে তাঁহার চরণ-দর্শন করতঃ নিজ নিজ প্রয়োজনোপযোগী জীবন-গঠন-সম্পর্কিত উপদেশ গ্রহণ করিয়াছেন। এই উপদেশাবলি কেহ সংগ্রহ করিয়া রাখেন নাই, ইহা দুঃখের বিষয়।

চৈত্রের দুই একদিন থাকিতে শ্রীশ্রীবাবা প্রকাশ করিলেন যে, পয়লা বৈশাখ হইতে তাঁহার মৌনব্রত আরম্ভ হইবে। ১লা বৈশাখ রাত্রি থাকিতে শয্যা ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীবাবা জনৈক ব্রহ্মচারী সহ গঙ্গাতীরে গমন করিলেন এবং দীর্ঘ কেশ দীর্ঘ শ্মশ্রু প্রভৃতি মুণ্ডিত করিয়া পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর পবিত্র নীরে অবগাহন করিলেন। শ্রীশ্রীবাবার সম্বৎসরব্যাপী মৌনব্রত আরম্ভ হইল।

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত

চতুর্থ খণ্ডের

বর্ণানুক্রমিক সূচী

বিষয় পত্রাঙ্ক

বিষয় পত্রাঙ্ক

বিষয়	পত্রাঙ্ক